PERSONAL HYGIENE

BY

CHUNILAL BOSE, I. S. O., M. B., F. C. S.

Late Sheriff of Calcutta ;

Late Chemical Examiner to the Government of Bengal and Professor of Chemistry, Medical College, Calcutta ; Fellow of the Calcutta University.

SECOND EDITION.

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

শ্রীচুণীলাল বসু আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA,

1922

মূল্য ১॥০ মাত্র।   Price Rs. 1/8 only.

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

স্বর্গীয়

পূজ্যপাদ পিতৃদেব

ও

স্বর্গগতা

পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর

পবিত্র চরণ কমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে উৎসর্গ

করিলাম।

ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রায় সমস্ত অংশই "ভারতী" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাতে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া সম্পাদিকা মহোদয়ার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

ভারতীতে প্রকাশিত হইবার সময় ঐ পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার মধ্যে অনেকে প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করেন এবং যাহাতে প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আমাকে সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধে এবং এরূপ পুস্তকের অভাব আছে মনে করিয়া, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সেই সমস্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় তত্ত্বসমূহের যথোচিত আলোচনা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিষয় সংক্রান্ত নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে দেখা যায়। আমাদিগের সংসারে দৈনন্দিন যাবতীয় কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। এই

সকল কার্য্য স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য-রক্ষার অনেকানেক মূলতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা হেতু সংসারে সর্ব্বদা অনর্থ ঘটিতে দেখা যায়। এই সকল বিষয়ে জ্ঞান তাঁহাদিগের মধ্যে প্রসার লাভ করিলে সংসার হইতে রোগ, শোক, অর্থনাশ ও মনস্তাপ যে অনেকাংশে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাতে আমাদিগের অন্তঃপুরমহিলাগণের এবং সাধারণ জনবর্গের মধ্যে এই সকল প্রয়োজনীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইহার উপদেশ পালন করিয়া যদি রোগের প্রাদুর্ভাব কিঞ্চিন্মাত্র কমিয়া যায় এবং আমাদিগের স্বাস্থ্যের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকের যথাস্থানে পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলীর সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধির সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছি এবং যে পাশ্চাত্য বিধিগুলি এদেশের উপযোগী নহে, তাহাদিগের পরিহার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমরা অনেকানেক স্বাস্থ্যবিধি সংস্কার ও অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক প্রথারূপে বহুকাল

হইতে পালন করিয়া আসিতেছি। এই সকল বিধি বহুদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অনেক স্থলে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং অবহেলার বিষয় নহে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের নামকরণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সভাপতিত্বে রাঁচি সহরে এই প্রবন্ধের কিয়দংশ পঠিত হইয়াছিল।

আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক পরমভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয়ের নিকট হইতে এই পুস্তকের ভাষা-সংশোধন বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করিয়াছি, এজন্য আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সংক্রামক-রোগ-নিবারণের ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় অধ্যায় রচনার সময়ে বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ঘোষ এম্ বি মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা,
১৫ই নভেম্বর, ১৯১৩

শ্রীচুণীলাল বসু।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে শারীর স্বাস্থ্য-বিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক একজন বাঙ্গালীরও ঘরে স্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া আয়ু, সুখ ও সম্পদ্ বৃদ্ধির সহায়তা করে, তাহা হইলে গ্রন্থকারের চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

কলিকাতা,
১লা মার্চ্চ, ১৩২২।

শ্রীচুণীলাল বসু।

সূচীপত্র

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান।

সূচনা।

স্বাস্থ্য-নীতি যথাবিধি পালন করিলে দেহের উৎকর্ষসাধন ও অযথা ক্ষয়-নিবারণ, জীবনী-শক্তির সংবর্দ্ধন এবং অকাল মৃত্যুর নিবারণ সংসাধিত হইয়া থাকে।

দেহ অনিত্য, সুতরাং যত্ন-সহকারে ইহার রক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই, এই মহানিষ্ট-মূলক সংস্কার এ দেশের লোকের মধ্যে অনেকের অস্থি-মজ্জায় সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা শয়নে, স্বপ্নে, চিন্তায়, কার্য্যে, এই অবসাদময় ভাবের অধিকার অতিক্রম করিতে সমর্থ হই না। আমাদের জাতীয় জীবনে যে উৎসাহ, উদ্যম ও জীবনীশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূলে জগৎ ও দেহের অনিত্যতা সম্বন্ধীয় সংস্কার পূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র-বচনের যথার্থ মর্ম্ম যদি আমরা

অবগত হইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেহ যে একেবারেই অবহেলার পদার্থ নহে, তাহা বুঝিবার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতি হেতবঃ।
তান্ নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতং॥"

শরীর থাকিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়; শরীর নষ্ট হইলে সকলই নষ্ট হয়।

অবশ্য ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া শরীর রক্ষা করা কোন দেশের কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যদি শরীর-পাত করিতে হয়, তাহাও উত্তম, তথাপি ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নহে, ইহা সকল দেশের ধর্ম্মোপদেশকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে কত দেশে কত লোক অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মের তুলনায় প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। একটী সামান্য কথায় এই তত্ত্বটী সহজেই বোধগম্য হইবে। মনে করুন কোনও ব্যক্তি ভয়ানক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। যিনি তাঁহার শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহারও ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার,

এমন কি তদ্দ্বারা তাঁহার মৃত্যু ঘটিবার, সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে প্রাণের ভয় না করিয়া যখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন অথবা বন্ধুবান্ধব তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহারা ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য, প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়ান্ বিবেচনা করেন। কিন্তু যে সকল স্বাস্থ্যবিধি পালন করিলে এইরূপ বিপদের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তাঁহারা আপনাদিগকে সংক্রামকতার আক্রমণ হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যদি তাঁহারা তাহার অনুসরণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কার্য্য আত্মত্যাগ-সূচক হইলেও বিশেষভাবে অবিবেচনার পরিচায়ক। এরূপ সাবধানতার অভাব আমাদের গৃহে গৃহে প্রতিদিন নয়নগোচর হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা সংক্রামক রোগ প্রসার লাভ করিয়া কত লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে মহাঅনিষ্টমূলক এবং ঐ সকল স্বাস্থ্যবিধির পালন যে পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেহ অনিত্য, অতএব উহার নাশে শোচনা অকর্ত্তব্য, বলিয়া উপদেশ দিতেছেন, তখন তিনি “স্বধর্ম্মপালন” ও “দেহ-রক্ষা”, এই দুইটী বিষয় তৌলে

ওজন করিয়া, ধর্ম্ম-পালন শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অযথা দেহনাশ বা দেহের প্রতি অবহেলা করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই। চরক বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগা তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥"

নীরোগ শরীর দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অসুস্থ শরীরে ইহাদিগের মধ্যে কোনটীকেই আয়ত্ত করিতে পারা যায় না।

কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি বিদ্যা, কি সুখ, শরীর সুস্থ না থাকিলে ইহাদিগের মধ্যে কোন একটীর উপার্জ্জনের জন্য যে আয়াসের প্রয়োজন, তাহার সাধন ঐ ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যাঁহারা মনে করেন যে শরীরকে কষ্ট না দিলে ধর্ম্মসাধন হয় না, তাঁহারা নিতান্ত একদেশদর্শী। তাঁহারা মঙ্গলময় জগদীশ্বরের সৃষ্ট প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন না। শাস্ত্রকারেরা কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীর নষ্ট করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করা শ্রেয়স্কর মনে করেন না। শাস্ত্রে যে তপস্যার কথার উল্লেখ আছে, তাহা দেহের শোষণ বা দেহ নাশের জন্য ব্যবস্থিত হয় নাই, যথা—

"যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্ম-বুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মনো ন শরীরস্য শোষণং॥"
"মন, বাক্যে, কর্ম্মে যাঁরা না করেন পাপ আচরণ।
তাঁহারাই তপস্বী, তপস্যা নহে দেহের শোষণ॥"
(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)

যাহার শরীর সুস্থ নহে, যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, তাহার প্রবৃত্তি-সংযমের জন্য যে পরিমাণ মানসিক শক্তির প্রয়োজন, সে তাহা কখনই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। অসুস্থ ব্যক্তির সামান্য কারণে ক্রোধের উদয় হয়, অহিতকর খাদ্যে তাহার লোভ উপস্থিত হয় এবং অপরকে সুস্থ দেহে সুখভোগ করিতে দেখিয়া তাহার মন ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে থাকে। প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, দয়া, পরার্থপরতা প্রভৃতি মানবমনের ঈশ্বরদত্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর পূর্ণবিকাশ সুস্থ দেহেই লক্ষিত হইয়া থাকে।

গীতায় যে যোগ-সাধন মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা উপবাস, অনিদ্রা প্রভৃতি দেহক্ষয়-কারী কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা লভ্য নহে। এই মহাবাক্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবার্জ্জুন॥ ১৬॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু ।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥" ১৭ ॥

(ভগবদ্গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

অতিভোজন বা উপবাস, অতিনিদ্রা বা অনিদ্রা, ইহাদিগের মধ্যে কোনটীই যোগ-সমাধির পক্ষে অনুকূল নহে। যাঁহার আহার বিহার নিয়মিত, যিনি পরিমিত রূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন এবং যিনি সতত কর্ম্মশীল ও যাঁহার কর্ম্ম-চেষ্টা সংযত, তিনিই সর্ব্বদুঃখ-নাশক যোগ-সমাধির অধিকারী।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ আহার, বিহার, নিদ্রা, কর্ম্মচেষ্টা প্রভৃতি শরীর-রক্ষার উপযোগী কার্য্যগুলি অবশ্য পালনীয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন এবং ইহাদের অপব্যবহারই নিন্দার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রবৃত্তির সংযত ব্যবহারই প্রকৃত সংযম, উহাদিগের উচ্ছেদ সংযম নহে। আমাদের এই মহাসত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেই সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্ণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল বিধি পালনীয়, এই পুস্তকে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাতরুত্থান।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কতকগুলি সু-অভ্যাস আমাদিগের মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সকল নিয়ম পালন করা প্রথমে কষ্টসাধ্য হইলেও কিছুদিন পরে ইহারা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে; তখন আমরা বিনা আয়াসে ইহাদিগের সুফল ভোগ করিয়া শরীর ও মনের সচ্ছন্দতা লাভ করিয়া থাকি। এই সকল সু-অভ্যাসের মধ্যে প্রাতরুত্থান স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। বাল্যকালে আমরা ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছি—

"Early to bed and early to rise,
Makes a man healthy, wealthy and wise."

আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কে "ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই সময়ে ভগবানের উপাসনা প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক এই আলোক-অন্ধকারের সন্ধিস্থলে, সংসার-কোলাহল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বক্ষণে, গভীর

নিস্তব্ধতার মধ্যে, সুষুপ্তি-লব্ধ-শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের যেরূপ সুবিধা হয়, বোধ হয়, আর কোনও সময়ে তাহা ঘটিয়া উঠে না।

অনেকে অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিলেও আলস্যবশতঃ শয্যা-ত্যাগ করেন না। এটী অতি কদভ্যাস, অতএব ইহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। দুই চারি দিন জোর করিয়া উঠিলেই এই অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে। তখন ঘুম ভাঙ্গিবার পর শয্যাত্যাগ না করা একটা কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিবে।

প্রকৃতির উষাকালীন সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয় ও মনোমোহকর। ইহা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি প্রকৃতিদত্ত একটী অনির্ব্বচনীয় অনায়াস-লভ্য সুখভোগে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি যথারীতি সমাপনপূর্ব্বক কিয়ৎ পরিমাণে শীতল জল পান করিয়া মুক্তবায়ুতে অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য ভ্রমণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে সবিশেষ হিতকর। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রত্যুষে শীতল জল পান আয়ুর্ব্বর্দ্ধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ একটী বচন প্রচলিত আছে—

"দিনান্তে চ পিবেৎ দুগ্ধং নিশান্তে চ পিবেৎ পয়ঃ।
ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদ্যস্য প্রয়োজনং॥"

দিবাবসানে দুগ্ধ, নিশান্তে জল, আহারের পর ঘোল যথারীতি পান করিলে বৈদ্য ডাকিবার প্রয়োজন হয় না।•

যাঁহাদের সহজে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। শীতল জলের পরিবর্ত্তে অনেকে ইদানীং উষ্ণ জল পানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে উহা হিতকর হইলেও সাধারণের পক্ষে শীতল জল পান করাই প্রশস্ত। চা পান করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারা জলের পরিবর্ত্তে খুব পাতলা চা ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু চায়ের আয়োজন করিতে করিতে বেলা হইয়া পড়ে, সুতরাং চা খাইবার জন্য প্রধান কার্য্য যে প্রাতর্ভ্রমণ, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। যদি প্রত্যূষে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তবে সামান্য জলযোগ করিয়া শীতল জল পান করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইলে শরীর ও মন প্রফুল্ল থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শরৎকালের হিম ও রৌদ্রসেবন স্বাস্থ্যানুকূল নহে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ভাদ্র ও আশ্বিন মাস শরৎকাল বলিয়া গণ্য। কেহ বা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসকে শরৎ ঋতুর অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদমতে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে অতি প্রত্যূষে ভ্রমণ নিষিদ্ধ বলিয়া মানিয়া

লইতে হইবে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এদেশে প্রচুর-পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া কেহই প্রাতর্ভ্রমণ সুখকর ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন না; সুতরাং এ বিষয়ে শাস্ত্রের মতানুযায়ী কার্য্যই আমরা করিয়া থাকি। শাস্ত্রে শরদ্-ব্যতীত অপর কোনও ঋতুতেই প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শীতল বায়ু সেবন করা নিষিদ্ধ কার্য্য বলিয়া উক্ত হয় নাই।

প্রাতঃকালে আমাদিগের (বাঙ্গালীর) পক্ষে সাধারণতঃ পদব্রজে ভ্রমণই প্রশস্ত ব্যায়াম। অবশ্য আজকাল কেহ কেহ সাইকেলে (Cycle) ভ্রমণ করেন—ইহা অতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। অশ্বারোহণ সুন্দর ব্যায়াম হইলেও আমাদিগের মধ্যে ইহার অভ্যাস নিতান্ত বিরল। অশ্বারোহণ আমাদিগের মধ্যে যাহাতে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হয়, তাহার সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ইহা দ্বারা আমাদিগের সাহস ও কার্য্য-কুশলতার প্রসার বাড়িয়া যাইবে। দেশের স্থানে স্থানে অশ্বারোহণশিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইলে, অনেক বাঙ্গালী যুবক শীঘ্র এবিষয়ে সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রাতে অন্ততঃ ৩,৪ মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করা উচিত। এরূপ জোরে চলা উচিত যাহাতে

শরীরে ঘর্ম্মের সঞ্চার হয়। ভ্রমণের সময় দীর্ঘশ্বাস লইবার অভ্যাস করিলে শ্বাসযন্ত্র ও তাবৎ দেহের উন্নতি সাধিত হয়। দ্রুত গমনে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত হয় বলিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) দূর হয়। প্রাতে জনতা থাকে না বলিয়া রাস্তাঘাট পরিষ্কৃত থাকে, বায়ু নির্ম্মল ও শীতল সুতরাং সুখসেব্য হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির সামর্থ্যানুসারে ভ্রমণ করাই কর্ত্তব্য। অনেকে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে প্রাতর্ভ্রমণ প্রশস্ত বলিয়া মনে করেন না, ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। সমস্ত দেহ উত্তমরূপে আবৃত করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলে ঠাণ্ডা লাগিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। প্রাতঃ-সমীরণ মন ও শরীর উভয়েরই পক্ষে স্ফূর্ত্তিজনক ও শক্তিসঞ্চারক। যখনই ভ্রমণ করিয়া ক্লান্তিবোধ হইবে, তখনই ভ্রমণে ক্ষান্ত হওয়া উচিত। সহর বা গ্রামের ভিতর না বেড়াইয়া বাহিরের ময়দানে বা নদীর ধারে ভ্রমণই প্রশস্ত। তবে সুবিধা না হইলে সহরের যে স্থানে রাস্তা ঘাট প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং যেখানে লোকের বসতি অল্প, তথায় ভ্রমণ করিলে ভাল হয়। কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চল ও গড়ের মাঠ পদব্রজে ভ্রমণের পক্ষে প্রশস্ত স্থান। আজকাল কলিকাতা সহরে মিউনিসিপালিটীর সুব্যবস্থায় প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে

এক একটী পার্ক্ (Park) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এগুলি ভ্রমণের পক্ষে সহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যকর।

যাঁহারা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেন, তাঁহারা, যাঁহারা বেলায় উঠেন, তাঁহাদের অপেক্ষা এক হিসাবে দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে বলিয়া যে তাঁহারা বেশী দিন বাঁচেন, শুদ্ধ তাহাই নহে ; অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতিদিন প্রায় ১½ ঘণ্টা কাল অতিরিক্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার সুবিধা হয়। এইরূপে প্রতি মাসে দুই দিন এবং প্রতি বৎসরে আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা প্রাতঃপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি ২৪ দিন অধিক জাগ্রত থাকিয়া সৎকার্য্যে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারেন। যদি ৭০ বৎসরকাল মানুষের জীবনের সীমা হয়, তাহা হইলে হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে প্রথম ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ৫ বৎসর অধিক জীবন সুখে ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং এইভাবে দেখিলেও প্রাতরুত্থান অবহেলার বিষয় নহে।

স্নান।

ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সুস্থ শরীরে প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য। যেমন বাসগৃহের ময়লা জল চতুঃপার্শ্ব স্থিত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়, তদ্রূপ আমাদের দেহের অনেক ময়লা ত্বকের মধ্যস্থিত অসংখ্য নালী সাহায্যে নির্গত হইয়া যায়। এই ময়লার কতক অংশ জলীয়, কতক অংশ আঠাল। ইহা ঘর্ম্মের সহিত এবং পৃথক্‌ভাবে নির্গত হইয়া ত্বকের উপর অবস্থিতি করে। পরে উহার জলীয় অংশ শুকাইয়া গেলে তন্মধ্যস্থিত নানাবিধ লাবণিক পদার্থ, আঠাল ময়লার সহিত মিশ্রিত হইয়া ত্বকের উপর জমিয়া থাকে। যদি আমরা রীতিমত স্নান ও গাত্রমার্জ্জনা দ্বারা ইহাকে দূরীভূত না করি, তাহা হইলে নালীগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং দেহাভ্যন্তরস্থ ক্লেদ বাহির হইতে না পারিয়া শরীরকে অসুস্থ করে। পয়ঃপ্রণালীর মুখ বন্ধ হইয়া গেলে বাসগৃহের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, চর্ম্মের উপর ময়লা জমিয়া এই সকল নালীর মুখ বন্ধ হইলে আমাদের শরীরেরও সেইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বাহিরের ধূলিকণা সর্ব্বদা আমাদের গায়ে লাগে বলিয়া এই ময়লার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; সুতরাং শরীরকে

সুস্থ রাখিবার জন্য চর্ম্ম সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবার বিশেষরূপ আবশ্যকতা হয়। আমাদের শরীরের ময়লা প্রধানতঃ ত্বক্ ও মূত্র-যন্ত্র সাহায্যে দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। যদি এই ময়লা চর্ম্মদ্বারা বহির্গত হইয়া না যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে বাহির করিবার জন্য মূত্র-যন্ত্র (Kidney) প্রভৃতি দেহস্থিত অন্যান্য যন্ত্রাদির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা হয়, সুতরাং স্বল্পকালের মধ্যেই সেই যন্ত্রগুলি দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইতে পারে। ত্বকের উপর ময়লা জমিলে শুদ্ধ যে দেহ অসুস্থ হয় তাহা নহে, বাহিরের ধূলিকণার সহিত পাঁচড়া, দাদ্ প্রভৃতি নানাবিধ চর্ম্মরোগের ও স্ফোটক বিশেষের বীজ অনেক সময়ে মিশ্রিত থাকে এবং উহা আমাদিগের ত্বকের উপর পতিত হইয়া ঐ সকল ক্লেশদায়ক রোগ উৎপাদন করে। চর্ম্ম সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকিলে ঐ সকল রোগের বীজ কোন অনিষ্টসাধন করিবার সময় বা সুবিধা পায় না।

সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলে স্নানই প্রশস্ত। ইহাতে শরীর সতেজ হয় এবং এই অভ্যাসের গুণে কফ, কাসি, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগ শরীরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে অত্যন্ত শীতল জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিলে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু

অধিকক্ষণ শীতল জলে শরীর নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে দেহতাপ অধিক পরিমাণে অপহৃত হইয়া প্রভৃত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ৫।৭ মিনিট্ কাল জলের মধ্যে থাকিলেই অবগাহন-স্নানের উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহাদিগের সর্ব্বদা মাথা ধরে অথবা রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, তাঁহাদিগের পক্ষে অবগাহন-স্নান বিশেষরূপে উপকারী। যদি গায়ে জল লাগিলে বেশী শীত বোধ হয় অর্থাৎ গায়ে কাঁটা দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ শীতল জলে স্নান করা প্রশস্ত নহে। এরূপ স্থলে স্নানের জল রৌদ্রে রাখিয়া অথবা যথাপরিমাণ উষ্ণ জল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ; শিশু ও দুর্ব্বল ব্যক্তির শীতল জলে স্নান অনেক সময়ে সহ্য হয় না।

উষ্ণ জলে প্রত্যহ স্নান করিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটিবার সম্ভাবনা। তবে যাঁহাদের শীতল জল সহ্য হয় না, তাঁহাদিগের পক্ষে শরীরের সহজ উত্তাপের অনুরূপ ঈষদুষ্ণ জল স্নানের জন্য ব্যবহার করা সঙ্গত। দুর্ব্বল ও অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে খোলা জায়গা অপেক্ষা ঘরের ভিতর স্নান করাই প্রশস্ত। গায়ে জল ঢালিলে দেহের তাপসংস্পর্শে উহা শীঘ্র বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় অর্থাৎ শুকাইয়া যায় এবং ঐ অবস্থায় দেহ হইতে তাপ অপহরণ করিয়া শৈত্য উৎপাদন করে।

গরম জল শীতল জল অপেক্ষা শীঘ্র বাষ্পাকারে পরিণত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে শীতকালে গরম জলে স্নান করিবার সময় শরীর হইতে ধুঁয়া বাহির হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, জল-বাষ্প স্বভাবতঃ অদৃশ্য হইলেও, শীতকালে বাহিরের শীতল বায়ুসংস্পর্শে উহা শীঘ্র ঘনীভূত হইয়া ধুঁয়ার আকারে দৃশ্যমান হয়। কি শীতল, কি উষ্ণ, সকল অবস্থাতেই অল্লাধিক পরিমাণে বাষ্পাকারে পরিণত হওয়া জলের সাধারণ ধর্ম্ম। বেশী বাতাস বহিলে জল শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ভিজা কাপড় বাতাসে টাঙ্গাইয়া দিলে উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। এই একই কারণে খোলা জায়গায় স্নান করিলে স্নানের জল দেহ হইতে শীঘ্র উড়িয়া যাইয়া তাপশোষণ হেতু শৈত্য উৎপাদন করে; সুতরাং খোলা জায়গায় উষ্ণ জলে স্নান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি, কাসি হইবার সম্ভাবনা। বাতাসের জোর না থাকিলে অথবা বেলা অধিক হইলে শীতল জলে বাহিরে স্নান করিলে কোন দোষ হয় না। অবশ্য সকলই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। পৌষ মাঘ মাসের শীতে কলিকাতায় প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া হিন্দুরমণীগণকে সম্পূর্ণ সুস্থশরীরে থাকিতে দেখা যায়।

স্নানের পর সমস্ত শরীর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া গায়ে প্রয়োজন মত বস্ত্রাদি চাপা দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা শরীরে তাপ রক্ষিত হয় এবং হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। স্নানের পর অধিকক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকা অকর্ত্তব্য, কারণ দেহসংলগ্ন ভিজা কাপড় যত শুকাইতে থাকে, ততই দেহ হইতে তাপ অপহৃত হইয়া শৈত্য উৎপন্ন হয়; এরূপ অবস্থায় সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদের "শুচিবাই" নামক চিকিৎসাশাস্ত্র-বহির্ভূত রোগ আছে, তাঁহাদের মধ্যে এই কদভ্যাস প্রবল-ভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের শরীর অনেক সময়ে এই কারণে অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যাঁহারা দূরস্থিত পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিয়া আসেন, ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দূরে স্নান করিতে গেলে পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত।

আমাদের দেশে স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা হিতকর ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানু-মোদিত। পাশ্চাত্য-আচার-পক্ষপাতী নব্যসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক যুবক যুবতী এই প্রথার বিরোধী, এজন্য এই প্রথার উপকারিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা

করি। গায়ে তৈল মাখিলে ঘর্ষণ দ্বারা চর্ম্মের উত্তেজনা হয়, এই হেতু অধিক পরিমাণ রক্ত চর্ম্মের দিকে সঞ্চালিত হইয়া ক্লেদ-নিঃসরণ কার্য্যের সহায়তা করে। পুনশ্চ তৈলমর্দ্দন করিলে স্নানের সময় শরীরে কম ঠাণ্ডা লাগে, এজন্য যাঁহারা নদী বা পুষ্করিণীতে অবগাহন-পূর্ব্বক স্নান করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তৈলমর্দ্দন অবশ্য কর্ত্তব্য।

তৈলের অপর একটি নাম স্নেহ। ইহা মস্তকে ও শরীরে যথারীতি অনুলিপ্ত হইলে আয়ুর্ব্বেদ মতে মস্তিষ্ক ও দেহ উভয়ই স্নিগ্ধ থাকে, চর্ম্মের কর্কশতা নষ্ট হইয়া উহা মসৃণ ও দৃঢ় হয়, কেশের অকালপতন ও অকালপক্কতা দোষ দূর হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় এবং ধাতুর রুক্ষতাদোষ উপশমিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের ধাতুতে বায়ু প্রবল, যাঁহারা হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বায়ুরোগে কষ্ট পান, মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করিয়া অবগাহন স্নান করিলে ঐ সকল রোগের অনেক উপশম হয়। তৈলাভ্যঙ্গের উপকারিতাসম্বন্ধে চরকের উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"নিত্যং স্নেহার্দ্রশিরসঃ শিরঃশূলং ন জায়তে।
ন খালিত্যং ন পালিত্যং ন কেশাঃ প্রপতন্তি চ ॥

বলং শিরঃ কপালানাং বিশেষেণাভিবৰ্দ্ধতে।
দৃঢ়মূলাশ্চ দীর্ঘাশ্চ কৃষ্ণাঃ কেশাঃ ভবন্তি চ ॥
ইন্দ্রিয়ানি প্রসীদন্তি সুত্বগ্‌ভবতি চামলং।
নিদ্রালাভঃ সুখঞ্চ স্যান্ মূর্দ্ধ্নি তৈলনিষেবনাৎ ॥
স্নেহাভ্যঙ্গাদ্ যথা কুম্ভশ্চৰ্ম্ম স্নেহ বিমৰ্দ্দনাৎ।
ভবত্যুপাঙ্গাদক্ষশ্চ দৃঢ়ঃ ক্লেশসহো যথা ॥
তথা শরীরমভ্যঙ্গাদ্দৃঢ়ং সুত্বক্ প্রজায়তে।
প্রশান্তা মারুতাবাধং ক্লেশ ব্যায়াম সংগ্রহং ॥
সুস্পর্শোপচিতাঙ্গশ্চ বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
ভবত্যভ্যঙ্গ নিত্যত্বান্নরোঽল্পজর এব চ ॥” ইত্যাদি

অর্থাৎ নিত্য মস্তকে তৈল অনুলেপন করিলে শিরঃপীড়া জন্মে না, কেশের রুক্ষতা অপনীত হয় এবং চুল উঠিয়া যাইয়া মাথায় টাক ধরে না। ইহা দ্বারা কেশ দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শিরোদেশ বলিষ্ঠ হয়। তৈলমৰ্দ্দন করিলে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রশান্ত থাকে, চৰ্ম্ম কোমল, মসৃণ ও পরিষ্কৃত হয় এবং রাত্রিকালে সুনিদ্রা লাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন মৃণ্ময় কুম্ভে, চৰ্ম্মে অথবা চক্রের ধুরায় পুনঃ পুনঃ তৈলসেক করিলে উহা সুদৃঢ় ও ঘাতসহ হয়, তদ্রূপ শরীরে তৈল অনুলেপন করিলে উহা সুদৃঢ়, কষ্টসহ ও সুত্বক্‌বিশিষ্ট হইয়া থাকে। যথারীতি তৈলের ব্যবহারে বায়ুরোগ

প্রশমিত হয় এবং দেহ শ্রমসহিষ্ণু হইয়া থাকে। প্রতিদিন তৈল মাখিলে শরীর সুখস্পর্শ, তেজস্বী ও প্রিয়দর্শন হয় এবং বৃদ্ধ বয়সেও জরাজনিত লক্ষণের অসদ্ভাব হইয়া থাকে।

প্রাচীন চরক ঋষির উপরোক্ত উপদেশ বিষয়ে নবীন পাঠকপাঠিকাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কোন কোন সাহেব আমাদিগকে "তৈলাক্ত বাবু" বলিয়া রহস্য করে বলিয়া আমাদিগকে যে এই দেশোপযোগী ও স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত বা সত্যানুমোদিত নহে। বিশেষতঃ তৈল মাখিয়া স্নানের সময় তাহা তুলিয়া ফেলিবার যখন সদুপায় রহিয়াছে, তখন তৈলমর্দ্দনের উপকার হইতে বঞ্চিত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে হয় না।

সকল তৈল অপেক্ষা খাঁটী সরিষা-তৈল ঝাঁঝাল, সুতরাং গায়ে মাখিবার পক্ষে প্রশস্ত। অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট্ কাল শরীরের সর্ব্বস্থানে তৈলমর্দ্দন করিলে ভাল হয়। এ কার্য্যের জন্য চাকরের আবশ্যকতা নাই, নিজে নিজেই ইহা সুন্দররূপে সম্পাদন করা যাইতে পারে। আমরা বাঙ্গালীজাতি, ব্যায়াম করিতে সর্ব্বদা উৎসুক নহি। যদি আমরা ১৫ মিনিট্ কাল ব্যাপিয়া সমস্ত শরীরে জোরে

তৈলমর্দ্দন করি, তাহা হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কতকটা ব্যায়ামের কার্য্য হইয়া যায়।

সরিষার তৈল মাথায় মাখিবার পক্ষে প্রশস্ত নহে। ইহা কিছু দিন ব্যবহার করিলে মাথায় আঠা হয়। সকল তৈল অপেক্ষা নারিকেল তৈল মাথায় মাখিবার উপযোগী। ইহা অনেক দিন মাখিলেও মাথায় আঠা হয় না এবং মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। আয়ুর্ব্বেদে নারিকেল তৈল মাথা প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তবে অনেক পুরাতন প্রথার সহিত নারিকেল তৈলের ব্যবহারও আমাদের মহিলাকুলের মধ্যে অনেকের নিকট ক্রমশঃ অনাদরণীয় হইয়া আসিতেছে এবং ইহার স্থলে বহুবিজ্ঞাপনমুখরিত নানাবিধ তৈল অধুনা তাঁহাদের কেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এই সকল তৈলের মধ্যে যথার্থ তৈল বলিয়া যে জিনিস, তাহা আছে কিনা, তাহা অনেক সময়ে পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। তবে বিলাতী কৌশলে বিদূরিতগন্ধ কেরোসিন্ জাতীয় খনিজ তৈল যে অনেক সময়ে উহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। এরূপ তৈল প্রতিদিন ব্যবহৃত হইলে কোন কুফল প্রসব করিবে কিনা, মস্তিষ্কের কোনরূপ নূতন পীড়ার আবির্ভাব হইবে কিনা, অথবা

পরচুলাব্যবসায়ীদিগের সহিত এই সকল তৈলব্যবসায়ী-দিগের ব্যবসায়সূত্রে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, ইহা নির্ণয় করিবার ভার ভবিষ্যবংশীয় চিকিৎসকদিগের উপর অর্পিত রহিল। তবে কেরোসিন্ জাতীয় এই সকল খনিজ তৈলের ব্যবহারে তৈল-ব্যবহারের যে উদ্দেশ্য, তাহা যে সাধিত হয় না, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। আমাদিগের শরীরে যে মেদ (Fat) আছে, তাহা তৈলজাতীয়। ইহা দ্বারা শরীর রক্ষা ব্যতীত শারীরিক তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি প্রয়োজন মত উৎপন্ন হয়। প্রকৃত তৈল মাখিলে উহার কিয়দংশ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাখন জাতীয় খাদ্যের কার্য্য করে। অনেক স্থলে ডাক্তারেরা এই কারণে কড্ লিভার্ তৈল গায়ে মাখিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

নারিকেল তৈল কিছুদিন থাকিলে বিকৃত হইয়া দুর্গন্ধ-যুক্ত হয়; এরূপ তৈলের ব্যবহার অনেকের পক্ষে যে অপ্রীতি-কর হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আজকাল বিশেষভাবে সংস্কৃত নারিকেল তৈল বাজারে বিক্রীত হইতেছে। ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে এবং ইহার সহিত কিঞ্চিৎ গন্ধতৈল মিশাইয়া লইলে মাথায় ও গায়ে মাখিবার বেশ উপযুক্ত হয়। অনেকে ঘরে মসলা মিশাইয়া যে নারিকেল তৈল প্রস্তুত করেন, তাহা ব্যবহারের অনুপযোগী নহে।

তৈল মাখিলে জামা কাপড় শীঘ্র ময়লা হইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় অনেকেই তৈল ব্যবহারের বিরোধী। স্নান করিবার সময় কর্কুরে গামছা দ্বারা গা ঘসিলে সমস্ত তৈল উঠিয়া যাইবার কথা। আবার যদি স্নানের পর শুষ্ক কাপড় বা তোয়ালে দিয়া গা উত্তমরূপে মোছা যায়, তাহা হইলে গায়ে কিছুমাত্র তৈল লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। স্নানের সময় যাঁহারা সাবান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের গায়ে মোটেই তৈল লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তবে ভাল সাবান ব্যবহার না করিলে গা খস্‌খসে হয় এবং গায়ে (বিশেষতঃ শীতকালে) "খড়ি" ফোটে। যাঁহাদের সাবান ব্যবহার করিতে আপত্তি আছে, তাঁহারা সাবানের পরিবর্ত্তে বেসন ব্যবহার করিতে পারেন। বেসনে গায়ের ময়লা ও চুলের আঠা সহজেই উঠিয়া যায়, অথচ সাবান মাখিলে গা যেরূপ খস্‌খসে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। কিন্তু আজকালকার দিনে বেসনের গুণ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে ভরসা হয় না। সম্ভবতঃ নারিকেল তৈলের সুখ্যাতি করিয়া আমরা শ্রদ্ধাস্পদা পাঠিকাদিগের বিরাগভাজন হইয়াছি; তাহার উপর আবার বেসনের গুণ বর্ণনা করিলে, হয়ত তাঁহাদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে জল মাত্রেই সাবান

ঘসিলে ভাল ফেনা হয় না। কোন কোন জলে সাবান ঘসিবামাত্র ভাল ফেনা হয়, যেমন বৃষ্টির জল বা কলিকাতার কলের জল। এরূপ জলকে ইংরাজীতে Soft water কহে। আমরা এইরূপ জলকে "কোমল জল" কহিব। যতক্ষণ সাবানের ভাল ফেনা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ বা বস্ত্রাদিতে সাবান ঘসিলে উহার মলিনতা অপনীত হয় না। এমন অনেক কূপের বা পুষ্করিণীর জল দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাতে অনেকক্ষণ সাবান না ঘসিলে ফেনা উৎপন্ন হয় না; সুতরাং এরূপ জল, স্নান বা বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইলে, অনেক সাবান নষ্ট হইয়া যায়। ইংরাজীতে এরূপ জলকে Hard water কহে। আমরা ইহাকে "কঠিন জল" বলিব।

যদি স্নানের জল এইরূপ "কঠিন" হয়, তবে উহাকে ফুটাইয়া শীতল করিয়া লইলেই উহার "কঠিনত্ব" কমিয়া যাইবে। তখন ইহাতে সাবান ঘসিলে সহজে ফেনা হইয়া গাত্র পরিষ্কৃত হয় এবং অধিক সাবানও নষ্ট হয় না। কাপড় কাচিবার জলও ফুটাইয়া উহাতে অল্প পরিমাণ সোডা দিলে অল্প সাবানের ব্যবহারেই কাপড় পরিষ্কৃত হয়।

প্রত্যহ এক সময়ে স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নানের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; যে সময়ে যাঁহার অভ্যাস, তিনি

সেই সময়ে স্নান করিতে পারেন। তবে অধিক পরিশ্রমের পর, দীর্ঘ উপবাসের পর অথবা পূর্ণ আহারের পর স্নান করা অবৈধ। অনেকেই প্রাতঃস্নানের পক্ষপাতী; গ্রীষ্মপ্রধানদেশে প্রাতঃস্নান অতিশয় সুখকর এবং শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তিজনক। বিশেষতঃ যাঁহারা দূরে যাইয়া নদী বা পুষ্করিণীতে স্নান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রাতঃস্নানই প্রশস্ত, কারণ বেলা হইলে রৌদ্রের জন্য যাতায়াতের কষ্ট হয়।

যাঁহাদের প্রত্যহ স্নান সহ্য হয় না, তাঁহাদের ভিজা গামছা দিয়া দিবসে ২।৩ বার সমস্ত শরীর ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের সহ্য হয়, তাঁহাদের পক্ষে গ্রীষ্মকালে দুইবার স্নান উপকারী ভিন্ন অপকারী নহে।

প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে প্রাতঃকৃত্যসমাধানের অভ্যাস স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ অনুকূল। ইহা দ্বারা শরীর ও মন উভয়ই প্রফুল্ল থাকে। বিশেষ অর্থেই এখানে প্রাতঃকৃত্য কথাটির ব্যবহার করিলাম। দিবসে যে সময়েই মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হউক না কেন, ঐ বেগ ধারণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রিয়া সমাধান করিলে আমরা নানা রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়ার বেগ ধারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয়বিধ ভৈষজ্যশাস্ত্রের মতে

মহা অনিষ্টকর। এ সম্বন্ধে চরক যাহা লিখিয়াছেন; তাঁহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ন বেগান্ধারয়েদ্ধীমান্ জাতান্ মূত্র পূরীষয়োঃ।
ন রেতস্য না বাতস্য ন বম্যাঃ ক্ষবথোন চ॥
নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেণ চ॥"

(চরক—"ন বেগান্ ধারণীয়" অধ্যায়)

অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মল, মূত্র, রেতঃ, বায়ু, বমি, হাঁচি, উদ্গার, হাই, ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা এবং পরিশ্রমজনিত শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগধারণ করিবেক না।

তবে কার্য্যগতিকে বা স্থলবিশেষে এই সকল স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়ার বেগধারণ অপরিহার্য্য হইলে যত শীঘ্র সম্ভব, উহাদিগের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মুখ-প্রক্ষালন।

যদি প্রত্যূষে মুখ-প্রক্ষালন করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্নান করিবার সময় এই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করা উচিত। সুদৃঢ় দন্তপংক্তি ভারত-বাসীর একটি অমূল্য সম্পত্তি। ইয়ুরোপে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, উভয়েরই মধ্যে দাঁতের অসুখ এবং কৃত্রিম দন্তের সংখ্যা যেমন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, ভারত-বাসীদের মধ্যে উহা তেমনই বিরল। মেডিকাল্ কলেজে যে সাহেব আমাদিগের দন্ত-চিকিৎসার অধ্যাপক ছিলেন, তিনি বারবার আমাদিগকে বলিতেন যে, এদেশের লোকের মধ্যে যেরূপ সুসজ্জিত ও সুদৃঢ় দন্তপংক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, বিলাতে তাহার নিতান্ত অভাব। দন্তশূল, মাড়িফোলা, দাঁতে পোকধরা ইত্যাদি রোগ এদেশে খুব কম দেখা যায়। সুদৃঢ় দন্তপংক্তি খাদ্য-পরিপাকের যে বিশেষ সহায়তা সম্পাদন করে, তাহা আমি আহারতত্ত্ব আলোচনা করিবার সময় বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। আমাদিগের অযত্নে যদি আমাদের এরূপ অমূল্য সম্পত্তি নষ্ট নয়, তাহা হইলে তাহার জন্য আমরাই দায়ী।

দাঁতন ও মাজন ব্যবহার করা দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। দাঁতন দ্বারা দাঁতের ফাঁকের মধ্যে যাহা কিছু ময়লা ও ভুক্ত দ্রব্যের অংশ সঞ্চিত থাকে, তাহা দূরীভূত হয় এবং মাজন দ্বারা দন্ত পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। আপত্তি না থাকিলে দাঁতনের পরিবর্ত্তে ব্রুস্ (Tooth-brush) ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যহ ব্রুস্‌খানি সাবানের জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া না রাখিলে উহা পুনঃ ব্যবহারের উপযুক্ত হয় না। এতদ্ব্যতীত একই ব্রুস্ প্রত্যহ মুখের ভিতর দিতে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। এরূপ স্থলে প্রত্যহ একটা করিয়া নূতন দাঁতন ব্যবহার করিলে কোন অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

চরক দন্তধাবন সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন :—

"আপোথিতাগ্রং দ্বৌ কালৌ কষায়ং কটুতিক্তকং।
ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্॥
নিহন্তি গন্ধবৈরস্য জিহ্বাদন্তাস্যজং মলং।
নিষ্কৃষ্য রুচিমাধত্তে সদ্যো দন্ত বিশোধনং॥
সুবর্ণোরূপ্যতাম্রানি ত্রপুরীতি ময়ানি চ।
জিহ্বা নির্লেখনানি স্যুরতীক্ষ্ণান্যনৃজূনি চ॥

জিহ্বা মূলগতং যচ্চ মলমুচ্ছ্বাসরোধি চ।
সৌগন্ধং ভজতে তেন তস্মাজ্জিহ্বাং বিনির্লিখেৎ ॥
করঞ্জ করবীরার্কমালতীককুভাসনাঃ।
শস্যন্তে দন্তপবনে যে চাপ্যেবংবিধা দ্রুমাঃ ॥"

চরক—সূত্রস্থান।

অর্থাৎ প্রতিদিন দুইবার করিয়া দন্তধাবন করিবে। দাঁতন কাঠী কষায়, কটু বা তিক্ত রস হওয়া আবশ্যক; ইহা দ্বারা দন্তশোধন হয়। এরূপ ভাবে দন্ত মার্জন করিবে যেন মাড়ীতে আঘাত না লাগে। দন্তধাবন করিলে মুখের দুর্গন্ধ ও রসহীনতা দূর হয়, জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মল বহির্গত হইয়া রুচি হয় এবং দন্তগুলি সদ্য সদ্য বিশুদ্ধ হয়। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা বা পিত্তল নির্ম্মিত জিহ্বা-নির্লেখন (জিভ্ ছোলা) ব্যবহার করা যাইতে পারে; ইহা যথোচিত পাতলা ও বাঁকা হইলে জিহ্বামূলের মল এবং উচ্ছ্বাসবিরোধক মলিন পদার্থ দূর হইয়া যায় এবং মুখ সুগন্ধযুক্ত হয়। করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জ্জুন, পিয়াসাল এবং তদ্রূপ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট দন্তমার্জনী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এদেশে নিমগাছ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে; নিমের দাঁতন

নরম, উহা ব্যবহার করিলে দন্ত পরিষ্কৃত এবং উহার তিক্ত রসে মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

কাঠের কয়লার গুঁড়া সাধারণ লোকে সচ্ছন্দে মাজনরূপে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহার খরচ কিছুই নাই, অথচ কয়লার দুর্গন্ধনাশকতা গুণ থাকায় মুখ বেশ পরিষ্কৃত থাকে। অনেকে ঘুঁটের ছাই মুখ ধুইবার জন্য ব্যবহার করেন, কিন্তু ক্ষারধর্ম্মাক্রান্ত (Alkaline) বলিয়া উহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে দাঁতের মাড়ী ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। চা-খড়ি উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া উহার সহিত অল্প পরিমাণ ফট্‌কিরী এবং ডালচিনির গুঁড়া ও কর্পূর অথবা পিপারমিণ্ট্ বা ইউকালিপ্টস্ তৈল মিশ্রিত করিয়া লইলে সুগন্ধি উত্তম দন্তমার্জ্জন প্রস্তুত হইতে পারে। গৃহস্থ মাত্রেই স্বল্পব্যয়ে এইরূপ দন্তমার্জ্জন প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন।

এস্থলে আর একটী কথা আমার বলিবার আছে। স্নানের সময় অথবা প্রাতঃকালে একবার মুখ ধুইলেই যে দাঁতের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, তাহা নহে। যতবার কিছু খাওয়া যায়, তাহার পরেই উত্তমরূপে কুলকুচা করিয়া মুখ পরিষ্কৃত করিয়া ফেলা উচিত। দাঁতের মধ্যে কোন সময়ে খাদ্য বা পানের অংশ আট্‌কাইয়া থাকিতে

দিবে না, কিন্তু উহা বাহির করিবার জন্য ধাতুনির্ম্মিত অথবা অন্য কোন প্রকার কঠিন "দাঁতখুঁটা" ব্যবহার না করিয়া নরম খড়িকা ব্যবহার করাই উচিত। দাঁতের মধ্যে খাদ্যের অংশ বা চিবান পান আট্‌কাইয়া থাকিলে উহা শীঘ্র বিকৃত হইয়া এমন বিষাক্ত রস উৎপাদন করে যে, তাহার সংস্পর্শে মাড়ী ফুলিয়া উঠে, দন্তশূল উপস্থিত হয় এবং দাঁত ক্রমশঃ আল্‌গা হইয়া যায়। পাশ্চাত্য প্রথায় টেবিলে বসিয়া খাইবার পর কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইবার সুবিধা হয় না; দুই হস্তের দশাঙ্গুলির অগ্রভাগ ছোট পেয়ালায় রক্ষিত জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়াই আমরা আচমনের কার্য্য শেষ করিয়া থাকি। এরূপ অস্বাস্থ্যকর প্রথা অবলম্বন করিলে আমাদের দাঁত যে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? টেবিলে বসিয়া খাইতে কোন দোষ নাই, তবে খাইবার পর সাহেবীধরণে আচমন না করিয়া ভাল করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলা একান্ত আবশ্যক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রীতিনীতিগুলির সামঞ্জস্য করিয়া লইলে উপকার ভিন্ন অপকার দর্শে না।

আহার।

মৎপ্রণীত "খাদ্য" নামক পুস্তকে খাদ্য কাহাকে বলে, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, পরিপাকক্রিয়া, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের গুণ, বয়সভেদে খাদ্যের পরিমাণ, রন্ধন, পরিমিত ভোজন, আমিষ ও নিরামিষ ভোজন, ভেজাল খাদ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। এই পুস্তকে ঐ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা সুসঙ্গত ও সম্ভবপর বলিয়া মনে করি না। এস্থলে আহার সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

আমরা সর্ব্বদাই কোন না কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য না করিলেও শারীরিক যন্ত্রাদি আপনা হইতেই নানাবিধ দৈহিক ক্রিয়া নিয়ত সম্পাদন করিতেছে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বাসক্রিয়া-জনিত ফুস্‌ফুসের প্রসারণ ও সঙ্কোচন, খাদ্যের পরিপাক প্রভৃতি স্বাভাবিক দেহক্রিয়াগুলির সমাধা আমাদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, কোনরূপ শারীরিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই উহা দ্বারা আমাদের দেহ অল্পবিস্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা খাদ্য গ্রহণ করিয়া এই ক্ষয়ের পরিপোষণ করিয়া থাকি।

অতি ক্ষুদ্রকায় নবজাত শিশুকে আমরা ক্রমশঃ পুষ্টদেহ বালক এবং উন্নতদেহ, বিশালবক্ষ, দীর্ঘভুজ যুবকে পরিণত হইতে দেখিতে পাই। ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের সমধিক বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে, অস্থিসমূহ দৃঢ় হয় ও আয়তনে বিস্তৃতি লাভ করে, পেশীসমূহ পুষ্ট ও সবল হয় এবং শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রাদির আকারগত বৃদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে। আহার দ্বারাই শরীর এই বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করে। এই কারণে শৈশব ও কিশোর অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ সময়ে যথোচিত খাদ্যের অভাব হইলে অস্থি, পেশী, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রাদির কোনটিই সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং চিরজন্মের মত ঐ শিশুর দেহ খর্ব্ব, অপরিপুষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। এই জন্য শিশু ও বালকদিগের খাদ্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদিগের দেহ-রক্ষার জন্য তাপের প্রয়োজন হয়। মৃতদেহে তাপের অভাব বলিয়া উহা স্পর্শে শীতল বোধ হয়। জীবিত মনুষ্যের দেহ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে। আমরা খাদ্য হইতে এই তাপ প্রাপ্ত হই। জীর্ণ খাদ্য রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে উহা নিশ্বাসগৃহীত শোণিতস্থিত অক্সিজেনের

দ্বারা মৃদু-ভাবে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করে ; এইরূপে আমাদিগের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। খাদ্যই দেহতাপ-উৎপত্তির আকর।

আমরা যে কোন কার্য্য করি না, উহা সম্পাদন করিবার জন্য অল্পবিস্তর শক্তির প্রয়োজন হয়। শারীরিক তাপ রূপান্তরিত হইয়াই আমাদিগের কার্য্য করিবার শক্তি উৎপন্ন হয়। পাথুরে কয়লার মধ্যে যে অব্যক্ত শক্তি (Potential energy) নিহিত থাকে, দগ্ধ হইবার সময় তাহা প্রথমতঃ তাপে পরিণত ও তৎপরে কার্য্য করিবার শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া কল চালাইতে সমর্থ হয়। আমাদের খাদ্যের মধ্যে এইরূপ অব্যক্ত শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ভুক্ত পদার্থ শরীর মধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়াই তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদন করে।

আমরা জাগ্রদবস্থায় নানাবিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া থাকি। সময়ে সময়ে উহা গুরুতর চিন্তাভারে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। এইরূপ মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে ; বিশ্রাম ও যথোচিত খাদ্য গ্রহণ করিলেই মস্তিষ্ক পুনরায় সতেজ হইয়া উঠে। বহুকাল ব্যাপিয়া যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাব ঘটিলে শরীর যেমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্কও সেইরূপ হীনশক্তি হইয়া পড়ে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক ক্ষয়-নিবারণ, দেহের বৃদ্ধি-সাধন, দেহতাপ-জনন, কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদন এবং মস্তিষ্কের তেজঃসংরক্ষণ, ইহাদের প্রত্যেকটির জন্য খাদ্যগ্রহণের প্রয়োজন হয়।

আমরা যে সকল পদার্থ খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, তাহাদের সকলগুলি সমভাবে এই কয়টি কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী নহে। খাদ্যস্থিত যে সকল উপকরণ এই সকল কার্য্যের উপযোগী, তাহারা সমপরিমাণে সকল খাদ্যের মধ্যে থাকে না। এ সম্বন্ধে দুগ্ধই একমাত্র আদর্শ খাদ্য; ইহার মধ্যে উপর্য্যুক্ত কার্য্যাবলী নির্ব্বাহ করিবার সমস্ত উপকরণই যথাপরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই জন্য কেবল দুগ্ধকেই আমরা "পূর্ণখাদ্য" বলিয়া থাকি।

শিশুর শরীর রক্ষা ও উহার বৃদ্ধি সাধনের জন্য দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

মাংসজাতীয় খাদ্যের দ্বারা সাধারণতঃ শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও বৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে। মাংসের যে গুণ, দুগ্ধের মধ্যে যে ছানা থাকে তাহারও সেই গুণ।

তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্য দ্বারা শারীরিক তাপ উৎপন্ন হয় এবং উহাই রূপান্তরিত হইয়া কার্য্য করিবার শক্তিতে পরিণত হয়। দুগ্ধের মধ্যে যে মাখন ও দুগ্ধ-

শর্করা থাকে, তাহারা এই দুইজাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভূত। মাখন ও দুগ্ধশর্করা হইতে শিশুর শারীরিক তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

লবণজাতীয় খাদ্য অস্থি-নির্ম্মাণ, রক্ত-পরিষ্কার এবং খাদ্য-পরিপাকের জন্য পাচকরস প্রস্তুত করিয়া থাকে। দুগ্ধের মধ্যে লবণজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং উহার দ্বারাই শিশুর ক্ষুদ্র দেহ ও কোমল অস্থি দৃঢ়তা ও বিশালতা প্রাপ্ত হয়।

জল ভুক্ত-দ্রব্যকে তরল করিয়া রক্তমধ্যে গৃহীত হইবার উপযোগী করে এবং জলের সাহায্যেই শরীরের দূষিত পদার্থ মল, মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতির আকারে নির্গত হইয়া যায়। দুগ্ধের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ জল আছে, সুতরাং শিশুদিগের পৃথগ্‌ভাবে জল পান করিবার আবশ্যকতা হয় না।

এতদ্ব্যতীত প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভিটামিন্ নামক এক প্রকার অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে। ইহা দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন না হইলেও শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। খাদ্যদ্রব্যে ইহার অভাব হইলে বেরিবেরি, স্কর্ভি প্রভৃতি নানারূপ উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধের মধ্যে শিশুর

শরীর-রক্ষার উপযোগী সমস্ত উপকরণই যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে নানা কারণে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর করা চলে না, কারণ তাহা হইলে এত অধিক দুগ্ধ পান করিবার প্রয়োজন হয় যে, তন্মধ্যস্থিত কতকগুলি উপকরণ আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। সুতরাং শিশু ব্যতীত অপর কেহ কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর করিলে তাহার পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ প্রত্যহ একরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে আহারে বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা।

যখন একমাত্র দুগ্ধ ব্যতীত অপর কোনও খাদ্যদ্রব্যে, মাংস, তৈল, শর্করা ও লবণ, এই চারিজাতীয় উপকরণ একত্রে শরীর রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে না, তখন আমরা মাছ, মাংস, ডাল, চাউল, ঘৃত, তৈল, শর্করা প্রভৃতি কোন এক প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিলে আমাদের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যদি শুদ্ধ মাংস ভক্ষণ করি, তাহা হইলে মাংসজাতীয় উপকরণ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও শর্করাজাতীয় উপকরণের নিতান্ত অভাব উপস্থিত হয়, কারণ মাংসের মধ্যে শর্করাজাতীয়

উপকরণ একেবারেই নাই। অধিকন্তু মাংসজাতীয় উপকরণ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে একপ্রকার বাতরোগ (Gout) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুনশ্চ আমরা যদি কেবল ভাত খাই, তাহা হইলে শর্করাজাতীয় উপকরণ আহরণের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না বটে, কিন্তু মাংসজাতীয় ও তৈলজাতীয় উপকরণের নিতান্ত অসঙ্গতি ঘটে, কারণ ভাতের মধ্যে ঐ দুই জাতীয় উপকরণ অতি অল্প পরিমাণেই আছে। ভাত হইতে মাংসজাতীয় ও তৈলজাতীয় উপকরণ যথাপ্রয়োজন সংগ্রহ করিতে হইলে এত অধিক ভাত খাইবার প্রয়োজন হয় যে, তন্মধ্যস্থিত অত্যধিক পরিমাণ শর্করাজাতীয় উপকরণ (Starch) পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া অজীর্ণ, বহুমূত্র প্রভৃতি উৎকট রোগ উৎপাদন করে। অতএব আমাদিগের বয়স ও রুচিভেদে নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী হইতে উপর্য্যুক্ত চারিজাতীয় উপকরণ যথাপরিমাণে সংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা হয়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে নানাজাতীয় খাদ্যসামগ্রী একত্রে মিশ্রিত করিয়া (Mixed diet) গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ।

আমরা মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ওট্‌মিল্, যব, ময়দা, ছানা প্রভৃতি সামগ্রী হইতে মাংসজাতীয় উপকরণ ; ঘৃত, মাখন, চর্ব্বি, সরিষার তৈল, তিল তৈল, চিনাবাদামের তৈল

প্রভৃতি পদার্থ হইতে তৈলজাতীয় উপকরণ; চিনি, গুড়, ময়দা, চাল, আলু প্রভৃতি দ্রব্য হইতে শর্করাজাতীয় উপকরণ এবং খাদ্যমাত্রেরই মধ্যে যে অল্পাধিক পরিমাণ লাবণিক পদার্থ অবস্থিতি করে তদ্দ্বারা, ও খাদ্যের সহিত প্রয়োজনানুরূপ লবণ মিশ্রিত করিয়া লবণজাতীয় উপকরণ শরীর রক্ষার উপযোগী পরিমাণে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই।

আমাদিগের সকল খাদ্যসামগ্রীর মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণ জল থাকে; এতদ্ব্যতীত আমরা জল ও অন্যান্য পানীয় তৃষ্ণা-নিবারণার্থ পান করিয়া থাকি। ইহা দ্বারাই আমাদিগের শরীরে জলের অভাবের পূরণ হইয়া যায়।

এইরূপে পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য দুগ্ধ না খাইলেও উপর্য্যুক্ত বিভিন্নজাতীয় খাদ্যসামগ্রী হইতে শরীররক্ষার উপযোগী চারিজাতীয় উপকরণ যথাপরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইতে সমর্থ হয়। এক্ষণে দেখা যাউক কোন্‌জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমাদিগের শরীরের সমস্ত অভাব পূর্ণ হইতে পারে এবং আমরা পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হই।

শরীর নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যে সকল পদার্থ আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের পরিমাণ পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিলে সেই ক্ষয় পূরণ

করিবার জন্য কত পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তাহা আমরা সহজেই স্থির করিতে পারি। কার্ব্বন্ ও নাইট্রোজেন্ এই সকল পরিত্যক্ত পদার্থের প্রধান উপাদান, সুতরাং যদি আমরা পরীক্ষা দ্বারা কত কার্ব্বন্ ও কত নাইট্রোজেন্ দিবসে আমাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছে তাহা স্থির করি, তাহা হইলে যে পরিমাণ খাদ্যের মধ্যে ঐ পরিমাণ কার্ব্বন্ ও নাইট্রোজেন্ থাকিবে, তাহাই ভক্ষণ করিলে আমাদিগের শরীরের দৈনিক ক্ষয়ের পূরণ হইবার কথা।

একজন সুস্থদেহ নিয়মিত পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের দেহ হইতে দিবসে প্রায় ২৫০ হইতে ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ এবং ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বন্, মলমূত্র ও অন্যান্য দূষিত পদার্থের আকারে, পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব আমাদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে, তন্মধ্যে অন্ততঃ ঐ পরিমাণ কার্ব্বন্ ও নাইট্রোজেন্ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কোন একজাতীয় খাদ্য হইতে আমরা এই পরিমাণ নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বন্ একত্রে প্রাপ্ত হইতে পারি না। তিন পোয়ার কিঞ্চিদধিক মাংস খাইলে আমরা ২৫০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ পাইতে পারি বটে কিন্তু ঐ পরিমাণ মাংস হইতে ১৪০০ গ্রেণের অধিক কার্ব্বন্

সংগ্রহ করিতে পারি না। পুনশ্চ তিন পোয়া চাউল হইতে আমরা ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বন্ পাইতে পারি, কিন্তু ৭৮ গ্রেণের অধিক নাইট্রোজেন্ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইটি খাদ্যসামগ্রীর কোন একটির দ্বারা আমাদের শারীরিক ক্ষয়ের পূরণ হইতে পারে না। যদি আমরা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রয়োজনীয় পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করি, তাহা হইলে উপর্য্যুক্ত ক্ষতির পূরণ হইয়া শরীর পোষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত চারিজাতীয় উপকরণ কোন্ খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে কত পরিমাণে আছে, তাহা জানা থাকিলে, কোন্ খাদ্য কত পরিমাণে গ্রহণ করিলে ২৫০ হইতে ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ এবং ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বন্ সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা হইল না। খাদ্যসম্বন্ধীয় যে কোন পুস্তকে, বিবিধ খাদ্যসামগ্রীতে নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বন্ শতকরা কত পরিমাণে থাকে, তাহার বিস্তৃত তালিকা সন্নিবেশিত আছে; জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাহা সহজেই অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিবেন।

পরিশ্রমভেদে অল্লাধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়, ইহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যকতা হয় না। মোটামুটি ইহা

নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, নিয়মিত পরিশ্রমী সুস্থদেহ যুবাপুরুষের শরীরের ওজনের প্রতি সেরে প্রায় ১½ কাঁচ্চা পরিমাণ আহার্য্য দ্রব্যের আবশ্যকতা হয়। যদি ঐ ব্যক্তির ওজন ১ মণ ৩০ সের হয়, তাহা হইলে এই হিসাবে দিবসে তাহার প্রায় দেড় সের খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অধিক পরিশ্রম করিলে অবশ্য এতদপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী এরূপভাবে ব্যবস্থিত হওয়া উচিত যে, ঐ ব্যক্তি উহা হইতে ২৫০ হইতে ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ ও ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বন্ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

বাঙ্গালীদিগের শরীরের আয়তন ও ওজন ইয়ুরোপবাসীদিগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং সাধারণ বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যের মধ্যে ২৫০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ থাকিলেই চলিতে পারে। যুবকদিগের খাদ্যে ইহা অপেক্ষা অধিক নাইট্রোজেন্ থাকা আবশ্যক। একজন নিয়মিত পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক বাঙ্গালী যে প্রকার খাদ্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিলে ২৫০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ এবং ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বন্ শরীরের দৈনিক ক্ষয়-পূরণের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে, হিসাব করিয়া তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই পরিমাণ খাদ্যকে রুচি ও সুবিধামত ভাগ করিয়া দিবসে অন্ততঃ তিন বারে গ্রহণ করা উচিত। যাঁহারা নিরামিষাশী, তাঁহারা

মাছ বা মাংসের পরিবর্ত্তে ডাল বা ছানা ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে এরূপ বাঁধাধরা তালিকা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক না হইবারই কথা। রুচি, পরিপাকশক্তি, অভ্যাস প্রভৃতি নানা কারণের উপর খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকার নির্ভর করে। আমাদের তালিকা এ বিষয়ের একটা স্থূল সত্য নির্দ্দেশ করিতেছে মাত্র।

একজন নিয়মিত পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক খাদ্যের তালিকা।

চাউল	...	...	৩ ছটাক
আটা বা ময়দা...		...	৫ „
ডাল	...	..	১½ „
মাছ বা মাংস ...		...	২½ „
আলু	...	...	২ ছটাক
অন্য তরকারি ...		...	২ „
তৈল বা ঘৃত	..	...	½ „
দুগ্ধ	...	...	৮ „
লবণ	...	...	¼ „
মশলা	...	...	যথা পরিমাণ
অম্ল দ্রব্য	...	...	যথারুচি

আমাদের দেশের ছাত্রদিগের খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ অনেক স্থলেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত নহে, এজন্য তাহাদিগের মধ্যে যেমন কেহ কেহ অত্যধিক স্থূল হইয়া পড়ে, সেইরূপ আবার অনেকেই সম্যক্ শারীরিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই নগরের ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছাত্রদিগের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে যে আহার প্রদত্ত হয়, পরীক্ষায় দৃষ্ট হইয়াছে যে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের খাদ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ইংরাজ ছাত্রদিগের অপেক্ষা অনেক কম থাকে। এইজন্য ছাত্র-জীবনে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রেরা শারীরিক দৈর্ঘ্য, বক্ষের প্রসারতা ও দেহের ওজন সম্বন্ধে যেরূপ উন্নতি লাভ করিতে থাকে, বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে ২।৪ জন ব্যতীত অপর কাহারো মধ্যে সেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না, বরঞ্চ অনেক স্থলে অবনতির লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কলিকাতার কোন একটি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ছাত্রাবাসে যে খাদ্য প্রদত্ত হয়, আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে তাহার মধ্যে ১৫০ গ্রেণের অধিক নাইট্রোজেন্ থাকে না। ৩০০ গ্রেণের স্থানে এত অল্প নাইট্রোজেন্ পাইলে ছাত্রদিগের শারীরিক বৃদ্ধির যে অন্তরায় ঘটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অবশ্য যাহারা অর্থব্যয় করিতে সমর্থ, তাহারা বাহির হইতে বিবিধ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া এই অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে কিন্তু

সামান্য অবস্থার ছাত্রদিগকে ছাত্রাবাসের খাদ্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার প্রথা সর্ব্বথা নিরাপৎ নহে। ছাত্রাবাসের খাদ্যের এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যেন বাহির হইতে কোনরূপ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের অবসর ও আবশ্যকতা একেবারেই না থাকে। এজন্য আমাদিগের বিবেচনায় কলিকাতার ছাত্রাবাসসমূহের খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ উভয়েরই সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। মাছ, মাংস, ডাল প্রভৃতি যে কোন নাইট্রোজেন্‌ঘটিত খাদ্যের কোন একটির পরিমাণের বৃদ্ধি করিয়া দিলে এবং ভাতের পরিমাণ কমাইয়া তৎপরিবর্ত্তে রুটীর ব্যবস্থা করিলে শীঘ্র ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিবার আশা করা যায়।

আমি ইতিপূর্ব্বে একজন নিয়মিত পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক বঙ্গবাসীর দৈনিক খাদ্যের পরিমাণের নির্দ্দেশ করিয়াছি। অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে খাদ্যের পরিমাণের বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিবার জন্য তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্য (Fat, starch and sugar) মাংসপেশীর শক্তির

যেরূপ বৃদ্ধিসাধন করে, মাংস প্রভৃতি অন্য জাতীয় খাদ্য হইতে তদনুরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা মনে করেন যে মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিলে, আমরা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারি না, তাঁহাদিগের ধারণা ভ্রমশূন্য নহে। শারীর-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ খাদ্যকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণীর খাদ্যাদি শারীরিক উপাদান (পেশী, অস্থি ইত্যাদি) গঠনের সহায়তা করে; মাছ, মাংস, ছানা (Casein), লবণ বিশেষ ও জল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর খাদ্যকে Tissue-former (শরীরগঠক খাদ্য) কহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য হইতে আমরা শারীরিক তাপ ও পরিশ্রম করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই। মাখন, চর্ব্বি, তৈল, ঘৃত, ভাত, রুটী, আলু, চিনি, গুড় প্রভৃতি তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর খাদ্যকে Energy and heat producer (তাপ ও শক্তি উৎপাদক খাদ্য) কহে। অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিলে শারীরিক উপাদান সমূহের যে ক্ষয় সাধিত হয়, তাহার পূরণের জন্য মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিমাণের বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবারও বিশেষ

প্রয়োজন হইয়া থাকে। ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে, মল্লভূমিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অপর যেখানেই পেশী সমূহের সমধিক চালনার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তথায় এই সত্য অভ্রান্ত পরীক্ষা দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বয়োভেদে, স্ত্রীপুরুষভেদে, ঋতুভেদে, দেশভেদে, জাতিভেদে, ধর্ম্মভেদে ও রুচিভেদে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের অল্পবিস্তর তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ২৫।৩০ বৎসরের পর আর আমাদিগের শরীরের বৃদ্ধি সাধিত হয় না, সুতরাং বালক ও যুবকদিগের শরীরের বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির তৎপরিমিত খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্য বালক ও যুবকদিগের যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের (বিশেষতঃ মাংসজাতীয় খাদ্য, যেমন মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, ডাল ইত্যাদি) অভাব হইলে তাহাদিগের দেহ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মনুষ্যের পক্ষে তাহার সমস্ত খাদ্যের পাঁচ ভাগের একভাগ মাংস-জাতীয় খাদ্য হইলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকের খাদ্যের চারি ভাগের একভাগ মাংসজাতীয় খাদ্য না হইলে তাহার শারীরিক অভাবের পূরণ হয় না। এই জন্য বালকদিগের আহার বিষয়ে আমাদিগের সবিশেষ দৃষ্টি রাখা

কর্ত্তব্য। বয়সের প্রথম অবস্থায় যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাব জাতিগত দৌর্ব্বল্যের এক প্রধান কারণ। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, বালকদিগকে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য প্রদান করিলে তাহাদিগের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে কেবল যে অজীর্ণাদি রোগ উৎপন্ন হয় তাহা নহে, শরীরে অধিক পরিমাণ মেদ (Fat) সঞ্চিত হইয়া বালককে অত্যধিক স্থূল সুতরাং একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে। অনেক সময়ে স্নেহাধিক্য বশতঃ বালকের জননী সন্তানকে অত্যধিক পরিমাণ লুচি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন খাইতে দিয়া তাহাকে চিৎ-জন্মের মত দুর্ব্বল-দেহ, শ্রমাসহিষ্ণু ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলেন। অবশ্য বালকেরা স্বভাবতঃ মিষ্টান্ন খাইতে ভাল বাসে ; তাহার কারণ এই যে তাহারা চঞ্চল স্বভাব, সুতরাং সর্ব্বদা অঙ্গচালনা করে বলিয়া শক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত তাহাদিগের শর্করাজাতীয় খাদ্যের অধিক প্রয়োজন হয়। কিন্তু বালকদিগের পক্ষে মিষ্টান্ন উপকারী হইলেও উহার অপরিমিত ব্যবহার প্রভূত অনিষ্ট উৎপাদন করে।

বৃদ্ধ বয়সে পরিশ্রমের কার্য্য কমিয়া যায় এবং শারীরিক যন্ত্রাদিও মৃদুভাবে স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, এজন্য

এ বয়সে খাদ্যের পরিমাণ আপনা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া আইসে।

স্ত্রী-পুরুষ ভেদে খাদ্যের পরিমাণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য হইয়া থাকে। পুরুষেরা যত খাদ্য গ্রহণ করে, সমান বয়সের স্ত্রীলোকদিগের সচরাচর তাহা অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ কম খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনী-দিগের আহার সম্বন্ধে গৃহস্বামীদিগের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। সাহেবেরা স্ত্রী-পুরুষে একত্রে আহার করেন। আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতী সমাজের প্রথা অনুসারে প্রত্যেক খাদ্যসামগ্রী অগ্রে স্ত্রীলোকের দ্বারা গৃহীত হইলে তৎপরে পুরুষেরা তাহার অংশ গ্রহণ করেন। আমাদিগের হিন্দু পরিবারে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের একত্রে ভোজন করিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। পুরুষদিগের আহার শেষ হইলে পর স্ত্রীলোকেরা ভোজন করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা কিছু ভাল খাদ্য-সামগ্রীর আয়োজন থাকে, পুরুষদিগের ভোজনের সময় তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়; স্ত্রীলোকদিগের জন্য শাকান্ন ব্যতীত অধিক কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আমাদিগের গৃহদেবীগণ যেমন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহা আমাদিগের ভোগের জন্য অকাতরে অর্পণ করেন, তাঁহাদের

যথোপযুক্ত আহার হইল কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং তাহার যথোচিত বন্দোবস্ত করা আমাদিগেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। যে জননীকে স্তন্যদান করিয়া শিশুসন্তানকে পালন করিতে হয়, তাঁহার খাদ্য সবিশেষ পুষ্টিকর হওয়া উচিত; তাহা না হইলে মাতা ও শিশু উভয়েই শীঘ্র কৃশ, রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমাদিগের সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীরা ভোজন বিষয়ে এত অধিক লজ্জাশীলা এবং ভোজন-ব্যাপার এত গোপনে সম্পাদন করিয়া থাকেন যে গৃহস্বামিগণ এবিষয়ে প্রকাশ্য ভাবে অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিলে সুফল লাভ করিবার আশা করিতে পারেন না। অনেক সময়ে খাদ্য সামগ্রীর অপ্রচুরতা হেতু পুরুষদিগের অভাব মোচন হইয়া স্ত্রীলোক-দিগের জন্য বড় কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বাজার খরচের ভার স্ত্রীলোকদিগের হস্তে প্রায়ই ন্যস্ত থাকে; তাঁহারা নিজেদের প্রয়োজন ভুলিয়া যাইয়া কেবল বাটীর কর্ত্তৃপক্ষীয় লোক ও বালকবালিকাদিগের উপর দৃষ্টি রাখেন। মাছ, দুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য যদি আমরা হিসাব করিয়া যাহাতে পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির সঙ্কুলন হয়, এরূপ ব্যবস্থা করি, এবং যাহাতে নিরপেক্ষ-ভাবে সমস্ত সামগ্রী পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির জন্য যথাপরিমাণে দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে অপ্রকাশ্যভাবে প্রত্যহ

দৃষ্টি রাখি, তাহা হইলে আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীদিগের আহার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

দেশভেদে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের প্রভেদ হইয়া থাকে। শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীদিগকে সাধারণতঃ অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয় এবং বাহিরের প্রচণ্ড শীত হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের অধিক তাপের আবশ্যকতা হয়। এজন্য এই সকল স্থানে অধিক পরিমাণ মাংস ও তৈলজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংসের ব্যবহার যথোচিত পরিমাণে সংযত হওয়া উচিত; তাহা না হইলে অনেক সময়ে যকৃতের দুরারোগ্য পীড়া উপস্থিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ঋতুভেদে পৃথক্ পৃথক্ খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কি না, বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান এরূপ তত্ত্বের সূক্ষ্মভাবে মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করে নাই অথচ এরূপ ব্যবস্থা যে কেবল কল্পনা-প্রসূত, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অনেকানেক ব্যবস্থা অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতাপ্রসূত। অনেক স্থলে তাহাদের বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও ঐ

সকল বিধি ব্যবস্থা যে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। ঋতু-ভেদে আহারের প্রভেদ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য এস্থলে আয়ুর্ব্বেদের মত উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। স্বর্গীয় কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের "চরকসার" নামক গ্রন্থ হইতে এই মতগুলি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

চরকের মতে ঋতুর উপযোগী আহার বিহারাদি সম্পন্ন হইলে মনুষ্যের বর্ণের স্ফুরণ হয় এবং বল ও আয়ুব বৃদ্ধি সংসাধিত হয়। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শবৎ ও হেমন্ত এই ছয় ঋতুতে বৎসরটি বিভক্ত। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন সূর্য্য উত্তরায়ণ অবলম্বন করেন, তখন শরীরের রস শুষ্ক হয় এবং বলক্ষয় হইযা থাকে। পুনশ্চ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত কালে সূর্য্য যখন দক্ষিণায়ণ আশ্রয় করেন, তখন শরীরে রসের ও বলের আধিক্য হয়। চরকের মতে গ্রীষ্মকালের শেষে ও বর্ষাকালের প্রারম্ভে মনুষ্য হীনবল হয়, শরৎ ও বসন্তে মধ্যবল, এবং হেমন্তে ও শীতের প্রারম্ভে মানুষের বল সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

চরক বলেন, যিনি হেমন্তকালে প্রতিদিন ঘৃতদুগ্ধাদি

গব্যরস, গুড়, বসা, মজ্জা, তৈল ও নবান্ন আহার এবং উষ্ণজল পান করেন, তাঁহার আয়ুষ্কাল কখন হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।

শীতকালে জঠরাগ্নির উদ্দীপনা অধিক হয়, সুতরাং এ সময়ে আমাদিগের গুরুপাকদ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে পরিপাক করিবার ক্ষমতা জন্মে। শীতকালে অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার করিবার আবশ্যকতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং জলজন্তু (মৎস্য কচ্ছপাদি), আনূপ মাংস (বন্য মৃগ, বরাহ ইত্যাদি) প্রভৃতির ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া নানারোগের প্রাদুর্ভাব হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ অপেক্ষা শ্লেষ্মার প্রকোপ বিশেষ অনিষ্টকর মনে করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহারা বসন্তকালে গুরুপাক দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য এবং মিষ্টদ্রব্য বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সময়ে শরভ, শশক প্রভৃতি প্রাণীর মাংসভক্ষণ প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে স্বাদু, শীতল, তরল ও স্নেহময় দ্রব্যাদি ভক্ষণ করা উচিত। চরকের মতে শর্করামিশ্রিত ছাতু, জাঙ্গল পশু (মৃগ, শশক ইত্যাদি) ও পক্ষীর মাংস এবং

শালিতণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভোজন করিলে গ্রীষ্মে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য এই ঋতুতে একেবারে বর্জ্জন করিবে।

বর্ষাকালে দেহ ও অগ্নি (জঠরাগ্নি) উভয়েই দুর্ব্বল হয় এবং বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে অম্ল, লবণ ও স্নেহরসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। যিনি বর্ষাকালে অগ্নি সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুরাতন যব, তণ্ডুল, গোধুম ও জাঙ্গল মাংসের যুষ আহার করিবেন। এই ঋতুতে জল উত্তপ্ত করিয়া শীতল করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শরৎকালে শরীরে পিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এজন্য এই ঋতুতে পিত্তদমনকারী খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সময়ে মধুর, লঘু, শীতল ও তিক্ত খাদ্যদ্রব্য এবং পিত্তপ্রশমনকারী অন্নপানাদি ব্যবহার করা উচিত। এণ, শশক, তিত্তির প্রভৃতির মাংস, যব, গোধুম এবং শালিধান্যের ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঘৃত, তৈল, মৎস্য, আনূপ মাংস ও দধিভক্ষণ এই ঋতুতে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

আজকাল আমরা দধি সকল ঋতুতে সকল সময়েই ব্যবহার করিয়া থাকি। দধি একটী উৎকৃষ্ট অম্লরসবিশিষ্ট

সারবৎ খাদ্য। শর্করা ব্যতীত দুগ্ধের অপর সকল সারপদার্থ দধির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত মেচ্নিকফের মতে দধি ভক্ষণ করিলে, আমাদিগের অন্ত্রমধ্যস্থ অনিষ্টকারী রোগোৎপাদক বীজাণুসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং আমরা বহুদিন সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারি এবং অকালবার্দ্ধক্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদমতে দধি হিতকর খাদ্যসামগ্রী হইলেও সর্ব্বকালে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। চরক বলেন যে, রাত্রিকালে দধি ভোজন করিবে না এবং দধি উষ্ণ করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। শর্করাসংযুক্ত দধিভোজন পিত্ত সংক্ষুভিত হইতে দেয় না, পরন্তু আহার পরিপাক এবং তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ করে। মধুযুক্ত দধি সুমিষ্ট ও অল্প দোষবিশিষ্ট হয়। আমলকীর রস মিশাইয়া দধিভক্ষণ করিলে উহা ত্রিদোষ নাশ করে।

শরৎকালে দধিভোজন নিষেধ করা হইয়াছে। অপরিমিত দধিভোজনে দধির অম্লরস (Lactic acid) দেহমধ্যে অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া সর্দ্দি, কাশি, বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি সাধন করে।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা ঋতুভেদে বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা ব্যতীত ইহা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম তত্ত্বে

উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা তিথি-ভেদে খাদ্যবিশেষ নিষিদ্ধ (তৃতীয়াতে পটোল, ষষ্ঠীতে নিম, ত্রয়োদশীতে বেগুণ ইত্যাদি) বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহার যথার্থ মর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, এরূপ ব্যবস্থায় প্রত্যহ একরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিবার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জলবায়ু (Climate) এবং প্রাকৃতিক ও স্থানীয় অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকে; এ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

সকল বয়সেই অতিভোজন প্রভৃত অনিষ্টের কারণ। ইহা অধিকাংশ স্থলেই নানাবিধ রোগ ও অকালমৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে। এককালে অধিক আহার না করিয়া ৩।৪ বারে অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া ঘন ঘন আহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ ইহাতে পাকস্থলী যথোপযুক্ত বিশ্রাম করিবার অবসর পায় না। এককালে অধিক আহার করিলে পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত হয়, পাকস্থলী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং উহার পরিপাকশক্তি ক্ষীণ হয়। গুরুভোজনে শরীর জড়ভাবাপন্ন হয় এবং কোনরূপ

শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের কার্য্যে অপটু হইয়া পড়ে। কিছু হাতে রাখিয়া ভোজন করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য অর্থাৎ খাইয়া উঠিবার সময় যেন মনে হয় যে আরও কিছু খাওয়া যাইতে পারে। মিতাহার যে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের এক প্রধান উপায়, তাহার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। লুই কর্ণারো নামক এক ব্যক্তি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত আহার ও পান সম্বন্ধে অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, কিন্তু অধিক বয়সেও তিনি মিতাচার অবলম্বন করিয়া ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে জীবিত ছিলেন।

ভগবদ্গীতায় যুক্তাহার যোগীর লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রত্যহ এক সময়ে ভোজন করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল। দিবসে কতবার আহার করা উচিত, এ সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকলের পক্ষে খাটে না। দেশাচার, সাংসারিক অবস্থা, দৈনিক কার্য্য এবং অভ্যাস ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়। দিবসে দুইবার ভোজন সকল জাতিরই মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে অনেকেই কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন করিয়াই সম্পূর্ণ সুস্থদেহে থাকেন। এই বিষয়ে এই নিয়ম প্রতিপালন করা উচিত যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবারের খাদ্য সম্পূর্ণ পরিপাক না পায়, ততক্ষণ পুনরায় ভোজন করা উচিত নহে। আমরা যেরূপ খাদ্যসামগ্রী সচরাচর ভোজন করিয়া থাকি, তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হইতে অন্ততঃ ৪।৫ ঘণ্টা সময় লাগে। পরিপাক হইবার পর পাকস্থলীকে ২।১ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। কোন্ সময়ে আহার করা উচিত, ক্ষুধাই আমাদিগকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অনেক সময়ে আমরা লোভবশতঃ অথবা আত্মীয় স্বজনের উপরোধে অক্ষুধা বা ক্ষুধাতৃপ্তির উপর খাইয়া নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি।

দুগ্ধপায়ী শিশুগণকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ভোজন করাইবার এবং বালকদিগের ৪ ঘণ্টা অন্তর আহার করিবার প্রয়োজন হয়।

রাত্রিতে স্বল্পাহারই প্রশস্ত। নিদ্রাকালে পরিপাক-ক্রিয়া ধীরভাবে সম্পন্ন হয়, এজন্য রাত্রিকালে ভোজনের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া অবিধেয়। বালক ও যুবকদিগের পক্ষেও রাত্রিকালে স্বল্পাহার প্রশস্ত, কারণ

রাত্রিতে গুরু আহার করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত ও মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিবার সম্ভাবনা।

আহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মুখ ও হাত ধুইয়া ভোজন করা উচিত। আমরা কাঁটা চামচ ব্যবহার করি না, হাত দিয়াই খাই; সুতরাং ভোজনের পূর্ব্বে আমাদিগের হাত ধুইবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। নানা কারণে হাতে ময়লা লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা, ভাল করিয়া হাত ধুইলে বাহিরের ময়লা অন্নের সহিত উদরে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। বাটীতে ওলাউঠা প্রভৃতি কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে যাহাদিগকে এই রোগের সংস্রবে আসিতে হয়, তাহাদের ফেনাইল্ ও সাবান দিয়া রীতিমত হাত না ধুইয়া কোনও খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় স্পর্শ করা সমূহ বিপদের কারণ হইয়া থাকে। এই সকল ভয়ানক রোগের বীজ এইরূপ ছোঁয়ালেপার দ্বারাই খাদ্য ও পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে এবং তদ্দ্বারা সুস্থ ব্যক্তি ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হয়। যে বাটীতে ওলাওঠা রোগ দেখা যায়, তথায় শুশ্রূষাকারীদিগের অজ্ঞতা বা অসাবধানতাবশতঃ খাদ্য বা পানীয় এইরূপে দূষিত হইয়া পরিবারস্থ একাধিক লোকের মৃত্যুর কারণ

হইয়া থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এই বিষম বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারা যায়।

মুখের মধ্যে সর্ব্বদা নানারূপ বীজাণু (Bacteria) বিদ্যমান থাকে। ভাল করিয়া কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইয়া খাইলে এই বীজাণুগুলি খাদ্যের সহিত উদরস্থ হইতে পায় না। ভোজনের পূর্ব্বে "গণ্ডূষ" নামক যে প্রাচীন প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা যথারীতি আচরিত হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু শুদ্ধ জলে অঙ্গুলি নিমজ্জিত করিয়া মুখের ভিতর ছিটা দিলে প্রকৃত "গণ্ডূষ" করা হয় না। প্রকৃত "গণ্ডূষ" ভোজনের পূর্ব্বে উত্তমরূপে হাত ও মুখ ধুইযা ফেলিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া অনুমিত হয়।

যেস্থানে আহার করা যায়, তাহা অতি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। যে স্থানে অধিক আলোক ও বাতাস আছে এবং যেখানে কোনও দুর্গন্ধ আসিবার সম্ভাবনা নাই, সেই স্থানই ভোজনের পক্ষে প্রশস্ত। এইরূপ স্থানে ভোজন করিতে বসিলে শরীর ও মন উভয়ই স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল থাকে। শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ও মনের প্রফুল্লতা সুপরিপাকের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

বিশেষতঃ অন্নব্যঞ্জনাদিতে যদি কোনও ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পতিত হয়, তাহা হইলে যথোচিত আলোকের প্রভাবে তাহা বাছিয়া লওয়া সুসাধ্য হয়। অনেকে রান্নাঘরের মধ্যে ভাত খাইয়া থাকেন; ইহা স্বাস্থ্যকর প্রথা নহে। রান্নাঘর বড় গরম এবং উহা সর্ব্বদা ধূমপূর্ণ থাকে। সাধারণতঃ রান্নাঘরে বায়ু ও আলোকের অভাবও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। খাওয়া জিনিষটা একটা কাজসারা ব্যাপার বলিয়া মনে করা উচিত নহে, কারণ ইহার উপর আমাদিগের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে।

বেশ করিয়া "জলছড়া" দিয়া স্থান মুছিয়া ভোজনের পাত্র রাখিবার যে ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত। অধুনা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে অধিকাংশ রোগের বীজ ধূলিকণার (Dust) সহিত মিশ্রিত থাকে। বাতাসের সাহায্যে ধূলি উড়িয়া আমাদের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে পতিত হয় এবং তৎসাহায্যে ঐ সকল বীজ আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ উৎকট রোগ উৎপাদন করে। বাজারের খাবার যে বিশেষ অনিষ্টকর, তাহার কারণ যে শুদ্ধ ভেজাল দ্রব্যে ঐ সকল পদার্থ প্রস্তুত হয় বলিয়া, তাহা নহে।

খাবার জিনিস দোকানে যেরূপ ভাবে রক্ষিত হয়, তাহাতে নানাবিধ রোগের বীজমিশ্রিত পথের ধূলি উহার উপর অনবরত পতিত হয়; সুতরাং বিবিধ রোগ উৎপাদন করিবার শক্তি বাজারের খাবারেব মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে বিদ্যমান থাকে। এক্ষণে কলিকাতা নগরের দোকানে মিষ্টান্নাদি আচ্ছাদিত স্থানে রাখিবার নিয়ম হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সম্যকরূপে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায় না! "জলছড়া" দিয়া মুছিযা ভোজনের স্থান পরিষ্কার করিলে তথাকার ধূলি উড়িয়া অন্নব্যঞ্জনের সহিত মিশিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদিগের প্রবীণা গৃহিণীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক। পাতেব নীচে "জলছড়া' না দিলে তাঁহারা কখনই ভোজন পাত্র সেস্থানে রক্ষিত হইতে দেন না। কিন্তু আমাদিগের নবীনা গৃহিণীদিগের মধ্যে এই প্রথার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শুদ্ধ নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য নামমাত্র একটু জল ছিটাইয়া ভাতের থালা বসাইয়া দেওয়া হয়। আমি আশা করি যে প্রত্যেক গৃহিণী এই সুপ্রথার যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইয়া ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবেন।

তাড়াতাড়ি ভোজন করা মহা অনিষ্টমূলক। সুপরি-

পাকের জন্য খাদ্যদ্রব্য অতি সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি খাইলে যথোপযুক্ত চর্ব্বণের অভাবে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয না। খাদ্য যে কেবল চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইবার প্রয়োজন তাহা নহে, মুখের লালার সহিত উহার উত্তমরূপে মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। মুখের লালা একটি পাচক রস। আমরা ভাত, রুটী, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার ঘটিত (Starchy) খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকি; উহারা মুখের লালার সাহায্যে শর্করায পরিণত হইয়া পবিপাক প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের অধিকাংশ খাদ্যই শ্বেতসার ঘটিত। অতএব যাহাতে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের উপর মুখের লালার ক্রিয়া অধিকক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। তাড়াতাড়ি খাইলে ভক্ষ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইতে পায় না এবং যথা পরিমাণ লালার সহিত মিশ্রিত হইবার সময় না পাইয়া অধিকাংশ শ্বেতসার (Starch) শর্করায় পরিণত না হইয়া পরিপাকের উপযোগী হয় না। খাদ্যদ্রব্য একবার পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে লালার পাচকক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়, সুতরাং শ্বেতসার-ঘটিত খাদ্য যত অধিকক্ষণ মুখের মধ্যে রাখিতে পারা যায়, ততই পরিপাকের সুবিধা

হইয়া থাকে। তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে খাদ্য যে শুদ্ধ দুষ্পাচ্য হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে, খাদ্যের অধিকাংশ সারপদার্থ আমাদের দোষে এইরূপে অসার পদার্থরূপে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে ভোজন করা অজীর্ণ রোগের একটি মহৌষধ। ধীরে ভোজন করিলে আমরা যে অনেক রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি কেবল তাহাই নহে, খাদ্যের যে অংশ তাড়াতাড়ি খাইবার দোষে অসার পদার্থরূপে পবিত্যক্ত হয়, উক্ত অপব্যয়ও এই সুঅভ্যাস দ্বারা নিবারণ করিতে সমর্থ হই।

আহারের সময় বা অব্যবহিত পরে অধিক জল বা বরফজল অথবা বরফদ্বারা শীতল করা কোনও পানীয় বা মালাই বরফ (Ice-cream) গ্রহণ করা উচিত নহে। ইহা দ্বারা পাকাশয়স্থিত পাচকরস অধিকতর তরল এবং ভুক্তদ্রব্য শীতল হইয়া পরিপাক-কার্য্যের সবিশেষ ব্যাঘাত জন্মায়। আহারের সময় অল্পমাত্রায় জল পান করিয়া আহারের ২।১ ঘণ্টা পরে যথাপ্রয়োজন জলপান করিলে কোন ক্ষতি হয় না।

আর একটি কথা বলিয়া আহারের বিষয় শেষ করিব। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, তখন নিমন্ত্রণ-ভোজন একটা বড়ই আমোদের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজকাল

লোককে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করা একটা মহাদায় বলিয়া অনেক সময় মনে হয়। যাঁহারা নিমন্ত্রণ করেন তাঁহাদেরও বিপদ্, আবার যাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, তাঁহারাও শরীরের ভালমন্দ লইয়া একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহার প্রধান কারণ ভোজনের আড়ম্বরবাহুল্য। নিমন্ত্রণ একটি অবশ্য পালনীয় সামাজিক প্রথা। সৌহৃদ্য, আত্মীয়তা, সদাচার, সৌজন্য, আতিথেয়তা প্রভৃতি সামাজিক জীবনের সদ্‌গুণাবলী নিমন্ত্রণ-প্রথা দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে এত অধিক আড়ম্বর উপস্থিত হইয়াছে যে. ব্যয়বাহুল্য হেতু গৃহস্থ লোকে ২।১০ জন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকেও বৎসরে একবার নিমন্ত্রণ করিতে সাহসী হন না। আজকাল আমাদিগের ভোজে একপ্রস্থ খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আগে ভাতের যজ্ঞ হইলে ভাত, মাছ, তরকারী, দধি ও মিষ্টান্নে সমাপ্ত হইত। বড় লোকের বাটীতে ফলাহারের আয়োজনে লোকে লুচি ও তরকারী তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিত। আজকাল অধিকাংশ স্থলেই ভোজের এরূপ সরল ভাবের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশী, বিলাতী, ফরাসী, মোগলাই, চীনা, জাপানী প্রভৃতি পৃথিবীর সকল দেশের বিশেষ বিশেষ খাদ্য একদিনের ভোজের

জন্য আয়োজন করিতেই হইবে। সুতরাং যে খাইতে যায়, ভোজন তাহার পক্ষে সুখের না হইয়া নানা অসুখের কারণ হইয়া থাকে, এবং যে খাওয়ায়, খরচ ও আয়োজনের আড়ম্বরে তাহারও প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া উঠে। অথচ আমাদিগের অভিমান এতই প্রবল হইয়াছে যে আমরা এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত না করাইলে নিজের হীনত্ব অনুভব করিয়া থাকি। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার বাহিরে কোনও স্থানে আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম প্রত্যেক আসনের উপর এক একখানি সুন্দর ভাবে মুদ্রিত পুস্তক রহিয়াছে। ঐ পুস্তকে সে দিনকার খাদ্যদ্রব্যের একটী তালিকা (Menu) লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। খাদ্যসামগ্রীর সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিলাম সর্ব্বশুদ্ধ ১০২টী। খাদ্য দ্রব্য এত অধিক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে আসনে বসিয়া হাত বাড়াইয়া সকল জিনিষ পাইবার উপায় ছিল না। ঐ সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। আমার একটী বন্ধু আমার পার্শ্বে ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "একবার পাতের দিকে চাহিয়া দেখুন, আর সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত একমুষ্টি অন্নবিনা মৃতপ্রায় লোকদিগের কথা মনে করুন।" আমরা বাস্তবিক বৃথা অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া

থাকি? ইহা কি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে যে অত সামগ্রী একজনে কেন, দশজনে খাইয়া উঠিতে পারে কি না সন্দেহ। আমরা নিশ্চয় জানি যে অধিকাংশ দ্রব্যই পাতে পড়িয়া থাকিবে এবং পরদিন আবর্জ্জনার গাড়ী বোঝাই করিয়া বিদায় করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি আমাদের অভিমান এতই প্রবল যে বহুক্লেশোপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া এই বৃথা আড়ম্বর প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হই না! গৃহস্থ লোক যে এই ব্যয়বাহুল্যের জন্য নিমন্ত্রণরূপ সামাজিক প্রথা পালন করিতে সমর্থ হয় না, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। সামান্য ভোজের আয়োজনে যদি লোক সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে আত্মীয়তা রক্ষার এই উৎকৃষ্ট উপায় সমাজ হইতে লোপ প্রাপ্ত হয় না। এই বিষয়ে সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা "বড় মানুষ," তাঁহারা যদি নিমন্ত্রণে সামান্য ভোজের আয়োজন করেন, তাহা হইলে গৃহস্থ লোকেরা তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে সাহসী হইবে এবং সামাজিক জীবনের অঙ্গস্বরূপ নিমন্ত্রণ-প্রথা যথারীতি আচরিত হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিবে।

নিরামিষ ও আমিষ ভোজন।—আমিষ ও নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে একটা মতভেদ আবহমান কাল ব্যাপিয়া

প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। "খাদ্য" নামক পুস্তকে আমি এ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করি না। যাঁহারা বলেন যে মাংস ভোজন না করিলে স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য লাভ করা যায় না অথবা যাঁহারা বলেন যে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যলাভ নিরামিষ ভোজনের উপর নির্ভর করে, আমরা এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করি না। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ ও তাহাদের কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও আধ্যাত্মিকতা, আমিষ বা নিরামিষ ভোজী, কাহারও একচেটিয়া বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, সকল মনুষ্যের পক্ষে এক প্রকার আহার নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত নহে। অনেকের মাংসভোজন একেবারেই সহ্য হয় না; কেহ বা মাংস যত সহজে পরিপাক করিতে সমর্থ হয়, অন্য খাদ্য সেরূপ নহে। এরূপ দুই ব্যক্তির পক্ষে এক প্রকার আহারের ব্যবস্থা করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। মূল কথা এই যে আমিষ বা নিরামিষ ভোজন, কোনটীই অতিরিক্ত মাত্রায় হওয়া উচিত নহে। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা দেশ, কাল, পাত্র ও রুচি

অনুসারে, আমিষ ও নিরামিষ, সকল প্রকার খাদ্য হইতেই শরীর রক্ষার উপযোগী সমস্ত উপকরণ যথাপ্রয়োজন সংগ্রহ করিতে পারি। তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে, আমিষই হউক, আর নিরামিষই হউক, উহা প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। নিত্য নিয়মিত পরিমাণে মাংস ভোজন করিলে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইতে দেখা যায় না, তবে ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংসের ব্যবহার সবিশেষ সংযত হওয়া উচিত। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই আমিষ ও নিরামিষ দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভোজন করে ; এইরূপ "মিশ্রখাদ্য" (Mixed diet) অনেকেরই পক্ষে তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্য-কর হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেরই আয় যৎসামান্য, এজন্য মাংসভোজন এদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব। ছাগমাংস বা মেষমাংস সুলভ নহে এবং সহজে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। একসের মাংসের মধ্যে যে পরিমাণ মাংসজাতীয় উপাদান (Proteids) আছে, তিন পোয়া ডালের মধ্যে তাহা অবস্থিতি করে। একসের ছাগ বা মেষমাংসের দাম বার আনার কম নহে, তিন পোয়া ডালের দাম ১০।১২ পয়সার অধিক নহে। সুতরাং যে পরিবারে প্রত্যহ একসের মাংসের প্রয়োজন, তাহার বার

আনা খরচের পরিবর্ত্তে বার পয়সার ডাল কিনিলেই সমান ফল লাভ হইতে পারে। শ্রমজীবীদিগের তো কথাই নাই, গৃহস্থলোকের মধ্যে কয়জন প্রত্যহ যথাপ্রয়োজন মাংস ক্রয় করিবার খরচের সঙ্কুলন করিয়া উঠিতে পারেন? যাঁহারা বলেন যে মাংস সহজে পরিপাক হয়, ডাল বড় দুষ্পাচ্য, আমি তাঁহাদের কথা সাধারণ সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। খাদ্য পরিপাক হওয়া অনেক সময়ে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যাহাদের ডাল রুটী বা ডাল ভাত খাওয়া অভ্যাস, তাহারা যদি সুসিদ্ধ ডাল পরিমিত পরিমাণে খায়, তাহা হইলে উহা পরিপাক করা তাহাদের পক্ষে আয়াস-সাধ্য হয় না। ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ ডাল বড় দুষ্পাচ্য বলিয়া বিবেচনা করেন এবং এদেশীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে বিনা বিচারে এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। যাঁহারা মাংসভোজনে অভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে ডাল দুষ্পাচ্য হওয়া অসম্ভব নহে। তেমনই যাঁহারা বংশানুক্রমে যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া ডাল ভক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যহ মাংসভোজন করিতে দিলে তাঁহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত হইয়া তাঁহারা কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। বহুমূত্র-রোগাক্রান্ত এদেশীয় রোগী-দিগের জন্য মাংস-ভোজনের ব্যবস্থা করিবার সময় কিরূপ

অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা অভিজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রেই অবগত আছেন। অনেকে অনুমান করেন যে যাহারা পুরুষানুক্রমে ডাল খাইয়া আসিতেছে, অভ্যাসগুণে তাহাদের পরিপাক যন্ত্রাদি এরূপভাবে কার্য্য করে যে তাহারা সহজে উক্ত খাদ্য পরিপাক করিতে সমর্থ হয়। এই অনুমান একেবারে ভিত্তিশূন্য বলিয়া মনে হয় না। আর এক কথা এই, যে সামান্য ব্যয়ে ভারতবাসিগণ ডাল ভাত বা ডাল রুটী পেট পূরিয়া খাইতে পায়, কিন্তু তাহাদের জন্য মাংসের ব্যবস্থা করিতে হইলে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ "সুলভ মাংস" ব্যতীত অন্য মাংসের ব্যবহার তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ মাংস প্রচলনের চেষ্টা যে নিতান্ত হাস্যাস্পদ, অপ্রীতিকর ও অসঙ্গত, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। শুদ্ধ হিন্দু কেন, বহুকাল হিন্দুস্থানে বাস করিয়া এবং হিন্দু-সমাজের সংস্রবে থাকিয়া অনেক মুসলমানেরও হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংসের প্রতি বিরাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা প্রচার করেন যে এদেশে অবাধ. মাংসভোজন প্রচলিত না হইলে জাতিগত স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যের উন্নতি সাধিত হইবার উপায় নাই, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের ব্যবস্থা যদি লোকের ধর্ম্মগত বিশ্বাস, আচার, রুচি ও আর্থিক অবস্থার উপযোগী না হয়,

তাহা হইলে উহা কোন কালেই সাধারণের গ্রাহ্য ও কার্য্যকরী হইবে না। এরূপ বিফল চেষ্টায় সময় ও শক্তি অপব্যয় না করিয়া তাঁহারা যদি সংস্কারসম্মত সহজলভ্য যেসকল খাদ্য মাংসের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ, তাহাদিগের গুণাগুণ এবং কিরূপভাবে প্রস্তুত হইলে তাহারা মুখ-রোচক অথচ সহজে পরিপাচ্য হয়, তৎসম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

পানীয়।

জল।—শরীরধারণের জন্য যেমন খাদ্যের আবশ্যকতা হয়, সেইরূপ কিয়ৎপরিমাণ জলেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমাদের শরীরে গড়ে শতকরা ৭০ ভাগ জল আছে। রক্ত, রস প্রভৃতি শরীরস্থিত তরল পদার্থের মধ্যে জলের ভাগই অধিক। এতদ্ব্যতীত পেশী, চর্ম্ম, তন্তু, মেদ, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রাদির মধ্যে, এমন কি অত্যন্ত কঠিন অস্থিসমূহের মধ্যেও, অল্লাধিক পরিমাণে জল বিদ্যমান থাকে। এই জল আমাদের প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মলের সহিত শরীর হইতে অনবরত নির্গত হইয়া যাইতেছে। আমরা পিপাসা দ্বারা শরীর মধ্যে জলের অভাব অনুভব করিয়া থাকি এবং শীতল জল পান করিয়া অথবা দুগ্ধের ন্যায় তরল খাদ্য কিংবা চা, কফি, সোডা-ওয়াটার্, লেমনেড্ প্রভৃতি বিবিধ জলীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত অভাবের পূরণ করিয়া থাকি। মাছ, মাংস, রুটি, ভাত, ডাল প্রভৃতি যে সকল কঠিন খাদ্য আমরা ভক্ষণ করি, তাহাদের মধ্যেও অল্লাধিক পরিমাণে জল বিদ্যমান থাকে। এইরূপে নানা উপায়ে শরীর-রক্ষার জন্য আমরা প্রয়োজনমত জল সংগ্রহ করিয়া লই।

আমাদিগের রক্তকে যথোচিত তরল রাখিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। রক্ত গাঢ় হইলে উহা শিরার মধ্য দিয়া অবাধে সঞ্চালিত হইয়া পরিষ্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং অধিক পরিমাণ দূষিত রক্ত শরীর মধ্যে সঞ্চিত হইয়া বিষক্রিয়া প্রদর্শন করে ; এরূপ অবস্থায় শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। ওলাওঠা রোগে তরল মলের আকারে রক্ত হইতে অত্যধিক পরিমাণ জল নিঃসারিত হইয়া যায়, সুতরাং রক্ত গাঢ় হইয়া শ্বাসকষ্ট উৎপাদন করে। অনেক রোগী এই অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অধুনা রোগীর শিরার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ঈষদুষ্ণ লবণাক্ত জল যন্ত্র দ্বারা প্রবেশ করাইয়া রক্তকে স্বাভাবিক তরল অবস্থায় আনয়ন করা হয়। এতদ্দ্বারা রোগীর যন্ত্রণা নিবারিত হয় এবং অনেক রোগী এইরূপ চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।

খাদ্য-পরিপাক জন্য জলের প্রয়োজন হয়। খাদ্য কোমল না হইলে, উহার উপর বিভিন্ন পাচক রসের ক্রিয়া যথোচিতরূপে প্রকাশ পায় না, এবং জীর্ণ খাদ্য যথোচিত তরল না হইলে, উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরে সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া দেহ পোষণের সহায় হইতে পারে না। জল কঠিন খাদ্যকে কোমল ও তরল করিয়া,

পরিপাকের ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার উপযোগী করে।

ভুক্ত খাদ্যের যে অংশ জীর্ণ হয় না তাহাকে, এবং পরিশ্রমঘটিত ও শারীরিক বিবিধ স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন নানাবিধ দূষিত পদার্থকে মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের আকারে শরীর হইতে বহির্গত করিয়া দিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জলের আবশ্যকতা হয়। এই সকল দূষিত পদার্থ শরীরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিলে, নানাবিধ উৎকট রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত খাদ্য-পরিপাকের জন্য যে সকল পাচক রসের আবশ্যকতা হয়, তাহাদিগকেও প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কিয়ৎপরিমাণ জলের আবশ্যকতা হয়।

সকল প্রকার পানীয় দ্রব্যের মধ্যে জলই শ্রেষ্ঠ। দুগ্ধ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইলেও উহা খাদ্যশ্রেণীভুক্ত। দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ জল আছে। এজন্য দুগ্ধপায়ী শিশুগণকে পৃথগ্‌ভাবে জলপান করিয়া দেহ রক্ষার প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিতে হয় না। জলই একমাত্র স্বভাবজ পানীয়, আমরা উহা সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে অযাচিতভাবে পাইয়া থাকি। আর যে কোনপ্রকার পানীয় হউক না কেন, উহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণ জল মিশ্রিত থাকে বলিয়াই উহা পানীয়ের কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

আমরা যে জল পান করি, তাহা নির্ম্মল, স্বচ্ছ, গন্ধবর্ণ-বিহীন এবং সুস্বাদু হওয়া উচিত। কিন্তু জলের এই সকল গুণ থাকিলেই যে উহাকে নিরাপদে পান করা যাইতে পারে, তাহা নহে। কলেরা বা টাইফয়েড্ জ্বরের বীজাণু অতি সামান্য পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত থাকিলে, উহার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ বা স্বচ্ছতার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় না, কিন্তু এরূপ জল পান করিলে ঐ সকল সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত উদরাময়, রক্তাতিসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ অপরিষ্কৃত জল পান করিয়া উৎপন্ন হয়। এজন্য যে জল আমরা পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রকৃতি মধ্যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৃষ্টির জল সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হইলেও ভূতলে পতিত হইবার সময়ে বায়ু মধ্যে অবস্থিত কতিপয় পদার্থের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত হয় এবং ভূমিতে পতিত হইবার পর তৎসংলগ্ন নানাবিধ খনিজ, উদ্ভিজ্জ এবং জীবজ পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষভাবে মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই মলিন জলই নদী, কূপ ও পুষ্করিণীতে

আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ইহাই আমরা পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। বৃষ্টির জল অতিশয় সতর্কতার সহিত সংগৃহীত হইলে উহা পানের উপযোগী হইতে পারে।

প্রাকৃতিক জলের মধ্যে গভীর কূপ বা প্রস্রবণের জলই পানের পক্ষে প্রশস্ত। গভীর কূপের গাত্র পাকা ইটের গাঁথনির দ্বারা আবৃত এবং পাড় উঁচু হইলে উপরের জমি হইতে অথবা জমির মধ্যস্থিত ময়লা জল মাটী চোয়াইয়া, কূপের মধ্যে সঞ্চিত হইতে পায় না। মৃত্তিকার অতি গভীর স্থান হইতে জল উঠে বলিয়া এইরূপ কূপের জলের মধ্যে খনিজ পদার্থের অংশ কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ অধিক থাকিলেও রোগোৎপাদক বীজাণু উহার মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে যে পাত্র দ্বারা জল উত্তোলিত হয়, তাহা যদি মলিন থাকে অথবা কোনরূপে রোগোৎপাদক বীজাণু সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গভীর কূপের জলও উক্ত বীজাণু যোগে দূষিত হইবার সম্ভাবনা। অনেক স্থলে উত্তোলনকারী ব্যক্তির অপরিচ্ছন্নতার দোষেও কূপের জল দূষিত হইয়া সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের কারণ হইয়া থাকে।

কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি যে সকল জলাশয় হইতে আমরা পানীয় জল গ্রহণ করিয়া থাকি, আমাদের দেশের লোকেরা অজ্ঞতা নিবন্ধন উহাদিগের জল নানা প্রকারে দূষিত

করিয়া থাকে। জলাশয়ের সন্নিকটে মল-মূত্রত্যাগ, পুষ্করিণীর মধ্যে মনুষ্য ও গবাদি পশুদিগের স্নান, মলিন এবং সংক্রামক-রোগ-সংস্পৃষ্ট বস্ত্র ও শয্যাদি ধৌতকরণ, উচ্ছিষ্ট তৈজস সংস্কার প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য দ্বারা জলাশয়ের জল সর্ব্বদাই দূষিত হইয়া থাকে। গ্রামে কোন বাটীতে কলেরা রোগ দেখা দিলে, সেই বাটীর পরিজনেরা অজ্ঞতা নিবন্ধন রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি পুষ্করিণীর জলে পরিষ্কৃত করিয়া থাকে। পুনশ্চ সেই পুষ্করিণী হইতেই তাহারা এবং গ্রামের অপর সকলে পানের জন্য জল উত্তোলন করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে এইরূপে কলেরার বীজাণু-মিশ্রিত জল পান করিয়া গ্রামের গৃহে গৃহে মহামারী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই অজ্ঞতা ও অসাবধানতা হেতু প্রতি বৎসর আমাদের দেশে কত লোকের যে অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, তাহা সংখ্যা করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সংক্রামক রোগের শুশ্রূষা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের অভিজ্ঞতা এতই সংকীর্ণ যে তাহা চিন্তা করিলে মন ক্ষোভ ও নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। যাহাতে সাধারণের মধ্যে এই বিষয়ের জ্ঞান যথোচিত প্রসার লাভ করে, তদ্বিষয়ে এ দেশীয় চিকিৎসক মাত্রেরই যথোচিত চেষ্টা করা উচিত। সাধারণের মধ্যে সংক্রামক

রোগ নিবারণের মূল নিয়মগুলি যতদিন যথারীতি পালিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্লেগ্, যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি উৎকট সংক্রামক রোগের আধিপত্য এদেশ হইতে কিছুতেই কমিবে না।

স্বল্প-গভীর কূপ বা পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা নদীর জল অধিকতর বিশুদ্ধ ও পানোপযোগী। কিন্তু আমাদিগের দেশে এমন অনেক নদী আছে, যাহাতে মোটেই স্রোত নাই এবং যাহার মধ্যে তীরবর্ত্তীগ্রাম হইতে মলিন জল এবং নানাবিধ দূষিত পদার্থ সর্ব্বদা পতিত হয়। এই সকল নদীর জল সাধারণ পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা বিশুদ্ধ নহে, সুতরাং পানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। প্রচুর সলিল-বিশিষ্টা স্রোতস্বিনী নদীর জলই পানের পক্ষে প্রশস্ত। এইরূপ নদীর জল গতিশীল এবং সর্ব্বদা বায়ুতাড়িত ও রৌদ্র-সেবিত হয় বলিয়া উহার অধিকাংশ দূষিত পদার্থ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, এবং নদীর মধ্যে সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণ জল বহমান হয় বলিয়া দূষিত পদার্থ অধিক জলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় উহার অনিষ্টকারিণী শক্তির হ্রাস হয়। নদীর জল পান করিবার প্রধান আপত্তি এই যে উহা ঘোলা, বিশেষতঃ বর্ষাকালে উহা কর্দ্দমপূর্ণ হইয়া থাকে। নদীর জলকে রীতিমত ছাঁকিয়া লইলে

উহা স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত হইয়া পানের উপযুক্ত হইয়া থাকে।

যখন প্রকৃতির মধ্যে বিশুদ্ধ জল একেবারেই পাওয়া যায় না এবং অপরিষ্কৃত জল পান করিলে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তখন বিভিন্ন উপায়ে জলকে যথোচিত পরিষ্কৃত করিয়া পানের জন্য ব্যবহার করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে বাস করেন, সহরের মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহাদিগের জন্য বালি ও কাঁকরের মধ্য দিয়া নদীর জল সুন্দররূপে ছাঁকিয়া পানের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে হুগলী নদীর জলের মধ্যে যে সকল অনিষ্টকারী বীজাণু থাকে, পল্‌তায় (Pulta) জল ছাঁকা হইবার পর জলের মধ্যে তাহাদিগের সংখ্যা এত কমিয়া যায় যে কলিকাতায় আমরা যে কলের জল পান করিয়া থাকি, তাহা এক প্রকার নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। পল্লীগ্রামে বালি ও কয়লা দিয়া সচরাচর যে প্রণালীতে জল ছাঁকা হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ নিরাপদ্ নহে। এরূপ ছাঁকনির দ্বারা জলমধ্যস্থ সংক্রামক রোগের বীজাণু সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না, উহাদিগের কিয়দংশ ছাঁকনির মধ্য দিয়া ছাঁকা জলের

সহিত, নামিয়া আইসে। পাষ্টুর্ চেম্বার্ল্যাণ্ড্ (Pasteur Chamberland) অথবা বার্ক্ফেল্ড্ (Berkefeld) নামধেয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাঁকনি ব্যবহার করিলে এই দোষ একেবারে কাটিয়া যায়; কিন্তু সাধারণের পক্ষে এরূপ দামী ছাঁকনি ব্যবহার করা এক প্রকার অসম্ভব।

সাধারণের পক্ষে জলকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ (অর্থাৎ সংক্রামক ব্যাধির বীজশূন্য) করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—জলকে রীতিমত ফুটাইয়া লওয়া। জলের মধ্যে খনিজ পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলেও উহা বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে না। জলের মধ্যে সংক্রামক রোগের বীজ মিশ্রিত থাকিলেই উহা প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। জল উত্তমরূপে ফুটাইলে যদি উহার মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ থাকে, তবে তাহা একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জল যতই অপরিষ্কৃত হউক না কেন, ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইলে উহা নির্ভয়ে পান করা যাইতে পারে। ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের যখন প্রাদুর্ভাব হয়, তখন জল ও দুধ (গোয়ালারা অপরিষ্কৃত পুষ্করিণীর জল দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া অনেক সময়ে দুগ্ধকে নিতান্ত দূষিত করিয়া তোলে) রীতিমত ফুটাইয়া পান করিলে ঐ সকল রোগে

আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এত সহজ উপায় থাকিতেও আমরা আলস্যবশতঃ জল না ফুটাইয়া পান করি এবং তজ্জন্য কত বিপদ্ ভোগ করিয়া থাকি! আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দিন উনান জ্বলিতেছে, আমরা কত রকম আবশ্যক ও অনাবশ্যক আমিষ ও নিরামিষ ভোজ্য ও পেয় প্রস্তুত করিয়া অজীর্ণ রোগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছি, কিন্তু রোগ তাড়াইবার জন্য এক কলসী জল গরম করিতে আমাদিগের পরিজনবর্গ, পাচকপাচিকা অথবা দাসীদিগের মধ্যে কাহারও অবসর ঘটিয়া উঠে না। এইরূপ ঔদাসীন্যের ফল যে নিতান্ত বিষময় হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! কলেরা ও টাইফয়েড্ জ্বর যদি নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় পানীয় জল ও দুগ্ধ রীতিমত ফুটাইয়া পান করা উচিত।

এ সম্বন্ধে একটী সত্য ঘটনা বিবৃত করিতেছি। ২১ বৎসর পূর্ব্বে আমি "জল" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। ওলাউঠা-রোগ দূষিত জল পান করিয়া কিরূপে শীঘ্র পরিব্যাপ্তি লাভ করে, কতকগুলি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া সাধারণকে ঐ তথ্য বিশেষভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং ইহার নিবারণের জন্য পল্লীগ্রামবাসীদিগকে জল ফুটাইয়া পান

করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিয়াছিলাম। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরেই বসিরহাটের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামে ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। বসিরহাটের একজন উকিলবাবু ঘটনাক্রমে সেই সময়ে ঐ পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন এবং জল ফুটাইবার উপদেশটী সহজ ও উপকারী বিবেচনা করিয়া নিকটস্থ আটখানি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে স্বয়ং যাইয়া যাহাতে ঐ সময়ে সকলের বাড়ীতেই জল ফুটাইয়া পানের জন্য ব্যবহার করা হয়, তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত ঐ কয়খানি গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থই পানীয় জল ফুটাইয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই ঐ আটখানি গ্রাম হইতে কলেরা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য গ্রামের মধ্যে কলেরার প্রকোপ অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এইরূপ আশাতীত উপকার লাভ করিয়া ঐ উকিলবাবু স্বয়ং কলিকাতায় আগমন করিয়া আমার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন এবং এইরূপ সহজ উপদেশ হইতে সুফল লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ফুটান জল বিস্বাদ হয় বলিয়া অনেকে ফুটান জল খাইতে আপত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু একটী সামান্য উপায়ে এই

অসুবিধা দূর করিতে পারা যায়। যদি ফুটান জলকে কয়েকবার এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা যায়, তাহা হইলে উহা বায়ুমিশ্রিত হইয়া পুনরায় সুস্বাদু হয়। এই জলে অল্প পরিমাণে কর্পূর যোগ করিলে, উহার স্বাদ সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি থাকে না।

সমস্ত দিনে আমাদিগের প্রায় দেড় সের জল পান করিবার আবশ্যকতা হয়। ইহার মধ্যে কিয়দংশ আমরা খাদ্যসামগ্রী হইতে প্রাপ্ত হই; অবশিষ্টাংশ, জল ও অন্যান্য পানীয় গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকি। আহারের অব্যবহিত পরেই অধিক জল পান করা উচিত নহে, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতি প্রত্যূষে এবং রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে জল পান করা প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মধ্যে প্রাতরাশের ২।৩ ঘণ্টা পরে আর একবার যথাপ্রয়োজন জল পান করিলে, উপকার ভিন্ন অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ ঘন ঘন জল পান করিয়া থাকেন; ইহা একটী কদভ্যাস। ইহাতে খাদ্য পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মিয়া অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয় এবং অনেক স্থলে দেহও স্থূল হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যদি কোন স্থানে পরিষ্কৃত পানীয় জল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই কদভ্যাসবশতঃ ঐ

ব্যক্তি পিপাসায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। আহারের ন্যায় পানীয় সম্বন্ধেও আমাদিগের সংযম অভ্যাস করা উচিত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পানের পক্ষে শীতল জলই প্রশস্ত, কিন্তু অবস্থা বিশেষে উষ্ণ জল পান করিলে সবিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি কতিপয় রোগে উষ্ণ জল অল্পে অল্পে পান করিলে অনেক স্থলে রোগের উপশম হইতে দেখা যায়। রাত্রিকালে নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে, শয়নের পূর্ব্বে এক গেলাস উষ্ণ জল পান করিয়া শয়ন করিলে, অনেক সময়ে সুনিদ্রা লাভ হয়। কিন্তু আজকাল দধি ভোজনের ন্যায় উষ্ণ জল পান করা একরূপ সখের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রয়োজন হউক আর না হউক, ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, অনেকে গরম জল পান করিয়া 'ফ্যাসান্' বজায় রাখিয়া থাকেন। উষ্ণ জ পান করা শরীরের সকল অবস্থাতেই যে নিরাপদ, তাহা মনে হয় না। অনেক বিজ্ঞ কবিরাজ উষ্ণ জল পানের 'সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহাদের মতে ইহাদ্বারা বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং যাঁহাদের বায়ু প্রবল, উষ্ণ জল পান তাঁহাদের পক্ষে অনিষ্টজনক। অবশ্য পল্লীগ্রামে জল ফুটাইয়া পান করিলে অপরিস্কৃত জলপানজনিত বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া

যায় বটে, কিন্তু এরূপ স্থলে উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিলেই সমান ফল লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে বক্তব্য এই যে অকারণ উষ্ণ জল পান করিয়া কষ্টভোগ করিবার প্রয়োজন নাই ; শরীর অসুস্থ হইলে চিকিৎসকের মত লইয়া উষ্ণ জল ব্যবহার করাই সঙ্গত।

ঘোল।—ঘোল একটি উৎকৃষ্ট পানীয়। ইহাতে দুগ্ধের সারাংশ কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহা দ্বারা খাদ্যেরও কার্য্য হইয়া থাকে। ঘোল ব্যবহার করিলে অন্ত্রস্থিত অনিষ্টকারক বীজাণুদিগের সংখ্যা কমিয়া যায়, সুতরাং অন্ত্রস্থ ভুক্তাবশিষ্ট পদার্থের পচন ক্রিয়ার হ্রাস হইয়া পেট গরম, উদরাময় রোগ ও মলের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। আমি একস্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে একটী সংস্কৃত বচন অনুসারে প্রত্যূষে শীতল জল, অপরাহ্নে দুগ্ধ ও ভোজনান্তে ঘোল পান করিলে বৈদ্যের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন হয় না।

ডাব।—ঘোলের ন্যায় ডাবের জলও উপাদেয় পানীয়। ইহার মধ্যে খাদ্যের গুণও কতক পরিমাণে আছে। আহারের পর ডাবের জল পান করিয়া অনেকের অজীর্ণ রোগ সারিয়া গিয়াছে। অনেক সময়ে কচি ডাবের জলে হিক্কা ও বমি নিবারিত হইয়া যায়। সমুদ্র যাত্রা করিলে

অনেকের বিষম বমি (Sea sickness) হইয়া থাকে; ডাবের জল ব্যবহার করিয়া এই বমি একেবারে স্থগিত হইতে দেখা গিয়াছে।

সরবৎ।—গ্রীষ্মকালে এদেশে বেল, তরমুজ, আনারস, ফল্সা, লেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফলের এবং তেঁতুল, মিছরি ও চিনির সরবৎ অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিয়মিত পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে, এই সকল সরবৎ পানীয় ও খাদ্য উভয়েরই কার্য্য করিয়া থাকে। অধিক সরবৎ পান করিলে ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

সোডাওয়াটার্ ইত্যাদি।—সোডাওয়াটার্, লেমনেড্ প্রভৃতি কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ মিশ্রিত পানীয় (Aerated waters) যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শরীর মধ্যে বিষের কার্য্য করে কিন্তু কোন পানীয়ের সহিত উদরস্থ হইলে কোন অনিষ্ট উৎপাদন করে না। নিয়মিত পরিমাণে এই সকল পানীয় গ্রহণ করিলে কোন দোষ ঘটিতে দেখা যায় না, তবে ভোজনের অব্যবহিত পরেই অনেকে অধিক সোডাওয়াটার্ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে পরিপাকের সুবিধা না হইয়া ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে

অপরিষ্কৃত জলে এই সকল পানীয় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদির অপরিচ্ছন্নতা হেতু ধাতুবিশেষ দ্বারা ইহারা দূষিত হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে পরীক্ষা দ্বারা সোডাওয়াটারের মধ্যে টাইফয়েড্ জ্বরের বীজাণু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এইরূপ সোডাওয়াটারের ব্যবহার দ্বারা টাইফয়েড্ জ্বর বিস্তার লাভ করিয়াছে, এরূপ ঘটনাও নিতান্ত বিরল নহে। মফঃস্বলে এই সকল পানীয় যে জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা প্রায়ই দূষিত। কলিকাতা সহরেও সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এই সকল পানীয় সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

চা, কফি ও কোকো।—চা, কফি ও কোকো আজকাল শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এস্থলে বলা উচিত যে সহজ শরীরে স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য ইহাদিগের একটীরও প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ চা কিছুদিন ব্যবহার করিলে এমনই অভ্যাস হইয়া যায় যে সহজে ইহাকে আর পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। তবে নিয়মিত পরিমাণে পান করিলে ইহাদিগের মধ্যে কোনটীই অনিষ্ট উৎপাদন করে না, বরঞ্চ পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিয়া স্ফূর্ত্তি ও আরামদায়ক হইয়া থাকে। অল্পবয়স্ক বালক

বালিকাদিগের পক্ষে চা বা কফি কোনটীই ভাল নহে—তাহাদিগকে কোকো খাইতে দিলে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। চা অপেক্ষা কফির উত্তেজনাশক্তি অধিক ; কোকোর উত্তেজনা-শক্তি চা ও কফি অপেক্ষা অনেক কম। চা ও কফির মধ্যে খাদ্যের গুণ কিছু মাত্র নাই ; কোকোর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ মাখন জাতীয় এবং ১৫ ভাগ ছানা জাতীয় খাদ্য অবস্থিতি করে, সুতরাং ইহা কতক পরিমাণে খাদ্যেরও কার্য্য করিয়া থাকে। চকোলেট্ নামক পদার্থ কোকো হইতে প্রস্তুত হয়। মিষ্টতাহেতু ছোট ছোট ছেলেরা চকোলেট্ খাইতে বড় ভালবাসে এবং ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

অধিক চা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়। চায়ের মধ্যে ট্যানিন্ (Tannin) নামক একটী কষায় পদার্থ আছে, ইহাই কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ উৎপাদন করে। চা যত "কড়া" হয়, ততই ট্যানিন্ অধিক পরিমাণে উহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এজন্য "কড়া" চা পান করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাঁহাদেরকোনরূপ হৃদ্‌রোগ আছে, যাঁহারা হৃৎস্পন্দনে কষ্ট পান অথবা যাঁহারা হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বায়ুরোগে আক্রান্ত, তাঁহাদের চা বা কফি সেবন করা উচিত নহে।

পাতলা চা পান করাই সঙ্গত। ফুটন্ত জল চায়ের পাতার উপর ঢালিয়া ৩।৪ মিনিট রাখিলে যে অল্প লাল রঙের কাথ প্রস্তুত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ ছাঁকিয়া পান করিলে কোন দোষ হয় না। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি ছানা জাতীয় খাদ্যসামগ্রীর সহিত চা পান করা সঙ্গত নহে—ইহাতে ঐ সকল পদার্থের পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে।

চা এবং কফির অহিফেন ও সুরার মাদকতা নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে, এইজন্য ঐ সকল মাদক দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে চা ও কফির ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। চা ব্যবহার করিয়া অনেকে সুরাপান অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে; ইহা চায়ের পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। পল্লীগ্রামের অপরিষ্কৃত জল অল্প পরিমাণ চায়ের পাতার সহিত ফুটাইয়া লইলে জল হইতে কতকগুলি দূষিত পদার্থ দূরীভূত হয়।

সুরা।—সুস্থ শরীরে সুরা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। সহজ শরীরে সুস্থ অবস্থায় সুরার একেবারেই কোন আবশ্যকতা নাই। ইয়ুরোপীয় সমাজে সুরাপান অতি বিস্তৃতভাবে প্রচলিত দেখিয়া বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জন্মদাতা ডাক্তার পার্কস্ (Parkes) বলিয়াছেন যে পূর্ণ স্বাস্থ্য, সামর্থ্য

এবং মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবার জন্য সুরাপানের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। তিনি আরো বলেন যে, যাহারা মোটেই সুরা স্পর্শ করে না, তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ ব্যক্তির সংখ্যা অল্প নহে।

পূর্ব্বে অবস্থাবিশেষে সুরাপানের উপকারিতা সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যেও যে সকল ভ্রান্ত ধারণা ছিল, এক্ষণে বিবিধ পরীক্ষার সাহায্যে সেই সকল ভ্রান্ত সংস্কার ক্রমে দূরীভূত হইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে, সুরা শরীরকে গরম রাখিয়া শীত নিবারণ করিতে সমর্থ, এজন্য ইহা শীতপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। এক্ষণে অভ্রান্ত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে শীত নিবারণ করা দূরে থাকুক, সুরামাত্রেই শীত নিবারণ না করিয়া শীতাধিক্য উৎপাদন করে। বরফাবৃত মেরু প্রদেশের আবিষ্কারকগণ এবং আল্পস্ পর্ব্বতের আরোহি-গণ ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঐ সকল হিমপ্রধান স্থানে সুরা ব্যবহার করিলে বিষম অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। উহা দ্বারা শীত নিবারিত না হইয়া দেহের উত্তাপ কমিয়া যায়, এজন্য শীতের

প্রকোপ অধিক হইয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। মেরুপ্রদেশ আবিস্কার করিবার জন্য যে সকল লোক তথায় গিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গীদিগকে কথনই সুরাপান করিতে দেন নাই। এরূপ দেখা গিয়াছে যে তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গোপনে সুরাপান করিয়াছে, সে শীতে জমিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। ভারত-বর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুরা ব্যবহার করিলে বিষম অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহাতে গ্রীষ্মের কষ্ট ত মোটেই নিবারিত হয় না, পরন্তু ইহার অনিয়মিত সেবনে শর্দ্দি-গর্ম্মি, যকৃতের প্রদাহ প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগের আবির্ভাব হয়।

সুরাপান অপেক্ষা সুরাপান না করিয়া অধিক পরি-শ্রমের কার্য্য করিতে পারা যায়। সুরা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলেও অধিক পরিশ্রম করিবার বিশেষ কোন সুবিধা হয় না; কিছু অধিক মাত্রায় পান করিলে পেশী সমূহের অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, সুতরাং পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। আরও অধিক পান করিলে মানুষ একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বিখ্যাত ডাক্তার পার্ক্‌স্‌ এ বিষয়ের যথারীতি পরীক্ষা করিয়া উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অল্প মাত্রায় সুরা ব্যবহার করিলে ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয় বটে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ইহার বিপরীত ক্রিয়া (Reaction) উপস্থিত হইয়া শরীরকে অবসন্ন করিয়া ফেলে।

মানসিক পরিশ্রমের জন্য সুরার মোটেই আবশ্যকতা হয় না। অল্প মাত্রায় সুরা পান করিলে কিছুক্ষণের জন্য ভাবিবার ও ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই অবসাদ উপস্থিত হইয়া মস্তিস্ক নিস্তেজ হইয়া পড়ে। একটু বেশী মাত্রায় সুরাপান করিলে কল্পনা-শক্তি, চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তি কিরূপ জড়ভাবাপন্ন হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে বারংবার পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সুরাব্যতিরেকে সৈন্যেরা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে এবং কষ্ট সহ্য করিতে পারে। সুরাপান করিলে শীতোষ্ণতা রাত্রি-জাগরণ, অধিক দূর পদব্রজে গমন, অনাহার প্রভৃতি সৈনিক জীবনের অপরিহার্য্য কষ্টগুলি সহ্য করিবার ক্ষমতা বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়।

সুরা প্রকৃত খাদ্যের স্থান অধিকার করিতে পারে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সুরা সামান্যভাবে

খাদ্যের কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও উহা যে একটী বিষাক্ত পদার্থ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং সুরা অপেক্ষা সুলভ রসনাতৃপ্তিকর অসংখ্য খাদ্যসামগ্রী থাকিতে এরূপ মাদকতাগুণ-সম্পন্ন পদার্থ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। একজন ইংরাজ চিকিৎসক হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, আট বোতল বীয়ার্ (Beer) নামক মদের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী থাকে, তাহা এক টুক্‌রা মিছরির সহিত সমান। অতএব খাদ্য হিসাবে ৩৲ টাকার বীয়ার্ এক পয়সার মিছরির অপেক্ষা অধিক পুষ্টি-কর নহে।

অনেকে বলেন যে সুরা খাদ্য না হইলেও উহা খাদ্যের পরিপাকের সহায়তা করে। সুরা পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে প্রথমতঃ উহার উত্তেজনা হয়, এজন্য পাচকরস (Gastric juice) কিঞ্চিদধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহাতেই অনেকে মনে করেন যে সুরা, মাংস প্রভৃতি খাদ্যের পরিপাকের সহায়তা করে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধগম্য হইবে যে এই ধারণা ভ্রমশূন্য নহে। পাচকরস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলেই উহা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অধিকতর তরল

হইবে অর্থাৎ হার মধ্যে জলের অংশ অধিক এবং পাচক দ্রব্যাদির ভাগ কম থাকিবে। সুতরাং তরলত্বহেতু উহার পরিপাক করিবার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়। অধিক মাত্রায় সুরাপান করিলে পাকস্থলীর যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা চিকিৎসকমাত্রেই অবগত আছেন। ইহা দ্বারা পাকস্থলীর দুরারোগ্য প্রদাহ উপস্থিত হয়, মদ্যপায়ীকে সর্ব্বদা যে যে বমন করিতে দেখা যায়, পাকস্থলীর প্রদাহই তাহার প্রধান কারণ।

ইয়ূরোপীয় সমাজে বালকবালিকাদিগের বীয়ার্ পান করিবার প্রথা অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। অল্প বয়সে সুরার ব্যবহার প্রভূত অনিষ্টের কারণ। ইহা শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পক্ষে বিঘ্ন সাধন করে। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে যে কোন আকারে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলে ঐ কদভ্যাস সারাজীবনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায় যে কোন কালে উহাকে সহজে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই কদভ্যাসের ফলস্বরূপ ইয়ুরোপীয় সমাজে সুরাপানের যেরূপ প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও তাহা দৃষ্ট হয় না। ইয়ূরোপে যত দুঃখ কষ্ট, তাহার অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষের এই অবারিত সুরাপান হইতে উৎপন্ন। সুরাপান দ্বারা নিজের, পরিবারের, সমাজের

এবং দেশের কি ভয়ানক অনর্থ সাধিত হইতেছে, সুরাপান আরম্ভ করিবার সময় মদ্যপায়ীর যে তাহা জানা থাকে না, তাহা নহে। কিন্তু যখন তাহার মনে হয় যে অল্প-মাত্রায় সুরাপান করিয়া যদি স্ফূর্ত্তি ও আমোদ উপভোগ করিতে পারা যায়, তবে এরূপ নির্দ্দোষ আমোদ ভোগ করিবার আপত্তি কি ? সে তখন বুঝে না যে সুরার মাত্রা নিয়মিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা এক প্রকার অসম্ভব-কার্য্য। অনেকেই খাদ্যপরিপাকের সুবিধা হইবে এই ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ হয়ত চিকিৎসকের মত লইয়া অল্পমাত্রায় সুরাপান করিতে আরম্ভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই প্রকৃত মাতাল হইয়া পড়ে। ইয়ুরোপে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে বিষম দারিদ্র্য ও নৈতিক অবনতি লক্ষিত হয়, সুরাই তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

প্রত্যহ অধিক পরিমাণে সুরা পান করিলে শরীরের সমস্ত যন্ত্রই শীঘ্র হীনবল হইয়া পড়ে। হৃদ্‌পিণ্ডের উত্তেজনা হেতু রক্তবাহিকা শিরাসমূহ অধিকতর স্ফীত হয় এবং সময়ে সময়ে বিদীর্ণ হইয়া পক্ষাঘাত প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ উৎপাদন করে। পাকাশয়ের দুরবস্থার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বমনেচ্ছা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ মাতালের সঙ্গের সাথী। ক্রমাগত উত্তেজনা হেতু প্রথমতঃ যকৃতের

প্রদাহ উপস্থিত হয়; পরে উহা সঙ্কুচিত হইয়া (Cirrhosis of the liver) সাংঘাতিক উদরী রোগ উৎপাদন করে অথবা যকৃতের স্ফোটক (Liver abscess) উৎপাদন করিয়া অকাল মৃত্যু সাধন করে। সুরা স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অতি ভীষণভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করে। একটু বেশী মদ্য খাইলেই কথা অস্পষ্ট হয় এবং হাত পায়ের ঠিক থাকে না, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে এই সকল কার্য্য যে সকল পেশীর ক্রিয়াসাপেক্ষ, মস্তিষ্কের আজ্ঞায় সেই সকল পেশী সর্ব্বদা কার্য্য করিয়া থাকে। সুরাপান করিলে মস্তিষ্ক এরূপ জড়ভাবাপন্ন হয় যে পেশীর কার্য্যের উপর উহার প্রভাব বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত মস্তিষ্কের কল্পনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি যে সকল ঈশ্বরদত্ত উচ্চতর ক্ষমতা আছে, তাহারাও ক্রমে হীনবল হইয়া অবশেষে একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয়। তখন মানুষ যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবন বহন করিতে হয়। নরহত্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি যে সকল গুরুতর পাপে সমাজ সর্ব্বদা কলঙ্কিত হয়, অনেক সময়ে অতিরিক্ত সুরাপানই ঐ সকল পাপকার্য্যের মূলে অবস্থান করে। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এবং বহুক্লেশোপার্জ্জিত

অর্থ ব্যয় করিয়া যাঁহারা ঐরূপ পশুত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহারা যথার্থই দয়ার পাত্র! এই অপব্যয়ের অর্থে কত দরিদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন, কত শিক্ষার্থীর শিক্ষা, কত রোগার্ত্তের রোগ-মুক্তির ব্যবস্থা হইতে পারে এবং সাধারণ মানুষের সুখ-সচ্ছন্দতা যে কত পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সুরার ব্যবহার কিছু প্রবলভাবে প্রচলিত দেখা যাইতেছে। আবার বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে বরণীয়া ভারতরমণীদিগের মধ্যেও কোথাও কোথাও এই কদভ্যাস ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই গৌরবমণ্ডিত প্রাচীন জাতির অধঃপতন যে পূর্ণভাবে সংঘটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যদি এ বিষয়ের আলোচনা একটু বিস্তৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন।

এস্থলে বলা উচিত যে, সুরা একটী মহোপকারী ঔষধ। সুতরাং যেমন সকল ঔষধই চিকিৎসকের মত লইয়া ব্যবহার করিতে হয়, ইহার সম্বন্ধেও সেই নিয়ম

সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। চিকিৎসকদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সামান্য মাত্রাতেও সুরা-ব্যবহারের ব্যবস্থা না করেন। অনেক সময়ে চিকিৎসকের লঘুচিত্ততা হেতু অনেক পরিবারের সুখ, সম্পদ্ ও প্রতিপত্তি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে।

মুখশুদ্ধি ও ধূমপান।

আহারের পর মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু, বৈরাগী প্রভৃতি যাঁহারা সাংসারিক ভোগসুখের প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন, তাঁহারা মুখশুদ্ধির জন্য হরীতকী ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং অশৌচাবস্থায় যখন আমরা বিলাসিতার দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিয়া থাকি, তখনও আমারা আহারের পর হরীতকী ব্যবহার করি। অপর সময়ে আমরা পান অথবা সুপারি, লবঙ্গ, এলাইচ প্রভৃতি মসলা আহারের পর নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি।

আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতৃগণ হরীতকীর গুণের এতই পক্ষপাতী ছিলেন যে তাঁহারা এই ফলকে "প্রাণদা," "সুধা," "ভিষক্-প্রিয়া" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটী সাধারণ বচন প্রচলিত আছে যে বরঞ্চ মাতাকেও কখন কুপিতা হইতে দেখা যায়, কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কখনই উগ্রস্বভাব ধারণ করে না অর্থাৎ হরীতকীর ব্যবহারে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না।

বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে আহারের পর মুখের মধ্যে ভুক্তদ্রব্যের একটা আস্বাদ ও গন্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অনেক সময়ে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিলেও এই গন্ধ একেবারে দূরীভূত হয় না। স্বয়ং উহা অনুভব করিতে না পারিলেও কাহারও সহিত কথা কহিলে ঐ ব্যক্তি উক্ত গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে। যে কোন প্রকার মুখশুদ্ধির ব্যবহারে ঐ গন্ধ ও স্বাদ একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়।

অনেকের মুখে স্বভাবতঃই একটা দুর্গন্ধ বিদ্যমান থাকে। অনেক সময়ে খাদ্যের সুপরিপাক না হইলে অথবা যকৃতের ক্রিয়া সুচারু-রূপে সম্পন্ন না হইলে, মুখে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়; ইংরাজীতে ইহাকে foul breath কহে। যাহার মুখে দুর্গন্ধ, অনেক সময়ে সে স্বয়ং তাহা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি উহার নিকটে থাকে অথবা উহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে, তাহাকে কিরূপ একটা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। যাহাদিগের মুখে দুর্গন্ধ, তাহাদের সহবাস লোকে সাধ্যমত পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। পান বা হরীতকী নিয়মিতভাবে মুখশুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হইলে এই নিন্দনীয় রোগের সবিশেষ উপশম হইয়া থাকে।

পান বা সুগন্ধি মসলা মুখের ভিতর রাখিলে ঈষৎ উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া অধিক পরিমাণে লালা (Saliva) নিঃসারিত হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের অধিকাংশ খাদ্যই শ্বেত-সার-ঘটিত। লালার সাহায্যে খাদ্যের শ্বেতসারাংশ শর্করায় পরিণত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মুখশুদ্ধি করিবার পদার্থ দ্বারা গৌণভাবে খাদ্য-পরিপাকের সহায়তা হইয়া থাকে।

আহারের অব্যবহিত পরে যাহাদের অম্লোদ্গার নির্গত হয়, পান খাইলে তন্মধ্যস্থিত চূণের দ্বারা উহা নিবারিত হয়। অম্লাধিক্যযুক্ত অজীর্ণ রোগে পানের নিয়মিত ব্যবহারে উপকার সাধিত হইতে দেখা যায়।

আমরা পানের সহিত লবঙ্গ, এলাইচ, মৌরি, যমানী, রাঁধুনি, কাবাবচিনি, দারুচিনি, জৈত্রী, কর্পূর প্রভৃতি যে সকল সুগন্ধি মসলা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদিগের সকলগুলিরই কিয়ৎ পরিমাণ বায়ুনিঃসারক ও পচননিবারক গুণ আছে। ইহাদিগের ব্যবহারে ভুক্তদ্রব্যের অসাময়িক বিকার (Fermentation) নিবারিত হইয়া পেট ফাঁপা, পেটের মধ্যে দুর্গন্ধময় বাষ্পের সঞ্চার, উদরাময় প্রভৃতি অজীর্ণঘটিত নানাবিধ উপদ্রব হইতে কিয়ৎপরিমাণে শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। তবে পানের সহিত অধিক

পরিমাণে সুপারি ব্যবহার করিলে ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয় এবং সুপারির দোষ থাকিলে, মাথা ঘোরা, বমি প্রভৃতি হইয়া শরীর অসুস্থ হয়।

এ দেশে কতদিন পানের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সুশ্রুত প্রভৃতি অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে পানের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতের মতে পান সুগন্ধি, ঈষৎ উত্তেজক, বায়ুনিঃসারক ও ধারক; ইহার ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং কণ্ঠস্বর পরিষ্কৃত হয়। যাঁহাদের পান ব্যবহার করা অভ্যাস, অধিকক্ষণ পান না খাইলে, তাঁহারা একটু অবসন্নতা বোধ করেন, পান খাইলেই ঐ অবসাদ অন্তর্হিত হয়। বৈদ্য-চিকিৎসায় বিবিধ রোগে পানের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন পানে "পোকা" হইয়াছে বলিয়া একটা মিথ্যা জনরব উঠিয়াছিল, তখন কয়েক দিন পান ছাড়িতে হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ক্লেশের পরিসীমা ছিল না।

কিন্তু পান এরূপ উপকারী পদার্থ হইলেও ইহার অপরিমিত ব্যবহারে নানারূপ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে দেখা যায়। মুখের ভিতর সর্ব্বদা পান থাকিলে শব্দ স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না, সুতরাং কথাবার্ত্তা কহিবার অথবা পাঠ

আবৃত্তি করিবার বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে বেশী পান খাইলে জিভ্ মোটা হইয়া উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়, এইজন্য অল্প-বয়স্ক বালকদিগকে পান খাইতে নিষেধ করা হয়। পান মুখে করিয়া কথা কহিতে গেলে অনেক সময়ে চর্ব্বিত-পান-মিশ্রিত মুখামৃত নিজের ও নিকটস্থ ব্যক্তির শরীর ও বস্ত্রাদির উপর পতিত হয়; ইহাতে লোকে যে কিরূপ বিরক্ত হয়, তাহা সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বেশী পান খাইলে সর্ব্বদা 'ছেপ' গিলিবার বা ফেলিবার প্রয়োজন হয়; এই উভয় ক্রিয়ার কোনটীই স্বাস্থ্যসম্মত নহে। অনেক লোকের যেখানে সেখানে পানের 'ছেপ্' ফেলিবার কদভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতে ঘর দরজা, দেওয়াল, মেঝে, উঠান প্রভৃতি সকল স্থানই অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পাঁচজনের মধ্যে বসিয়া যাঁহারা পিক্দানির মধ্যেও 'ছেপ্' ফেলিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ হয় বুঝিতে পারেন না যে এই কদভ্যাস সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের কিরূপ বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। পানের "পিকে" রঞ্জিত জামা চাদর বড়ই অপ্রীতিকর দৃশ্য নয়নপথে উপস্থিত করে।

অধিক পান খাইলে ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয় এবং পরিপাক-শক্তি ক্ষীণ হয়। এরূপ দেখা গিয়াছে যে যাহাদের

পান খাওয়া অভ্যাস, দীর্ঘ উপবাসের সময় পান খাইতে পাইলে তাহারা ক্ষুধার তীব্রতা অনুভব করে না, কিন্তু পান না পাইলে, শীঘ্র তাহাদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। অধিক পান খাইলে চূণ লাগিয়া মাড়ী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দাঁত আল্‌গা হইয়া অকালে স্খলিত হয়। চর্ব্বিত পানের অংশ অধিকক্ষণ দন্তগহ্বরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিলে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং দন্তশূল, মাড়ীফোলা এবং অন্যান্য দন্ত-রোগ উৎপাদন করিয়া অশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে। দন্ত আল্‌গা বা নষ্ট হইলে ভোজন ও পরিপাকের কিরূপ ব্যাঘাত ঘটে, আমি ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পানের "বিষম" কিরূপ ক্লেশদায়ক, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সর্ব্বদা পান মুখে থাকিলে "বিষম" লাগিবার অধিক সম্ভাবনা।

এই সকল অসুবিধার জন্য কেহ কেহ পানের ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিলাতফেরৎ ভারতবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই পান খান না, কেহ কেহ পানের পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, এলাইচ প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সরকারী আপিসে বা আদালতে কাজ কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কাজ করিবার সময় পান ব্যবহার করেন

না—এ অভ্যাসটী বড়ই সুসঙ্গত। সাহেবেরা আমাদের পান খাওয়া পছন্দ করেন না, সুতরাং সাহেবদের সহিত যাঁহাদের সর্ব্বদা কাজকর্ম্ম করিতে হয়, তাঁহাদের সেই সময় পান না খাইলেই ভাল হয়। কিন্তু সাহেবদিগের চক্ষে ইহা ভাল লাগে না বলিয়া এই প্রাচীন, নির্দ্দোষ, জাতীয় আচারটীকে একেবারে পরিত্যাগ করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই না। কাজকর্ম্ম করিবার সময় পান না খাইয়া আহারের পর বা বিশ্রামের সময় পরিমিত মাত্রায় পান খাইলে কোন দোষ হয় না, বরঞ্চ পূর্ব্বকথিত বিবিধ উপকার লাভ করা যায়। পান খাইয়া মুখ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিলে, ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব অকারণ একটী তৃপ্তিপ্রদ, উপকারী, ভোগ্য-বস্তু হইতে বঞ্চিত থাকিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে যাঁহাদের পানে রুচি নাই, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

পান আমাদের সমাজে ভদ্রতা ও সম্মান রক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ উপকরণ। কেহ বাটীতে আসিলে তাহাকে পান না দেওয়া একটা সৌজন্যবহির্ভূত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। রাজসভায় ও সামাজিক উৎসব উপলক্ষে পান বিতরণ বিশেষ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া

বিবেচিত হয়। হিন্দুর সামাজিক আচার মাত্রেই পান একটী মঙ্গলসূচক পদার্থ। পানের চাষ করিবার জন্য হিন্দু সমাজে "বারুই" নামক একটী ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং পানের ব্যবসা করিয়া বহুলোক জীবিকা সংগ্রহ করিতেছে। পানের পরিমিত ব্যবহারে যখন ইষ্ট ব্যতীত কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় না, তখন এই বহুপ্রাচীন জাতীয় আচারের এককালীন পরিবর্জ্জন করিবার উপদেশ সুযুক্তি বা স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করে না।

তামাক।—পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোন আকারে তামাকের ব্যবহার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ চুরুট বা সিগারেটের আকারে অথবা পাইপ, হুঁকা বা গুড়গুড়ির সাহায্যে তামাকের ধূম পান করিয়া থাকে। অপর লোকে দোক্তা, গুল বা স্ফুর্ত্তির আকারে তামাক মুখের মধ্যে রাখিয়া উহার রস গ্রহণ করে। কেহবা নস্যরূপে তামাক ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে তামাকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্রে তাম্রকূটের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে তামাকের চাষ বিস্তৃত ভাবে হইলেও ইহা আমাদিগের স্বদেশী বস্তু

নহে। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে স্পেন্‌দেশবাসিগণ আমেরিকার অন্তঃপাতী কিউবা (Cuba) প্রদেশ হইতে তামাক প্রথমতঃ ইয়ুরোপে আনয়ন করেন। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজ্‌গণ দাক্ষিণাত্যে তামাক আনয়ন করেন কিন্তু মোগল সম্রাট্‌ আকবরের রাজত্ব কালেই সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তামাকের ধূমপান বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ধূমপানার্থ তামাকের ব্যবহার আমেরিকার অসভ্য আদিম-নিবাসীদিগের নিকট হইতে জগতের সমস্ত সভ্যজাতি শিক্ষা করিয়াছে।

অনেকের ধারণা আছে যে, রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে বিখ্যাত সর্ ওয়াল্টার্ রালে (Sir Walter Raleigh) আমেরিকার অন্তর্গত নূতন আবিষ্কৃত ভার্জিনিয়া প্রদেশ হইতে তামাক প্রথমে ইংলণ্ডে আনয়ন করেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে রালের ভার্জিনিয়া আবিষ্কার সম্বন্ধীয় আমেরিকা-অভিযান ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ১৯ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সর্ জন্ হকিন্স্ (Sir John Hawkins) নামক একজন ইংরাজ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে প্রথম তামাক আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। তবে সর্ ওয়াল্টার্ রালের দ্বারাই

ইংলণ্ডে তামাকের ধূমপান বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি ঘরের পয়সা খরচ করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে রৌপ্যনির্ম্মিত তামাক খাইবার পাইপ্ বিতরণ করিতেন এবং নিজে সর্ব্বদা তামাক খাইয়া তাহাদিগকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলিতেন। এ সম্বন্ধে একটী কৌতুকপূর্ণ গল্প প্রচলিত আছে। একদিন সর্ ওয়াল্টার্ তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া পাইপে ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে প্রভুর মুখ হইতে অনর্গল ধূম নির্গত হইতেছে। সে পূর্ব্বে কাহাকেও তামাক খাইতে দেখে নাই। সে মনে করিল যে প্রভুর বস্ত্রাদি কোনরূপে অগ্নিসংযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া এক জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্র আনিয়া আগুন নিবাইবার জন্য সমস্ত শীতল জল প্রভুর মস্তকে ঢালিয়া দিয়াছিল। রালে এই ব্যাপারে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন।

অনেকে হয় ত অবগত নহেন যে, ইংলণ্ডে আলুর চাষ রালে দ্বারাই প্রথমে প্রচারিত হয়। তামাক ও আলু এই উভয় দ্রব্যই আমেরিকা হইতে প্রায় এক সময়ে ইংলণ্ডে আনীত হইয়াছিল।

তামাকের ব্যবহার যখন প্রথম প্রচলিত হয়,

তখন সর্ব্বত্রই ইহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিকূলাচরণ দৃষ্ট হইয়াছিল। তবে ওহাবি (Wahabi) মুসলমান ব্যতীত অপর কোন জাতিরই বিরুদ্ধাচরণ বেশী দিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। সকলেই কালে তামাকের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, কেবল ওহাবিরাই আজি পর্য্যন্ত তামাক কোন আকারে স্পর্শ করে না। পূর্ব্বে ইয়ুরোপীয় তুরুষ্কে কেহ ধূমপান করিলে তাহার নাসারন্ধ্রের মধ্যে তামাকের পাইপটী গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে নগরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করাইয়া অবমানিত করা হইত। রুসিয়ার সম্রাট্ পিটার্ দি গ্রেটের রাজত্বকালে কেহ নস্য লইলে, তাহার নাসিকা-ছেদনের সুব্যবস্থা প্রচলিত ছিল! শিখগুরু নানক তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তামাকের ব্যবহার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবরের উদারনীতির গুণে ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহারের জন্য কাহাকেও কোন নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই।

যে কোন আকারে তামাক ব্যবহৃত হউক না কেন, উহা বিষাক্ত পদার্থ। তামাকের মধ্যে নিকোটিন্ (Nicotine) নামক একটী তরল প্রবল বিষধর্ম্মযুক্ত পদার্থ আছে। ইহার এক বিন্দুমাত্র উদরস্থ হইলে প্রাণ-

হানি হইবার সম্ভাবনা। অতি অল্প মাত্রায় নিকোটিন্ প্রথমতঃ ঈষৎ উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে; মাত্রা কিঞ্চিদধিক হইলে শিরোঘূর্ণন, বমনেচ্ছা, বমন, আলস্য, নিদ্রালুতা, দর্শন ও শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা, ঘর্ম্ম, তালুর শুষ্কতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা দেশে অনেক বয়স্থা ভদ্রমহিলা পানের সহিত দোক্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন। দোক্তা খাইবার পর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা ইহাকে "দোক্তালাগা" বলিয়া থাকেন। দোক্তার নিকোটিন্ অল্পমাত্রায় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এইরূপ বিষক্রিয়া উৎপাদন করে। নিকোটিনের মাত্রা অধিক হইলে, শরীরে অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়; ঘাড় লুটাইয়া পড়ে, নাড়ীর গতি মৃদু ও ক্ষীণ হয়, মুখ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, হস্তপদ অবশ ও শীতল হয়, দৃষ্টি-শক্তি লোপ পায়, ক্রমে শরীর হিম হইয়া মূর্চ্ছা ও মৃত্যু উপস্থিত হয়।

যাহারা দোক্তা বা সুর্ত্তি ব্যবহার করে, অথবা তামাকের পাতা চূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখের ভিতর রাখিয়া উহার রসগ্রহণ করে, তাহাদের তামাকের বিষ দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হইবার কথা। তবে যে অনেক স্থলে কোন অনিষ্ট সাধিত হইতে দেখা যায় না,

তাহার কারণ এই যে, তামাক যে কোন আকারে মুখে রাখিলে লালার স্রাব এত অধিক পরিমাণে নির্গত হয় যে সর্ব্বদাই তাহাদিগের "ছেপ" ফেলিবার আবশ্যকতা হয়। "ছেপে"র সহিত অধিকাংশ নিকোটিন্ বহির্গত হইয়া যায়, তজ্জন্য উপর্য্যুক্ত বিষলক্ষণ সমূহ শরীরের মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রকাশ পায় না। তবে দোক্তা প্রথম ব্যবহার করিবার সময় অথবা উহার মাত্রা অধিক হইলে, অনেকেই বিশেষ অসুস্থতা অনুভব করিয়া থাকে। যে কোন আকারে তামাক মুখের মধ্যে রাখা কোন মতেই নিরাপদ্ নহে।

তামাকের ধূমপান করিলে তন্মধ্যস্থিত অধিকাংশ নিকোটিন্ দগ্ধ হইয়া যায়, এজন্য তামাক বিষাক্ত পদার্থ হইলেও অধিকাংশ লোকেই উহার ধূমপান করিয়া অসুস্থতা বোধ করে না। যত প্রকার মাদক দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে কেবল তামাকের ধূমপান দ্বারা অধিক অনিষ্ট সাধিত হয় না। তবে যাহারা প্রথম চুরুট বা পাইপ্ খাইতে আরম্ভ করে, তাহারা প্রথম প্রথম গা-বমি, মাথাঘোরা ও দৈহিক অবসন্নতাজনিত কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। নিকোটিন্ কিয়ৎ পরিমাণে চুরুটের ধূমের সহিত দেহমধ্যে শোষিত হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ করে।

তামাক যদি ব্যবহার করিতেই হয়, তাহা হইলে যে উপায়ে তন্মধ্যস্থ বিষাক্ত পদার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা শ্রেয়স্কব। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথামত হুঁকা বা গুড়গুড়িতে ধূমপান করিলে, বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায না। তামাকের ধূম, হুঁকা বা গুড়গুড়ির জলেব মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় নিকোটিনেব অংশ জলে দ্রবীভূত হইযা যায়, সুতরাং চুরুট, সিগারেট বা পাইপ্ হইতে উদ্গত ধূমের সহিত উহা যেমন দেহ মধ্যে প্রবেশ কবিবার অবকাশ পায়, হুঁকা বা গুড়গুড়িতে তামাক খাইলে তদ্রূপ না হইয়া উহা সম্পূর্ণরূপে পবিত্যক্ত হইয়া যায। বহুদিন পূর্বে এদেশে অনেক সাহেব ধূমপানের জন্য গুড়গুড়ি ব্যবহার করিতেন; এখন এপ্রথা সাহেবদের মধ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, এরূপভাবে তামাক খাইলে তামাকের উত্তেজনা-শক্তি শরীরের মধ্যে মোটেই প্রকাশ পায় না, সুতরাং গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া আর না খাওয়া দুই সমান। আমরা কিন্তু এই মতের পোষকতা করি না।

পরিমিত-ভাবে চুরুট বা সিগারেট ব্যবহার করিলে, অনেকেরই পক্ষে উহা অনিষ্টকর হয় না; তবে এমন অনেক

লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের তামাকের ধূমপান একেবারেই সহ্য হয় না। যাঁহারা ধূমপানে অভ্যস্ত, তাঁহারা বলেন যে, ইহা দ্বারা শ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হইয়া শরীর পুনরায় সতেজ ও কার্য্যক্ষম হয়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রমজীবিগণ তামাক না খাইয়া অধিকক্ষণ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না ; তামাক পাইলে তাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণা পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ সহ্য করিয়া থাকিতে পারে। তাহাদিগের অভ্যাস ও তামাকের উত্তেজনাশক্তি, এই উভয় কারণই ইহার মূলে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। যতক্ষণ তামাক পরিমিত মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, ততক্ষণ ইহা দ্বারা কোন বিশেষ অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না ; সুতরাং যাহাদের তামাক খাওয়া অভ্যাস, তাহাদিগের এরূপ সুলভ, ক্লান্তি-হারক, ভোগ্যবস্তু হইতে একেবারে বঞ্চিত থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্য যে, আমাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তামাকের মোটেই আবশ্যকতা নাই এবং যাহারা তামাক খায় না, অন্য উপায়ে তাহাদের পরিশ্রম-জনিত শ্রান্তি দূরগত হইয়া থাকে, তজ্জন্য তামাকের প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ যে কোনরূপ মাদকদ্রব্যের পরিবর্জ্জন যে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না।

বয়স্থ লোকের পক্ষে পরিমিত মাত্রায় চুরুট বা সিগারেট্ ব্যবহার করা অনিষ্টকর না হইলেও বালক ও যুবকদিগের পক্ষে উহা নিরাপদ্ নহে। তাহাদিগের বৃদ্ধিশীল স্নায়ুমণ্ডলী ও শারীরিক অপরাপর যন্ত্রাদি ইহার বিষক্রিয়া দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহাদের পরিপাকশক্তি ক্ষীণ হয়, মানসিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়, স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল হয় এবং ক্রমে তাহারা নিতান্ত আলস্যপরায়ণ হইয়া পড়ে। আজকাল এদেশে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে সিগারেট্ ও "বিড়ি" খাওয়া রোগ সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালকের মুখে সিগারেট্ শোভা করিতেছে, এরূপ অপ্রীতিকর দৃশ্য রাস্তাঘাটে নিতান্ত বিরল নহে। যাহাতে ছাত্রবয়সে এই কদভ্যাস বদ্ধমূল না হয়, তদ্বিষয়ে বালকদিগের অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এই কদভ্যাস বড়ই সংক্রামক। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একজন বালক সিগারেট্ খাইতে শিক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক ছাত্রকে কুপথে আনয়ন করিয়াছে। কলিকাতায় এই কদভ্যাস দমন করিবার জন্য এণ্টিস্মোকিং সোসাইটী নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক সময়ে স্বনামখ্যাত অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার মহাশয় এবং তৎপরে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা

কেশবচন্দ্র সেন ব্যাণ্ড্ অব্ হোপ্ (Band of Hope) নামক এক সমিতি স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগের মধ্যে সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধ করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছিল। আজিকার দিনে তাঁহাদিগের ন্যায় ছাত্রবন্ধুর অভাব আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা-বিভাগ ছাত্রদিগের মধ্যে এই কদ-ভ্যাস নিবারণ করিবার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের মহতী চেষ্টা ফলবতী হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ষোল বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকদিগের মধ্যে ধূমপান নিবারণের জন্য বাংলাদেশে একটী আইন প্রচলিত হইয়াছে।

অধিক মাত্রায় চুরুট বা সিগারেট্ ব্যবহার করিলে, অথবা পাইপে অনবরত ধূমপান করিলে কণ্ঠদেশের প্রদাহ, অজীর্ণ এবং মুখের ভিতর, গলায় এবং ফুস্‌ফুসে দুরারোগ্য ক্ষত জন্মিতে দেখা যায় এবং হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন, অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া হাঁপধরা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগ শরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কখন বা দৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয়।

পাইপে ধূমপান করা, চুরুট বা সিগারেটের ব্যবহার

করা অপেক্ষা, অধিকতর অনিষ্টকর। তামাক পাইপের মধ্যে পুড়িবার সময় যথোচিত পবিমাণ বায়ুর অভাবে নিকোটিন্ ব্যতীত পাইরিডিন্ (Pyridine) নামক আর একটি বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তামাকেব ধূমের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবেশ কবিয়া বিষক্রিয়া প্রদর্শন করে। চুরুট বা সিগারেট্ পুড়িবার সময় পাইরিডিন্ উৎপন্ন না হইয়া কলিডিন্ (Collidine) নামক আর একটী সামান্য বিষধর্ম্মযুক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। হুঁকা বা গুড়গুড়িতে তামাক খাইলে, ইহাদিগের একটিও শবাবেব মধ্যে প্রবেশ কবিবাব অবকাশ প্রাপ্ত হয় না।

অল্পবয়সে ধূমপান কবিতে অভ্যাস কবিলে, তামাকের বিষক্রিয়া শবাব মধ্যে শীঘ্র প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়। তামাক যে কোন বযসে কোন আকাবে ব্যবহাব না করাই ভাল; তবে যদি ধূমপান করিতেই হয়, তাহা হইলে বিংশতি বৎসর বযঃক্রমের পূর্ব্বে যেন কেহ তামাক ব্যবহার না করেন; ইহাতে শরীব ও মন শীঘ্রই অসুস্থ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

নস্যগ্রহণ এক অতি কদর্য্য অভ্যাস। ইহা দ্বারা নাসিকার অভ্যন্তর প্রদেশ অযথা উত্তেজিত হয় এবং অনবরত শ্লেষ্মা নিঃসারিত হইয়া বস্ত্রাদিকে মলিন, অপরিচ্ছন্ন ও

দুর্গন্ধযুক্ত করে। নাসারন্ধ্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ শ্লেষ্মা অবিরাম ক্ষরিত হইলে কিরূপ বিরক্তিকর দৃশ্য উপস্থিত হয়, তাহার বর্ণনার আবশ্যকতা নাই। নাসিকা-গহ্বরের অস্বাভাবিক উত্তেজনা হেতু তন্মধ্যে ক্ষত ও অন্যান্য রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

হুঁকা বা গুড়গুড়িতে তামাক খাইলে, তামাকের মাদকতা-শক্তির যে কেবল হ্রাস হয় তাহা নহে, ব্যয় সম্বন্ধেও ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। যাঁহারা চুরুট বা সিগারেট্ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের অনেকের এই বিষয়ের খরচ এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সেদিন আমার একজন বন্ধু গল্প করিতেছিলেন যে, একজন দেশীয় রাজার চুরুটের জন্য বৎসরে বিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়! কোন কোন সাহেবকে চুরুটের জন্য মাসে ১০০ শত টাকার অধিক ব্যয় করিতে দেখা গিয়াছে। কি বিষম অপব্যয়! আমাদের প্রাচীন প্রথামত একছিলিম তামাক সাজিলে, চাটুয্যে মশায়, মুখুয্যে মশায়, দত্তজ, ঘোষজ, মিত্রজ প্রভৃতি প্রতিবাসী, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, যে কেহ বাটীতে সমাগত হউন না কেন, হুকা বদ্‌লাইয়া ঐ এক কলিকা তামাক সকলেরই উপভোগ্য হইয়া থাকে। তদুপরি আবার যদি নফর মণ্ডল, রমাই

সর্দ্দার, পাঁচু সেথ প্রভৃতি গ্রামবাসী প্রজাগণ খাজানা দিবার জন্য অথবা মামলা মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আইসে, তাহা হইলে তাহারাও শুধু কলিকা লইয়া দাদাঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া আপ্যায়িত হইয়া যায়। আমরা যদি এরূপ সুলভ, অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ আরামের দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিষাক্ত অর্থনাশক বিলাতী ধূমপান প্রথার পক্ষপাতী হই, তাহা হইলে আমাদের বিচারবুদ্ধি যে বিশেষ প্রশংসনীয় নহে, তাহা মনে করা বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম।

যেমন কোন লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র কিছু দিন ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে মড়িচা ধরিয়া উহা বিকল হইয়া যায়, সেইরূপ সমুচিত পরিশ্রমের কার্য্য দ্বারা আমাদিগের দেহ-যন্ত্রের পরিচালনা না করিলে তন্মধ্যে মড়িচার ন্যায় নানাবিধ দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং উহা শীঘ্রই অপটু হইয়া পড়ে। শরীর অপটু হইলেই দেহস্থিত যাবতীয় যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া স্বভাব নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে অধ্যয়ন, চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা, বিচার প্রভৃতি মস্তিষ্কের কার্য্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং সেই সঙ্গে দয়া, প্রেম, ভক্তি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি সম্যক্ স্ফুরণ লাভ করিতে অসমর্থ হয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুস দুর্ব্বল হইলে রক্ত পরিশোধনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, সুতরাং দেহজাত নানাবিধ দূষিত পদার্থ রক্তমধ্যে সঞ্চিত হইয়া শরীরকে আরও বিকল এবং রোগপ্রবণ করিয়া

তোলে। পরিপাক যন্ত্রগুলির দুর্ব্বলতাহেতু খাদ্য সম্যক্ রূপে পরিপাক না হইয়া উহার অধিকাংশই অসার পদার্থরূপে আমাদিগের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়; কিয়দংশ মাত্র শরীর পোষণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্টাংশ বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া শোণিত মধ্যে শোষিত হয় এবং রক্তকে দূষিত করিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। কলের মধ্যে মড়িচা পড়িলে উহার ভালরূপে চলিবার যেমন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, তেমনি পরিশ্রমের কার্য্য না করিলে আমাদিগের শরীরে অধিক পরিমাণ চর্ব্বি সঞ্চিত হইয়া হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মায়। এইজন্য অলস ব্যক্তি অপেক্ষা পরিশ্রমশীল ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও মানসিক সচ্ছন্দতা অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ আমরা দুইটী কারণে পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি—(১) জীবিকা-নির্ব্বাহ উপলক্ষে এবং (২) ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গচালনা করিয়া শারীরিক ও মানসিক সচ্ছন্দতা লাভ করিবার জন্য। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পরিশ্রমকে আমরা ব্যায়াম (Exercise) বলিয়া থাকি। কোন না কোনরূপ অঙ্গচালনা ব্যতিরেকে আমাদিগের

শরীর প্রকৃত স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে কখনই সমর্থ হয় না। পুনশ্চ শরীরের সহিত মনের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একের অসুস্থতা নিবন্ধন অপরটী বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ল্যাটিন্ ভাষায় একটী কথা প্রচলিত আছে যে নীরোগ দেহের আশ্রয় ব্যতীত শক্তিসম্পন্ন মন বাস করিতে পারে না; ইহা অতি সত্য কথা। দেহ অসুস্থ হইলে মন কিরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই।

ব্যায়াম সম্বন্ধে চরক এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শরীরচেষ্টা যা চেষ্টা স্থৈর্য্যার্থা বলবর্দ্ধিনী।
দেহব্যায়াম-সংখ্যাতা মাত্রয়া তাং সমাচরেৎ॥"

যে শরীরচেষ্টা দ্বারা দেহের স্থিরতা ও বল বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে দেহব্যায়াম কহে; উপযুক্ত মাত্রায় ইহার সমাচরণ করিবে।

"লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।
দোষাপায়াহগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥"

ব্যায়াম দ্বারা শরীর লঘু হয়, কর্ম্ম করিবার শক্তি, স্থিরতা, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা ও পরিপাক-শক্তির বৃদ্ধি সাধিত দৈহিক বিবিধ দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

চবুক অপবিমিত হাস্য, বৃথা বাক্যব্যয প্রভৃতি অন্যান্য কদভ্যাসের ন্যায় অতিব্যাযাম নিষেধ করিযা গিয়াছেন—

"শ্রমক্লম ক্ষয়তৃষ্ণা রক্তপিত্তং প্রতানকঃ।
অতিব্যাযামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিশ্চ জাযতে॥
ব্যায়াম হাস্য ভাষ্যাধ্ব গ্রাম্য ধর্ম্ম প্রজাগবান্।
নোচিতানপি সেবেত বুদ্ধিমানতিমাত্রয়া॥"

শ্রম, ক্লান্তি, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তবমন, দৃষ্টিহীনতা, কাসি, জ্বর এবং সর্দ্দি অতিব্যাযাম হইতে উৎপন্ন হয়। ব্যায়াম, হাস্য, বাক্যকথন, ভ্রমণ, জাগরণ প্রভৃতি দৈহিক কার্য্যগুলি বিধেয হইলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহাদিগের একটীও অতি-মাত্রায় সেবন করিবেন না।

আমাদিগের দেশের 'বড়মানুষেরা' কায়িক পরিশ্রমের কার্য্য করা নিন্দনীয বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন যে 'বড়লোকেরা' পরিশ্রম করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা কেবল খাইয়া, শুইয়া, গল্প ও আমোদ করিয়া সময় কাটাইবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ. হইয়াছেন। সাধারণ লোকেরাই কাযিক পরিশ্রম করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং যখন তাহারা 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া' জীবিকা অর্জ্জন করে, তখন তাহারা স্বভাবনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে মাত্র! ইঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে

কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া নিজেদের আলস্যপরায়ণতা ও সাধারণ লোকের কর্ম্মবহুল জীবন ভগবানের অনুমোদিত বলিয়া উহার সমর্থন করিয়া থাকেন। শ্রমলব্ধ সংসারিক সচ্ছন্দতা ভোগ করা যে কি সুখ, তাহা যে একবার জানিয়াছে, সে কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি ক্ষুধা কাহাকে বলে, তাহা অনেক সময়ে জানিতে পারে না। সুতরাং বিবিধ ভোগ্যবস্তু আহার করিবার সুবিধা থাকিলেও ক্ষুধার অভাবে, আহারে যে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করা যায়, তাহার আস্বাদ তাহার ভাগ্যে কখনই ঘটিয়া উঠে না। ক্ষুধাই খাদ্যকে অমৃত তুল্য করে, ক্ষুধাবিনা ভোগ্যবস্তুর আয়োজন বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া থাকে। অলস ব্যক্তি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া এবং তাড়িত-ব্যজন-সেবিত হইয়াও রাত্রিকালে সুনিদ্রা লাভ করিতে সমর্থ হয় না; সুনিদ্রার অভাবে অনেক সময়ে তাহার "শয্যাকণ্টক" উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রমশীলব্যক্তি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াও বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে দেবদুর্লভ শান্তিসুখ লাভ করিয়া থাকে। পরিশ্রম ব্যতীত বিবিধ ভোগ্যবস্তুর প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহাদের ভোগ্য বস্তুর অভাব নাই, তাঁহারা যদি স্বকীয় দোষে তাহাদের প্রকৃত আস্বাদ

গ্রহণে বঞ্চিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথার্থই কৃপার পাত্র। অবশ্য যাহারা প্রাণ-পাত-পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়াও স্ব স্ব সাংসারিক অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা পরিশ্রম করে বলিয়াই যে শান্তি, সুখ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হয, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া সকলকেই যে "জনমজুরের" মত খাটিতে হইবে, তাহাব কোন অর্থ নাই। কাযিক পরিশ্রমদ্বাবা জীবিকাসংগ্রহ করা অসম্মানের কার্য্য, এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দেশের অনেক লোকের মনে এখনও বদ্ধমূল হইয়া আছে বলিয়া এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই অপুরুষোচিত বিশ্বাস হইতেই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা এদেশে সমুচিত অপমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আত্ম সম্মানের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া মুষ্টিমেয় সাহায্যের জন্য সমস্ত দিন কোন ধনী ব্যক্তির বা দাতব্য সভার দ্বারে "ধর্ণা" দিয়া লোকে বসিয়া থাকিবে বরং তাহাও ভাল, তথাপি সবল ও সম্পূর্ণ সুস্থশরীর থাকিতেও "গতর খাটাইয়া" অন্নসংস্থানের চেষ্টা কখনই করিবেক না, কারণ ইহাতে তাহার ব্যক্তিগত ও বংশগত মর্য্যাদার হানি হইবে! এইরূপ অলস

জীবন কিছু দিন অতিবাহিত করিলেই এমন এক কদভ্যাস দাঁড়াইয়া যায় যে ঐ ব্যক্তির পক্ষে কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। দেশের মধ্যে যে কত লোকের জীবন এইরূপ চেষ্টাশূন্য ও উদ্যমবিহীন হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা পরপুষ্ট জীবের (Parasite) ন্যায় সমাজ-হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আশ্রমবিশেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে, বিশেষতঃ সংসারীর পক্ষে, উহা অপেক্ষা নীচবৃত্তি আর কিছুই হইতে পারে না। যাহারা এই বৃত্তির অবলম্বন করে এবং যাহারা ইহার প্রশ্রয় প্রদান করে, তাহারা উভয়েই তুল্য অপরাধী এবং ইহার জন্য যে সামাজিক ও জাতিগত অবনতি সংঘটিত হইতেছে, তাহার জন্য দাতা ও গৃহীতা উভয়েই তুল্য ভাবে দায়ী। পাশ্চাত্যদেশে শ্রমশীল লোকের সংখ্যা এত অধিক বলিয়া উহাদিগের গৃহে কমলা চিরদিন অচলা হইয়া রহিয়াছেন, আর আমরা আলস্য ও উঞ্ছবৃত্তির সেবা করিয়া দিন দিন এইরূপ "লক্ষ্মীছাড়া" দশা প্রাপ্ত হইতেছি। নিঃসহায় অন্ধ, খঞ্জ, রোগার্ত্ত বা জরাপীড়িত ব্যক্তি সমাজের অবশ্য পোষ্য এবং এমন কোন দেশই

নাই, যথায় তাহাদিগের প্রতিপালনের জন্য কোন না কোনরূপ সুব্যবস্থা নাই। দুঃখীর দুঃখমোচন করা মনুষ্যোচিত কার্য্য। যে ব্যক্তি ক্ষমতাসত্ত্বে এরূপ কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হয়, সে মানব-নাম ধারণের অযোগ্য। কিন্তু আলস্যের প্রশ্রয় না দিয়াও দুঃখীর দুঃখমোচন করিতে পারা যায এবং প্রত্যেক সমাজহিতৈষীর ঐরূপ সদুপায় অবলম্বন করাই উচিত। সেই সকল সদুপায় কি, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নহে, তবে ইহা সত্য কথা যে সুস্থ, সবল, "পেশাদার" ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়া আমরা যেরূপ বিনা সঙ্কোচে তাহার আলস্যের এবং অনেক স্থলে তাহাদিগের কুচরিত্রের প্রশ্রয় প্রদান করি এবং তাহার ইহ ও পরকালের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিই, এরূপ আর অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যতদিন পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশেও কায়িক পরিশ্রম সম্মানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিবে না, আমাদের হৃদয়ে আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগরূক হইবে না, আত্মনির্ভরতা আমাদের জাতীয় চরিত্র সুশোভন করিবে না এবং কোন বিষয়েই আমাদের দৈন্যও ঘুচিবে না।

কর্ম্ম করিবার জন্যই মানুষের জন্ম, কর্ম্ম করা ব্যতীত

আমাদের অন্য উপায় আর নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।"
"কর্ম্মছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়,
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়।" সত্যেন্দ্রনাথ।

সকল দেশের সকল ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র দ্বারা এই মত বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে। তবে অবস্থাভেদে মানুষের কর্ম্মের প্রভেদ হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষে কাজ না করিলে তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে না, সুতরাং কর্ম্ম তাহার জীবনের সহায় স্বরূপ। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবার জন্য যাহাদের কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা হয় না, কোন না কোনরূপ কর্ম্ম না করিলে তাহাদেরও জীবনযাত্রা সচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। মানুষকে কাজ করিতে দেখিয়া মানুষের অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি কিরূপে জন্মিতে পারে, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যে মানুষের কণামাত্র আত্মসম্মান ও দায়িত্ব জ্ঞান আছে, সে কখনই অলস জীবন বহন করিতে স্বীকৃত হয় না। কর্ম্ম

যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পন্ন করিতে না হয়, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। অবশ্য ইচ্ছাবিরুদ্ধ কর্ম্ম অনেকস্থলেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া থাকে। কর্ম্ম অপেক্ষা সুশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। কর্ম্মই মানুষকে শত শত বিভিন্ন প্রকৃতির মানব ও বিবিধ অবস্থার সংঘর্ষে আনয়ন করে, সুতরাং কর্ম্ম দ্বারাই তাহার অভিজ্ঞতার প্রসার ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। মহাপুরুষেরা জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারাই জগতের ইতিহাসে অবিনশ্বর কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আজ পৃথিবীতে যাহা কিছু মনস্বিতার, যাহা কিছু জ্ঞানের, যাহা কিছু উন্নতির, যাহা কিছু উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে মানবের অবিরাম শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান কর্ম্মভূমি আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম সামগ্রীটিও জীবনব্যাপী পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্ন হয় নাই। একজন ধর্ম্ম-যাজক রহস্যচ্ছলে বলিয়া গিয়াছেন—“পরিশ্রম করা অপেক্ষা পরিশ্রম না করাই অধিক পরিশ্রমসাপেক্ষ।” বাস্তবিক অলস ব্যক্তির

জীবনের ভার অনেক সময়েই নিতান্ত দুর্ব্বহ বলিয়া তাহার মনে হয়। ধন, জন, যশ, সম্পদ্, সুখ, সচ্ছন্দতা, সকলগুলিই পরিশ্রমশীল ব্যক্তির করতলগত থাকে; উদ্যোগী পুরুষসিংহই লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন।

যৌবন কালে আলস্যের ন্যায় অধঃপতনের সরল পথ আর দ্বিতীয় নাই। এই সময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকিলে, মানুষের চরিত্র ও মহত্ব উভয়ই চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। একজন ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া গিয়াছেন যে, আলস্যই মনুষ্যের জীবন্ত সমাধি; সে যখন জীবিত থাকিয়া—না মনুষ্যের, না ঈশ্বরের—কাহারও কার্য্যে লাগে না, তখন মৃত বা জীবিত অবস্থা তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। প্রাচীন গ্রীকগণ সমাজরক্ষার জন্য কায়িক পরিশ্রম এতই আবশ্যক মনে করিতেন যে, কেহ অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাহার সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—"পরিশ্রম সমাজে পাপস্রোত নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়।" যে অলস, তাহাকে তাঁহারা চোর ডাকাইতের সহিত তুলনা করিতেন। এক-খানি ইংরাজি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক পাপপুরুষের কারখানা স্বরূপ, কারণ যত কিছু গর্হিত

কার্য্য পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত।"

প্রত্যহ কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ ব্যায়াম না করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করা যায় না। ব্যায়াম করা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; শিশু ও বালকদিগের স্বাভাবিক চঞ্চলতাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সামর্থ্য অনুসারে যে অঙ্গ যত অধিক চালনা করিবে, তাহা ততই পুষ্টি ও শক্তি লাভ করিয়া অধিকতর কার্য্যক্ষম হইবে। হাত পায়ের ব্যবহার না থাকিলে, উহাদের মাংসপেশী হীনবল ও শুষ্ক হইয়া যায়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হস্তপদ বা ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীদিগের হাত ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। হস্তপদের যথারীতি চালনা করিলে পেশী-সমূহ দৃঢ়, পুষ্ট ও সবল হইয়া থাকে। কামারের হাত, ডাকহরকরার পা, মাঝিদিগের বক্ষঃস্থল ও বাহু প্রভৃতি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এই কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

ব্যায়াম করিলে, হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা হইয়া সর্ব্ব শরীরে রক্ত উত্তমরূপে পরিচালিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহ সবল ও দৃঢ় হয়। যথারীতি ব্যায়াম না করিলে, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যায়াম করিলে,

হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন ও অন্যান্য দুরারোগ্য রোগ উৎপন্ন হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এজন্য অতিব্যায়াম অথবা, দুর্ব্বল ব্যক্তি কিম্বা যাহাদের কোনরূপ হৃদ্‌রোগ আছে তাহাদের, শ্রমসাধ্য ব্যায়াম করা অনুচিত।

ব্যায়াম করিলে, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, এইজন্য ফুস্‌ফুস্ অধিকতর অক্সিজেন্ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এই অতিরিক্ত অক্সিজেন্ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয় এবং এইরূপে রক্তের শোধনক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে শ্বাস-ক্রিয়া সম্বন্ধে দুই একটি প্রয়োজনীয় কথার সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়। গভীর নিশ্বাস লইলে ফুস্‌ফুস্ সমধিক বিস্তৃত হয় এবং অধিক পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার হেতু রক্ত-শোধন-কার্য্যের সুবিধা হয়। পুনশ্চ ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হয়, শ্বাস-ক্রিয়া গভীর হইলে, তাহার অধিকাংশ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। সর্ব্বদা সোজা ভাবে শরীর উন্নত করিয়া রাখা উচিত, নহিলে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। কুঁজা লইয়া বসিলে অথবা কাত হইয়া বাঁকিয়া থাকিলে, ফুসফুসের যথোচিত প্রসারণের ব্যাঘাত ঘটে,

সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অনিষ্টকর। আমরা পড়িবার বা লিখিবার সময় প্রায়ই কুঁজা হইয়া বসি; ইহা দ্বারা শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। আমাদিগের যোগশাস্ত্রে শ্বাসক্রিয়া গ্রহণ করিবার যে নিয়ম বর্ণিত আছে, তাহাতে সম্পূর্ণ সোজাভাবে উপবেশন করিয়া গভীর নিশ্বাস লইবার কথাই আছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গভীরভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করিলে রক্ত পরিষ্কৃত হইবার বিশেষ সুবিধা হয়। এই অভ্যাস যদি আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে যখন আমরা মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া থাকি, তখন ইহার সুফল বিশেষভাবে লাভ করিতে পারি। গভীর শ্বাস-ক্রিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির এক বিশিষ্ট উপায়।

আমাদের নাসিকাই শ্বাস-ক্রিয়ার স্বাভাবিক পথ, সুতরাং মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করা কোনমতে উচিত নহে। নাসিকার অভ্যন্তরপ্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম দ্বারা আবৃত থাকে। বায়ু মধ্যে ধূলিকণা, ভূষা প্রভৃতি সূক্ষ্ম নানাবিধ দূষিত পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে উহারা ঐ রোমরাজির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং শ্বাসবায়ুর সহিত ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ঘরে কেরোসিনের আলো

জ্বালাইলে নাসারন্ধ্রের মধ্য পরদিন কিরূপ "কালি" জমিয়া থাকে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মুখ দিয়া নিশ্বাস লইলে এই সমস্ত দূষিত পদার্থ বায়ুর সহিত ফুস্‌-ফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। পুনশ্চ বাহিরের শীতল বায়ু নাসিকার মধ্য দিয়া দীর্ঘপথ বহিয়া যাইবার সময়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে, কিন্তু মুখ দিয়া নিশ্বাস লইলে বাহিরের শীতল বায়ু (বিশেষতঃ প্রবল শীতের সময়) তদবস্থায় ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া ফুস্‌ফুসের প্রদাহ প্রভৃতি কঠিন রোগ উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা।

যথারীতি ব্যায়াম করিলে বক্ষঃস্থল উন্নত ও প্রসারিত হয় এবং মাপে ৩।৪ ইঞ্চির অধিক বাড়িয়া যায়।

ব্যায়াম দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং উদরের পেশীসমূহের চালনা হেতু মলত্যাগ সহজ ও সরল হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণ মূত্র ও ঘর্ম্ম শরীর হইতে নিঃসারিত হইয়া যায়, সুতরাং দেহ মধ্যে সঞ্চিত বিবিধ দূষিত পদার্থ শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয়।

ব্যায়াম করিলে মস্তিষ্ক সবল ও সতেজ হয় এবং কল্পনা ও চিন্তাশক্তি অধিকতর প্রসার লাভ করে।

ব্যায়াম করিবার সময় চর্ম্মের দিকে অধিক রক্ত সঞ্চারিত হয়, এজন্য ঐ সময়ে প্রচুর পরিমাণ ঘর্ম্মনিঃসারিত হইতে থাকে। কিন্তু এত অধিক ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইলেও যতক্ষণ ব্যায়াম করা যায়, ততক্ষণ বাহিরের বায়ু দ্বারা ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে ব্যায়াম হইতে ক্ষান্ত হইবামাত্র ফ্ল্যানেলের ন্যায় ঘর্ম্মশোষক গরম কাপড় গায়ে দেওয়া উচিত। কারণ ঐ সময়ে চর্ম্মের রক্ত শীঘ্র শীতল হইয়া পড়ে, সুতরাং ঘাম শুকাইবার সময় অধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাসি প্রভৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা।

মুক্ত স্থানে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। যদি গৃহের মধ্যে ব্যায়াম করার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে যে গৃহের মধ্যে অধিক আলো ও বাতাস আসে, তাহার সমস্ত বায়ুপথ উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে ব্যায়াম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে কুস্তি, বৈঠক, মুগুরভাঁজা, লাঠিখেলা, দাঁড়টানা, ডন্‌ফেলা ইত্যাদি নানারূপ ব্যায়াম, কি উচ্চ কি নিম্ন, সকল শ্রেণীর লোকদ্বারাই অল্পাধিক পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইত। কপাটীখেলা, গুলি-দাণ্ডা, দৌড়ান, লাফান, সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি ব্যায়ামক্রীড়া আমাদিগের বালক ও যুবকদিগের অতিশয় প্রিয় ছিল।

তখন গাড়ীঘোড়া ও ট্রামওয়ের এত প্রাদুর্ভাব ছিল না; সহরের সম্পন্ন গৃহস্থলোকেরাও সাংসারিক কার্য্যোপলক্ষে দিনে ২।৪ ক্রোশ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে কষ্টবোধ করিতেন না। এখন ট্রামওয়ের অনুগ্রহে ভদ্রলোকদিগের ত কথাই নাই, শ্রমজীবি-লোকের পক্ষেও এক ক্রোশ পথ ভ্রমণ কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে পয়সা তাহারা ট্রামওয়ের জন্য খরচ করে, পথ হাঁটিয়া যদি তাহা দ্বারা সারবান্ আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করে, তাহা হইলে, ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, উভয়েরই সুফলের অধিকারী হইতে পারে।

জিম্‌নাষ্টিক্ পরদেশীয় হইলেও আমাদের বাল্যাবস্থায় বালক ও যুবকেরা এই ক্রীড়ার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। স্বর্গীয় নবগোপাল মিত্র মহাশয় আমাদের দেশের যুবকদিগের মধ্যে যাহাতে এই ব্যায়াম বিশেষভাবে অনুশীলিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজকাল জিম্‌নাষ্টিকে ছেলেদের বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন ফুট্‌বল্, ক্রিকেট্ ও টেনিস্ খেলার উপরেই ছেলেদের বেশী ঝোঁক হইয়াছে এবং এই সকল খেলায় তাহারা দিন দিন পারদর্শিতা লাভ করিতেছে। ফুট্‌বল্ ও ক্রিকেট্ খেলায় শুদ্ধ যে শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট হয়, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,

কার্য্যে ক্ষিপ্রতা এবং একাগ্রতা প্রভৃতি জীবনযাত্রার উপযোগী সদ্‌গুণগুলি ক্রীড়াচ্ছলে সহজেই আয়ত্ত হইয়া যায়। তবে ফুট্‌বল্ খেলা অতিশয় পরিশ্রম সাপেক্ষ, দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ এবং সবল ব্যক্তির পক্ষেও উহা পরিমিতভাবে আচরণীয়। যাঁহারা অধিক পরিমাণে ফুট্‌বল্ খেলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন এবং এই কারণে অনেক সময়ে আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।*

ক্রিকেট্ খেলা ইংরাজদিগের জাতীয় ক্রীড়া। একটা ইংরাজি কথা আছে "বিখ্যাত ওয়াটার্লু যুদ্ধ একদিনে জিত হয় নাই—ইংলণ্ডের প্রত্যেক ক্রিকেট্ প্রাঙ্গণে প্রত্যহ এই যুদ্ধজয়ের সূচনা হইয়া আসিয়াছে।" একেলা ব্যায়াম করা অপেক্ষা অনেকে একত্রে ব্যায়াম করিলে সবিশেষ

---

* মন্মাউথ্‌সায়রের রগ্‌বি ক্লবের সভাপতি ডাক্তার আর্ জোন্‌স্ এ সম্বন্ধে বলেন :—"Speaking, he said, as a madical man with some experience of the casualties in Rugby football, he has been astonished by the early breakdown of many men of former robust physique with cardiac troubles and injuries to limbs due, in a large measure, to overexertion and over playing in the football field."

স্ফূর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। যে সকল ক্রীড়ায় শরীর-চালনার সহিত মানসিক শক্তিগুলির সবিশেষ পরিচালনা করিবার সুবিধা হয়, সেগুলি অন্য প্রকার ব্যায়াম হইতে যে শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেদিন মোহন বাগান "ফুট্‌বল্ ক্লাবে"র বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি ডাক্তার থর্ণহিল্ (Dr. Thornhill) বলিয়াছিলেন যে, ব্যায়াম-ক্রীড়া দ্বারা সকল শ্রেণীর মনুষ্যের মধ্যে জাতি, বর্ণ ও আভিজাত্যমূলক অভিমান অনায়াসে দূরীভূত হইয়া সহানুভূতি ও আত্মীয়তা যেরূপ প্রসার লাভ করে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এই জন্যই ইংরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ, নবনগরের জামসাহেব রাজা রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি এ দেশের রাজন্যবর্গকেও সাধারণ লোকের সহিত ক্রীড়া-ভূমিতে আমোদ করিতে দেখা গিয়াছে।

দাঁড় টানিলে বাহু, হস্ত, বক্ষঃ ও উদরের পেশী সমধিক সবল ও পুষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে নৌকার "বাচ্"খেলা এদেশীয় যুবকদিগের এক প্রিয় ক্রীড়া ছিল। পূজা ও উৎসবাদি উপলক্ষে নদীবক্ষে বিস্তর নৌকা "বাচ্"খেলায় নিযুক্ত থাকিত ; আজকাল সে দৃশ্য নিতান্ত বিরল হইয়াছে।

এই খেলা নানাকারণে এরূপ মনুষ্যত্ব-স্ফূরক যে ইহা পুনরায় দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত। যাহারা “বাচ্” খেলিত, তাহারা প্রায় সকলেই সন্তরণ বিষয়ে বিশেষ পটু ছিল। সন্তরণ যে কেবল একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম তাহা নহে, ইহা শিক্ষা করিলে আপনাকে এবং অপর লোককে অনেক সময়ে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারা যায়। আজকাল যুবকদিগকে (বিশেষতঃ সহরে) সন্তরণ অভ্যাস করিতে প্রায় দেখা যায় না। সেদিন শিবপুরের ঘাটে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সন্তরণে অভ্যাস থাকিলে এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা বিরল। বড় সুখের বিষয় এই যে, কলিকাতা সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বালকদিগকে সন্তরণ শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা করিতেছেন এবং কলিকাতা সুইমিং এসোসিয়েসন্ (Calcutta Swiming Associatian) সাঁতারে প্রতিদ্বন্দিতার অনুষ্ঠান করিয়া এই কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক যুবকদিগের মধ্যে নৌকাচালনা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই উদ্যোগের সফলতা কামনা করি।

অশ্বারোহণ আর একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহাতে

শরীরের বল এবং মনের সাহস উভয়ই বাড়িয়া যায়। বাঙ্গালী ভিন্ন পৃথিবীর অপর সকল জাতি অশ্বারোহণে অভ্যস্ত। এই ব্যায়াম আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। অশ্বারোহণ-শিক্ষার জন্য বড় বড় সহরে বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত।

আজকাল সাণ্ডোর উদ্ভাবিত ডম্বেল্ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি লইয়া এদেশের অনেকেই ব্যায়াম অভ্যাস করিতেছেন। সাণ্ডোর উদ্ভাবিত প্রণালী যথারীতি অনুসরণ করিয়া ব্যায়াম করিলে শরীরের সমস্ত পেশীরই সম্যক্ পরিচালনা হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা দ্বারা ব্যায়ামের পূর্ণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা 'স্যাণ্ডো' অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে ইহা দ্বারা কত অল্পদিনের মধ্যে শরীর সবল ও মাংসল হইয়া উঠে।

গ্রিপ্ ডম্বেল্ ভাঁজা, ডন্‌ফেলা ও বৈঠককরা একত্রে সম্পাদিত হইলে শরীরের প্রায় সমস্ত পেশীই সম্যগ্‌রূপে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই তিনটী ব্যায়াম সহজসাধ্য এবং সকল স্থানেই সর্ব্বসময়ে সকলেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই তিনটী ব্যায়াম প্রত্যহ অভ্যাস করিলে দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়।

বয়স অধিক হইলে অথবা অন্য কোন কারণে শ্রমসাধ্য

ব্যায়াম নিষিদ্ধ হইলে, পদব্রজে ভ্রমণ অতি প্রশস্ত সহজসাধ্য ব্যায়াম। সুস্থ ও সবল ব্যক্তির পক্ষে দুইবেলা অন্ততঃ ৩।৪ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে ভ্রমণের উপকারিতা লাভ করা যায় না।

দুর্ব্বল শরীরে কাহার কতটুকু ব্যায়াম করা উচিত, তাহার নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এরূপ অবস্থায় ব্যায়ামের মাত্রা কিঞ্চিদধিক হইলে শরীর আরও দুর্ব্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির বিশেষ ক্লান্তি অনুভব না করা পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিলে কোন অনিষ্ট হয় না।

যাহাদের নিজ নিজ কার্য্যোপলক্ষে অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাদের ব্যায়ামের পরিমাণ তদনুসারে কম হওয়া উচিত। তবে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর মুক্ত স্থানে টেনিস্ ক্রীড়া প্রভৃতি স্বল্প-শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকিলে শরীর ও মন উভয়েরই সচ্ছন্দতা সাধিত হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথা বলিয়া ব্যায়ামের আলোচনার শেষ করিব। আমাদের সমাজে শিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ব্যায়াম-অভ্যাস স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি না। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের রমণীদিগের শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য করিবার আবশ্যকতা

হয়, সুতরাং উহা দ্বারা তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল কার্য্যে সমস্ত অঙ্গের পরিচালনার সুবিধা হয় না এবং অধিকাংশ স্ত্রীলোকের পক্ষেই ঐটুকু পরিশ্রম স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। নিম্নশ্রেণীর রমণীরা পথ-চলা, জল-তোলা, ধান-ভানা, মোট-বহা, নিজেদের কাপড় কাচা, বাট্‌না-বাটা, বাসন-মাজা, গো-সেবা প্রভৃতি নানাবিধ গৃহকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকে এবং সেইজন্য তাহাদের দেহের মধ্যে স্বাস্থ্য, সামর্থ্য ও সৌষ্ঠবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের অবস্থাপন্ন "বড় লোকের" ঘরের মেয়েরা শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য হইতে অনেক সময়ে একেবারেই অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং কোনরূপ অঙ্গচালনার অভাবে তাঁহাদের শরীর অতিশয় স্থূল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পরিশ্রমের অভাবহেতু অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগে তাঁহারা প্রায়ই কষ্ট পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মনও সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল থাকে। ইহা দ্বারা সংসারে যে নানারূপ অসুবিধা ও অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মাতার দেহ দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইলে, তাঁহার সন্তান সন্ততি কখনই সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন মাতাকে দুগ্ধ

দান করিয়া শিশু সন্তান পালন করিতে হয়, তখন তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ রোগহীন ও সবল না হইলে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশু চিরদিনের জন্য রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ সমাজের দুইটী অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ, সমাজ একাঙ্গের উন্নতি দ্বারা, কখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষাপ্রণালী এক ছাঁচে গঠিত হওয়া উচিত নহে, ইহা স্বীকার করিলেও .যরূপ শিক্ষা স্ত্রীলোক ও পুরুষকে “মানুষ” করিয়া তুলিবার উপযোগী, তাহা সমভাবে অনুশীলিত না হইলে সমাজ কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এই জন্য পুরুষের ন্যায় রমণীদিগেরও কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

(৮)

বিশ্রাম ও নিদ্রা

স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য পরিশ্রম করিবার যেরূপ প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পর বিশ্রামেরও সেইরূপ আবশ্যকতা হইয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রমে শরীর যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মানসিক পরিশ্রমেও মস্তিষ্কের উপাদান সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বিশ্রাম কালে শরীরের সর্ব্বাংশের ক্ষয়-পূরণ ও ক্লান্তিদূর হয় এবং মানসিক শক্তিসমূহ পুনরায় সতেজ হইয়া উঠে।

বিশ্রাম দুই প্রকার, আংশিক ও পূর্ণ। কোন একটী কায করিতে করিতে ক্লান্তি বোধ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকারের কার্য্য আরম্ভ করিলে শরীর ও মনের আংশিক বিশ্রাম লাভ হয়। অঙ্ক কসিতে কসিতে বিরক্ত বোধ হইলে যদি ইতিহাস বা সাহিত্য চর্চ্চা করা যায়, তাহা হইলে মস্তিষ্কের আংশিক বিশ্রাম লাভ হইয়া থাকে। সেইরূপ সমস্ত দিনের কায কর্ম্মের পর অপরাহ্নে বাগানে যাইয়া কিছুক্ষণ যদি গাছপালার সেবা করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে পরিশ্রম না বলিয়া এক প্রকার বিশ্রাম বলিতে পারা যায়। এইরূপে অবসর কালে সহজ সাহিত্য বা

কবিতার • চর্চ্চা, সঙ্গীতের আলোচনা, তাস, দাবা, পাশা প্রভৃতি নির্দ্দোষ ক্রীড়ায় যোগ দান, কৌতুকাবহ গল্প গুজব করা প্রভৃতি কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিলে শরীর ও মন উভয়ই আংশিক বিশ্রাম লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইংরাজ-পরিবারের মধ্যে সন্ধ্যার পর ২।৩ ঘণ্টাকাল যে গান, কবিতা পাঠ, খেলা, ভাল বই পড়া প্রভৃতি কার্য্যে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলেই যোগ দিয়া থাকেন, তাহাতে সকলেরই শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম লাভ হইয়া মনের উন্নতি ও স্ফূর্ত্তি সাধিত হয়। আমাদের পরিবারের মধ্যেও সকলে একত্রে মিলিত হইয়া এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদে দিবসের কিছু সময় অতিবাহিত করিলে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালী জাতির জীবনে আমোদ প্রমোদের ব্যাপারটা দিন দিন যেন একেবারে নিবিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর "বারমাসের তের পার্ব্বণ" নানাবিধ প্রতিকূল কারণের সমবায়ে একেবারে লোপপ্রাপ্ত না হউক, লুপ্ত-প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। সেই সকল উৎসবের দিনে সরল প্রাণের হাসিরাশির প্রতিধ্বনি বাঙ্গালীর গৃহে

গৃহে আর ভাসিয়া বেড়ায় না, উৎসব-প্রাঙ্গণে আবালবৃদ্ধ-বনিতার আত্মহারা তন্ময়ত্বের দৃশ্য আর দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। আজকাল যেন কি একটা গুরুতর চিন্তার ছায়া কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সকলেরই হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আগে, পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই, সহরেও পাড়াপ্রতিবেশীরা একত্র হইয়া সন্ধ্যার পর খেলা ধূলা, গীত বাদ্য, হাস্যকৌতুকে ৩।৪ ঘণ্টা যেরূপ সুখে অতিবাহিত করিতেন, আজ কাল তাহা কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীরা এখন যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে; কি যেন একটা অকাল-বৃদ্ধত্বের ভাব আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীতের চর্চ্চা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষের অপর সকল জাতির স্ত্রীপুরুষমাত্রেই গান গাহিতে জানে এবং উৎসব ভিন্ন অন্য সময়েও প্রাণ খুলিয়া গান করিয়া থাকে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, কয়জন বাঙ্গালী পুরুষ গান গাহিতে পারেন অথবা গান শিখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন? আবার আমরা এমন দেশাচারের পক্ষপাতী যে, সঙ্গীত-চর্চ্চা অবশ্য স্ত্রী-শিক্ষণীয় ও শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও স্ত্রীলোকের সঙ্গীতালোচনা আমরা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিয়া

থাকি। বাঙ্গালীর যাত্রা, বাঙ্গালীর হাফ্ আকড়াই, বাঙ্গালীর বারয়ারি, বাঙ্গালীর কীর্ত্তন, বাঙ্গালীর কথকতা, বাঙ্গালীর পর্ব্বোপলক্ষে "মেলা" প্রভৃতি যে কোন জাতীয় আমোদের অবস্থা এখন নিতান্ত শোচনীয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের স্থান "পেশাদারী" থিয়েটারের দল কতক পরিমাণে অধিকার করিয়াছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের থিয়েটার গুলিকে নির্দ্দোষ-আমোদের স্থান বলিতে পারা যায় না। ছাত্রগণের পক্ষে, থিয়েটারে সাধারণতঃ যে ভাবে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা ত একেবারেই দর্শনীয় নহে। কত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষও ঐ গরল পরিপাক করিতে সমর্থ না হইয়া নিজের ও পরিবারের শান্তি, সুখ ও সচ্ছন্দতা যে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নির্দ্দোষ আমোদের অভাবে নৈরাশ্য ও নিরানন্দের একটা করুণ আর্ত্তনাদ যেন এই বাঙ্গালী জাতির অন্তঃস্থল হইতে নিয়ত উত্থিত হইতেছে। ইহা শুভলক্ষণ নহে। যে জাতি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে বা আমোদ করিতে পারে না, সে জাতির জীবনীশক্তি ও উন্নতির সীমা ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে, বুঝিতে হইবে। অতএব এখনও সময় থাকিতে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। যে আমোদ প্রমোদের কোলাহলে আমাদের

জাতীয় জীবন কিছুদিন পূর্ব্বে মুখরিত হইত, আমরা আবার তাহাকে পুনঃপ্রবুদ্ধ করিয়া, মলিনত্ব পরিহার পূর্ব্বক, উহার অনাবিল স্রোতে অবগাহনপূর্ব্বক আমাদের ক্লান্ত দেহ ও অবসাদগ্রস্ত মনকে নূতন উৎসাহে ও নব আশায় অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা নব-জীবন লাভ করিতে নিশ্চয় সফলকাম হইব।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শারীরিক পরিশ্রমের পর বিশ্রামের যেরূপ প্রয়োজন হয়, সেইরূপ মানসিক পরিশ্রমের পর আমাদিগের মস্তিষ্ক বিশ্রাম লাভ করিবার সুবিধা না পাইলে, শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যে কোন মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলেই মস্তিষ্কের অল্পবিস্তর উত্তেজনার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেহের যন্ত্রগুলি জীবনীশক্তির উদ্দীপনায় স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। শরীরের সর্ব্বাংশে এই শক্তির সমতা সংরক্ষিত হইলেই দেহ-যন্ত্রসমূহের কার্য্যকুশলতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ইহারই ফলে আমরা পূর্ণ স্বাস্থ্য ভোগ করিয়া থাকি; ইহার অসমান প্রয়োগ দ্বারা দেহ রোগ-প্রবণ হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মদাতা গেলেন্ (Galen) এইজন্য বলিয়া গিয়াছেন যে শারীরিক সমতাই স্বাস্থ্য, উহার বৈষম্য ঘটিলেই রোগ উৎপন্ন হয়,—(Health is symmetry,

disease is deformity)। যদি মস্তিষ্কের কার্য্যের জন্য এই জীবনীশক্তি অত্যধিক পরিমাণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রাদির কার্য্য যে সমুচিত উত্তেজনার অভাবে শ্লথ হইয়া অসম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এদেশের ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে এই শক্তির অপব্যবহার ও উহার বিষময় ফল প্রবল-ভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। আমাদিগের ছাত্রদিগের মধ্যে যে শারীরিক বিকাশ ও সামর্থ্যের অভাব লক্ষিত হয়, মস্তিষ্কের অনিয়ন্ত্রিত পরিচালনাই তাহার একটী অন্যতম কারণ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি লাভের আশায় তাহারা যেরূপ হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহাতে তাহারা বিবিধ উপাধিভূষণে ভূষিত হইতে সমর্থ হইলেও উক্ত চেষ্টায় তাহাদের শরীর যে জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রতিদিন আমাদের নয়ন-পথে পতিত হয়। অবশ্য অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের ফলে অনেকস্থলে যশ, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা লাভ হয় বটে, কিন্তু যদি আমরা স্থির-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখি যে, প্রকৃতিদত্ত কি অমূল্য সম্পত্তি নষ্ট করিয়া আমরা এই সকল সম্পদের অধিকারী হইতে সমর্থ হই, তাহা হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই কখনই এরূপ বিনিময়ের পক্ষপাতী হইবেন না। ছাত্রাবস্থায় অপরিমিত

মানসিক পরিশ্রমের ফলে অনেকের জীবনের সুখস্বপ্ন আরম্ভেই লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়; তাহারা দুর্ব্বল দেহ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কোনমতে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিন অতিবাহিত করিতে থাকে। মস্তিষ্কের নিয়মিত পরিচালনা দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, অযথা পরিচালনা দ্বারা ইহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধিক মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য করিলে, পরিপাক-যন্ত্র সর্ব্বপ্রথমে হীনতেজ হইয়া পড়ে, ক্ষুধা ও খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি উভয়ই কমিয়া যায়, ক্রমে অজীর্ণ ও তজ্জনিত বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া জীবনকে যন্ত্রণাময় করিয়া তোলে। প্রেসিডেণ্ট্ হেনল্ট্ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ভল্টেয়ার্ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এ সকল সম্পদ্ তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ তিনি খাদ্য পরিপাক করিতে পারেন না (It matters nothing, he *can't digest*)". একজন বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের খাদ্যসংগ্রহের অভাব হয় না বটে, কিন্তু খাদ্য-পরিপাকের যথেষ্ট ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। পুনশ্চ পরিপাকের ব্যাঘাত হইলেই অল্প দিনের মধ্যে

মস্তিষ্ক দুর্ব্বল এবং প্রকৃতি এরূপ কর্কশ হইয়া উঠে যে, ঐ ব্যক্তির সামাজিক গুণাবলী একে একে লোপ প্রাপ্ত হয়; তখন অনেক সময়ে তাহার সহবাস অন্যের পক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। যদি মানসিক পরিশ্রমের সহিত রীতিমত আহার ও নিদ্রার সুব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে মস্তিষ্কের পরিচালনা কিঞ্চিদধিক পরিমাণে সংসাধিত হইলেও বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে না। আমাদিগের ছাত্রমণ্ডলীর প্রচুর পরিমাণে আহার লাভ অনেক সময়েই ঘটিয়া উঠে না এবং নিদ্রার পরিমাণ যতটুকু সংক্ষিপ্ত করিলে চলিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা তাহারা নিজে নিজে স্থির করিয়া লয়। এই সকল কারণে তাহাদের দেহ যে অপরিণত ও দুর্ব্বল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহার উপর বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগকে এত অধিক বিষয় পাঠ করিতে হয় এবং এত অধিক সময় "হাতে কলমে" শিক্ষা করিবার জন্য পরীক্ষাগারে (Laboratory) অতিবাহিত করিতে হয় যে, তাহারা পড়া ছাড়া শরীরচালনা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্যপালনীয় অন্যান্য কার্য্য করিতে মোটেই অবসর প্রাপ্ত হয় না। আজ কাল অনেক কলেজে ছাত্রগণকে বেলা ১০½টা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা ৬।৭টা পর্য্যন্ত

অবিশ্রাম কার্য্য করিতে দেখা যায়; মধ্যে কিছু জলখাবার খাইবার জন্য অবকাশের বন্দোবস্ত অনেক কলেজেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইস্কুলে যেমন প্রতি ঘণ্টার শেষে ১০ মিনিট অথবা মধ্যে আধ ঘণ্টা টিফিনের ছুটী দেওয়া হয়, কলেজে সেরূপ কোন ব্যবস্থা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক কলেজে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগের টিফিনের অবকাশ দেওয়া উচিত এবং তাহাদের বিশ্রাম করিবার ও জলখাবার খাইবার জন্য একটী প্রশস্ত গৃহ পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। ৫ টার পর যাহাতে কোন কলেজে কোনরূপ শিক্ষা না দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে অধ্যক্ষমহোদয়দিগের বিধিব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। কলিকাতা ক্যাম্পবেল মেডিকেল্ ইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মেজর্ রেট্ সাহেবের সুব্যবস্থা এ স্থলে উল্লেখ করিবার যোগ্য। পূর্ব্বে এই ইস্কুলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হইত, ইহাতে ছাত্রগণ অপরাহ্নে খেলাধূলা কিছুই করিবার অবকাশ পাইত না। মেজর্ রেট একদিন সমস্ত অধ্যাপকদিগকে একত্র ডাকাইয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে ৫টার পর ক্লাসে বদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন না; ঐ সময়ে তিনি তাহাদিগকে

মুক্ত স্থানে বায়ুসেবন ও ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিলে বিশেষ সুখী হইবেন। সেই অবধি ক্যাম্পবেল্ ইস্কুলে অপরাহ্ণে কোন লেক্‌চার্ হয় না, ছাত্রেরা পরম আনন্দে ঐ সময়ে ক্রীড়া বা ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকিয়া শারীরিক উন্নতি ও মানসিক বিশ্রাম লাভ করে। মেজর্ রেটের সদ্দৃষ্টান্ত প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষের অনুসরণ করা উচিত। এ বিষয়ে আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ প্রদর্শক হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা শুনিতে পাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত কোন কলেজে ছাত্রগণ রাত্রি ৭।৭½টা পর্য্যন্ত লেক্‌চার শুনিবার জন্য গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকে। আমাদের বিশ্বাস যে, এরূপ অবস্থায় ছাত্রদিগের শরীর নষ্ট ও স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। আমরা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুযোগ্য পরিচালকদিগের নিকট এ বিষয়ের সুব্যবস্থা প্রার্থনা করিতেছি।

আমাদের অধিকাংশ সভাসমিতি ছাত্রমণ্ডলী লইয়া গঠিত, তাহারা উপস্থিত না থাকিলে অনেক সময়ে সভার কার্য্যই হয় না। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যে সময়ে ছাত্রেরা মুক্ত স্থানে থাকিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন বা ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে, আমরা সেই অপরাহ্ণকালেই যাবতীয় সভা আহ্বান করিয়া ছাত্রদিগকে জনাকীর্ণ গৃহ মধ্যে আবদ্ধ

রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকি। ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ বা অপর যে কোন স্থানে সভাসমিতি আহুত হউক না কেন, সভার অধ্যক্ষদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ৬টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে গৃহ মধ্যে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা না করেন। ৪টার সময় অথবা ৬টার পর সভা করিলে, ছাত্রদিগের বিশ্রাম ও ব্যায়ামের সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না। হয় ত এইরূপ ব্যবস্থায় দুই দশ জন লোকের সভায় উপস্থিত হইবার ব্যাঘাত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সুবিধার জন্য ছাত্রমণ্ডলীর অনিষ্ট সাধন করা, বোধ হয়, কোন বিবেচক ব্যক্তিই অনুমোদন করিবেন না।

ছাত্রদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দেশের মুখোজ্জ্বলকারী প্রাপ্তবয়স্ক সুধী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। তাঁহারা শরীরকে অবহেলা করিয়া মস্তিষ্কের অনিয়মিত পরিচালনা করেন বলিয়া তাঁহাদের শরীর শীঘ্র ভগ্ন হইয়া যায় এবং অজীর্ণ, গ্রন্থিবাত, (Gout), বহুমূত্র (Diabetes) প্রভৃতি নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবন অতিক্রম করিতে না করিতেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন এবং আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশবাসিগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে ইহলীলা সংবরণ করেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, গোখ্‌লে প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিবৃন্দের জীবনের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। ইঁহাদের মত মনস্বী ব্যক্তিগণ যদি মানসিক পরিশ্রম, কায়িক পরিশ্রম ও বিশ্রামের সমতা রক্ষা করিতে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তদ্দ্বারা দেশের ও দশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়।

নিদ্রাই শরীর ও মনকে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করে। চরক বলিয়া গিয়াছেন যে, দেহ সম্বন্ধে আহার যেরূপ প্রয়োজনীয়, নিদ্রাও তদ্রূপ। তিনি এইরূপে নিদ্রার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন—

"নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টি কার্শ্য বলাবলং।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ॥
অকালেঽতি প্রসঙ্গাচ্চ ন চ নিদ্রা নিষেবিতা।
সুখায়ুষী পরা কুর্য্যাৎ কালোষেবাগতা নরং॥

সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কৃষতা, বলাবল, বৃষতা, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন, মরণ সকলই নিদ্রার আয়ত্ত। অকালে নিদ্রা যাওয়া, অতিশয় নিদ্রা যাওয়া, বা একেবারে নিদ্রা না যাওয়ায় মনুষ্যের সুখ ও পরমায়ু নষ্ট হয়।"

চরকসংহিতা।

রাত্রিকালই নিদ্রার প্রশস্ত সময়। দিবানিদ্রা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। ইহা দ্বারা পরিপাকের বিলম্ব হয়, ক্ষুধা থাকে না এবং রাত্রিকালে সুনিদ্রালাভের ব্যাঘাত হয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় শত পুত্রের অকাল মৃত্যুর হেতু জিজ্ঞাসা করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রেরা ত কখনও দিবানিদ্রা গমন করে নাই। চরক ঋষি শারীরিক অবস্থা ও ঋতু-বিশেষে দিবানিদ্রার পরিচর্য্যা করা যাইতে পারে, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। ভারবহন, পথপর্য্যটন বা কার্য্যশ্রমে যাহারা ক্লিষ্ট, যাহারা অজীর্ণ, শ্বাস, হিক্কা বা ক্ষতাদি রোগে পীড়িত, তাহাদের এবং বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আঘাতপ্রাপ্ত, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত, ভয় ক্রোধ বা শোকপ্রাপ্ত, অথবা উন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা আচরণীয়। চরক গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দিবানিদ্রা গমন করিলে শ্লেষ্মা ও পিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যাহারা স্থূলকায়, যাহারা ঘৃত দুগ্ধাদি স্নেহদ্রব্য প্রত্যহ সেবন করিয়া থাকে, যাহাদের শরীরে শ্লেষ্মার প্রকোপ অধিক, তাহাদের দিবানিদ্রা সেবন করা কদাচ উচিত নহে।

অনুচিত দিবানিদ্রা সেবনে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণনা করিয়া চরক বলিয়া গিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিদ্রা সম্বন্ধে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া নিদ্রা সেবন করিবেন।

শিশুদিগের ১২ঘণ্টার অধিককাল, বালকবালিকাদিগের ৯ ঘণ্টা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ৬।৭ ঘণ্টাকাল নিদ্রা যাওয়া বিধেয়।

রাত্রিকালে স্বল্পাহারই সুনিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত; গুরু ভোজনে নিদ্রায় ব্যাঘাত, স্বপ্ন ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।

যুবকদিগের পক্ষে সাতিশয় কোমল শয্যায় শয়ন করা প্রশস্ত নহে। পরিষ্কৃত শয্যা সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যহ শয্যা রৌদ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ৪।৫ দিন অন্তর বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড় সাবানজলে কাচিয়া দেওয়া বা পরিবর্ত্তন করা উচিত। মশারি প্রতি মাসে ধোবার বাড়ী পাঠান কর্ত্তব্য; মধ্যে প্রতি সপ্তাহে একবার রৌদ্রে দেওয়া উচিত।

শয়ন-গৃহে অধিক গৃহসজ্জা রাখা উচিত নহে, কারণ গৃহসজ্জা যত অধিক হইবে, গৃহমধ্যে বায়ু-স্থান ততই কমিয়া যাইবে। শয়ন-গৃহের দরজা জানালা সর্ব্বদা

মুক্ত রাখা কর্ত্তব্য, এমন কি শীতকালেও গৃহের ২।১টী বায়ু-পথ রাত্রিকালে খুলিয়া রাখা উচিত। শয়ন-গৃহের রুদ্ধাবস্থাই অনেক স্থলে অসুস্থতা ও অনিদ্রার প্রধান কারণ। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ঘরের আলোক নিবাইয়া দিলে ভাল হয়, কেননা ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্‌ ভিন্ন অন্য আলো জ্বলিলে তদুৎপন্ন দূষিত পদার্থ বায়ুমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। যদি আলোক রাখিবার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বেড্‌ রুম্‌ ল্যাম্প্‌ (Bed-room lamp) নামক অতি ক্ষুদ্র আলোক ব্যবহার করা উচিত।

মেঝেতে শয্যা বিস্তার না করিয়া খাট, তক্তাপোষ বা খাটিয়া ব্যবহার করা উচিত। মেঝে ভিজা থাকিলে বিছানা আর্দ্র হয়, তাহাতে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা। মেঝে যদি পাকা না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে দূষিত বাষ্প উত্থিত হয় এবং উহা নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইয়া শ্লেষ্মাব বৃদ্ধি ও কাস উৎপাদন করে। পল্লীগ্রামে তক্তাপোষ বা খাটে শুইলে অনেক সময়ে সাপ, বিছা, ইঁদুর, কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মশারি না খাটাইয়া (বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে) কখনই শয়ন করিবে না। সকলেই জানেন যে, একজাতীয় মশকের

দংশন দ্বারা ম্যালেরিয়া ও অপর কয়েকটী কঠিন ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। মশারি ব্যবহার করিলে এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করা যায়। মশারি খাটাইলে সাপ, বিছা, ইঁদুর প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তুর আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

সুনিদ্রা না হইলে শরীর ও মন যেরূপ অসুস্থ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। ২।৩ দিন উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগরণ করিলে চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়, বোধ হয় যেন ঐ ব্যক্তি ৬ মাস রোগ ভোগ করিয়াছে। এক রাত্রির সুনিদ্রাতেই তাহার মুখে স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃ পুনরায় প্রকাশ পায়। যাঁহারা থিয়েটার দর্শন প্রভৃতি বৃথা আমোদে সর্ব্বদা অধিক রাত্রিজাগরণ করেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য শীঘ্র ভগ্ন হইয়া যায়। আজ কাল দেশীয় থিয়েটার গুলিতে প্রায় সমস্ত রাত্রি ব্যাপী অভিনয় হইতে দেখা যায়। অভিনয় প্রদর্শনের সময়ের সীমা আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইলেও আইন লঙ্ঘন করিলে সামান্য অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হয় বলিয়া এই নিয়মের সুফল ফলিতেছে না। আমরা আশা করি, গভর্ণমেণ্ট্ যাহাতে এই নিয়ম যথারীতি প্রতিপালিত হয়, তাহার সুব্যবস্থা শীঘ্র করিবেন।

যাহা কিছু দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার বিষয় আছে, শয়নের পূর্ব্বে সে সকল দূরে রাখিয়া মন স্থির করিয়া শয্যায় গমন করিবে। শয়নের পূর্ব্বে কিছুকাল ধর্ম্মগ্রন্থ বা কোন সৎগ্রন্থের আলোচনা করিয়া শয়ন করিতে যাইলে মন অনেক পরিমাণে নিরুদ্বিগ্ন হয় এবং ভগবান্‌কে "স্মরণ ও মনন" করিয়া নিদ্রা গমন করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। ইহা মহাপুরুষের বাক্য—কথনই ব্যর্থ হইবার নহে।

পরিচ্ছদ।

পরিচ্ছদের প্রধান উদ্দেশ্য দেহকে শীতাতপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করা, শারীরিক সহজ উত্তাপের সমতা রক্ষণ এবং লজ্জা নিবারণ। এতদ্ব্যতীত পরিচ্ছদ দ্বারা শরীরের শোভা বর্দ্ধিত হয় এবং স্থলবিশেষে আকস্মিক আঘাত নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে শরীরের শোভাবর্দ্ধন পরিচ্ছদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—উহা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। এই শেষোক্ত কথাটী স্মরণ রাখিলে আমরা অনেক অসুবিধা ও অর্থনাশের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি।

সচরাচর আমরা তুলা, পাট, শণ, পশম ও রেশম নির্ম্মিত বস্ত্রাদি পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। তুলা, পাট বা শণের আঁশ নির্ম্মিত বস্ত্রকে আমরা 'শীতল' (সূতার) কাপড় এবং পশম নির্ম্মিত বস্ত্রকে 'গরম' কাপড় বলিয়া থাকি। রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র পশমী কাপড়ের ন্যায় তত গরম নহে, সুতার কাপড়ের ন্যায় শীতলও নহে।

যাহা হউক, কোন কাপড়ই আপনা হইতে শীতল

বা গরম নহে। যে বস্ত্র শরীর হইতে তাপ পরিচালন করে না, তাহাকে আমরা ‘গরম’ কাপড় বলিয়া থাকি এবং যে সকল বস্ত্র আমাদিগের শরীর হইতে অল্পবিস্তর উত্তাপ বাহিরের দিকে পরিচালন করিয়া দেয়, তাহাদিগকে “শীতল” কাপড় কহি। সূতার কাপড়ে হাত দিলেই উহা ঠাণ্ডা বোধ হয়, কিন্তু পশমী কাপড় স্পর্শ করিলে হাতে ঠাণ্ডা লাগে না। ইহার কারণ এই যে, সূতার কাপড় তাপ-পরিচালক বলিয়া উহাতে হাত দিলেই উহা দ্বারা হাত হইতে শারীরিক তাপ তৎক্ষণাৎ পরিচালিত হইয়া যায়, এইজন্য উক্ত বস্ত্রখণ্ড শীতল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পশমী কাপড় তাপ-অপরিচালক বলিয়া উহাতে হাত দিলে হাতের তাপ পরিচালিত না হইয়া হাতেই থাকিয়া যায়, সুতরাং পশমী বস্ত্র স্পর্শে গরম বলিয়া অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে সূতার কাপড় ব্যবহার করিলে শরীর শীতল থাকে কিন্তু শীতকালে এরূপ বস্ত্র দ্বারা শীত নিবারিত হয় না এবং শরীরে ঠাণ্ডা লাগিবারও সম্ভাবনা। লংক্লথ্, নয়নসুখ, মলমল্, কটন্ ড্রিল্, জিন্, লিনেন্ প্রভৃতি বস্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। শরীর শীতল রাখে বলিয়াই এই সকল বস্ত্র সকলেই গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করিয়া থাকে।

লংক্লথ্ প্রভৃতি সূতানির্ম্মিত বস্ত্রের দোষ এই যে, উহা

ভালরূপে ঘর্ম্মশোষণ করিতে সমর্থ হয় না। গ্রীষ্মকালে যখন এই সকল বস্ত্র ঘামে ভিজিয়া যায়, তখন ঘাম শুকাইবার সময় দেহ হইতে তাপ অপহৃত হইয়া সমধিক শৈত্য উৎপাদন করে, সুতরাং ভিজা জামা অধিকক্ষণ গায়ে লাগিয়া থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা। পশমী বস্ত্র উৎকৃষ্ট ঘর্ম্মশোষক বলিয়া উহা গায়ের উপরে থাকিলে ঘাম শুকাইবার সময় ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না; এইজন্য গায়ের উপরেই (next to skin) পাৎলা ফ্লানেলের জামা পরিধান করাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এদেশে যেরূপ প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, তাহাতে গ্রীষ্মকালে এরূপ বস্ত্রের ব্যবহার আরামদায়ক নহে এবং অনেকস্থলেই ইহার প্রয়োজন হয় না। সূতানির্ম্মিত বস্ত্র অপেক্ষা রেশমীবস্ত্র ঘর্ম্ম অধিক পরিমাণে শোষণ করিতে সমর্থ, এবং ইহা সূতার বস্ত্রের ন্যায় তাপ-পরিচালক নহে। পুনশ্চ রেশমী জামা ঠিক গায়ের উপর পরিলে উহা মসৃণ ও কোমল বলিয়া সবিশেষ আরামদায়ক হয়। কিন্তু রেশমী জামা ব্যবহার করা অনেকেরই সাধ্যাতীত। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন, গ্রীষ্মকালে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে রেশমী গেঞ্জি ব্যবহার করিতে পারেন; ইহা দ্বারা ঘাম শুকাইবার সময় শরীরে ঠাণ্ডাও লাগিবে না অথচ উহার পরিধান অতিশ

আরামদায়ক। চেলি, তসর, গরদ, সাটিন প্রভৃতি বস্ত্র রেশম-নির্ম্মিত। বাফ্‌তা রেশম ও সূতা উভয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

সাধারণ লোকের পক্ষে আল্‌গা-বুনন তুলার বস্ত্র ঠিক গায়ের উপর গ্রীষ্মকালের জন্য ব্যবহারের উপযোগী। লংক্লথ্, কটন্ ড্রিল্ প্রভৃতির ন্যায় ঘন-বুনন তুলার বস্ত্র ঠিক গায়ের উপর না পরিয়া আল্‌গা-বুনন সূতার গেঞ্জি পরিধান করিয়া তাহার উপর ঐ সকল বস্ত্রের জামা ব্যবহার করা উচিত। আল্‌গা-বুনন সূতার গেঞ্জি দ্বারা ঘর্ম্ম শোষিত হয়, সুতরাং উপরকার জামা ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। আজকাল প্রায় সকলেই ভিতরে সূতার গেঞ্জি ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহা দ্বারা উপরকার জামা কম ময়লা হয় এবং ঘাম শুকাইবার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে গেঞ্জিটী যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ময়লা জামা গায়ের উপর পরিধান করিলে চর্ম্মের স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়া বিবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

সূতার কাপড় যত আল্‌গা-বুনন হইবে, উহা ততই অধিক ঘর্ম্ম শোষণ করিতে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত

আল্‌গা-বুননের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকে বলিয়া এরূপ বস্ত্র দ্বারা ঘন-বুনন সূতার কাপড় অপেক্ষা শীত অধিক পরিমাণে নিবারিত হয়। বায়ু একটি তাপ-অপরিচালক পদার্থ;. আল্‌গা বুনন বস্ত্রের ছিদ্র মধ্যে যে বায়ু আবদ্ধ থাকে, তাহা শরীরের সহজতাপ বাহিরে নিষ্ক্রমণ হইতে দেয় না, . সুতরাং শীতকালে আল্‌গা-বুনন সূতার বস্ত্র কতক পরিমাণে শীত নিবারণ করে। পশম তাপ-অপরি-চালক বলিয়া উহা দ্বারা শীত নিবারিত হয়; এতদ্ব্যতীত পশমনির্ম্মিত বস্ত্রমাত্রেই আল্‌গা-বুনন হইয়া থাকে, সুতরাং তন্মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ুও শীত নিবারণের সহায়তা করিয়া থাকে। এই কারণে শীতকালে একটী মোটা জিনের জামার স্থানে ২।৩টী পাতলা লংক্লথের জামা পরিলে শীত অধিক পরিমাণে নিবারিত হয়, কারণ ২।৩টী জামার মধ্যবর্ত্তী স্থানে যথেষ্ট পরিমাণ তাপ-অপরিচালক বায়ু আবদ্ধ থাকে। তুলার জামা, বালাপোষ বা তোষকের তুলার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু আবদ্ধ থাকে বলিয়া .এরূপ বস্ত্র গরম কাপড়ের ন্যায় শীত নিবারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

মেরিনো, আল্‌পাকা, সার্জ্জ্, বনাত, ফ্লানেল্, সাল, মলিদা, আলোয়ান, লুই, ধোসা প্রভৃতি নানাবিধ

পশুলোমজাত বস্ত্র আমরা শীত নিবারণের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পশমনির্ম্মিত বস্ত্র মাত্রেই তাপ-অপরিচালক ; আমাদের শারীরিক উত্তাপ এই সকল বস্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া যায় না বলিয়া আমাদের শরীর সর্ব্বদা গরম থাকে, সুতরাং শীত নিবারণের জন্য আমরা এই শ্রেণীর বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ফ্লানেল্ প্রভৃতি পশমীবস্ত্র অধিক পরিমাণ ঘর্ম্ম শোষণ করিতে সমর্থ, সুতরাং ইহা ঠিক গায়ের উপর পরিলে ঘাম শুকাইবার সময়ে শরীরে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। ব্যায়াম বা ক্রীড়ার সময় অত্যন্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া থাকে ; এরূপ স্থলে ফ্লানেলের জামা ঠিক গায়ের উপর ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। ফ্লানেল্ শীতকালে দেহকে যেমন গরম রাখে, গ্রীষ্মকালে তেমনই ফ্লানেলের ব্যবহারে শরীর শীতল থাকে। তবে অনভ্যাস-বশতঃ অনেকেরই পক্ষে গ্রীষ্মকালে ফ্লানেলের ব্যবহার সুখকর হয় না। ফ্লানেলের জামা ঠিক গায়ের উপর পরিলে অনেকের গা জ্বালা করে ও চুল্‌কায় এবং অনেক সময়ে গায়ে চুলকোনার ন্যায় ব্রণ বাহির হয়। ফ্লানেলের পরিবর্ত্তে ঠিক গায়ের উপর রেশমের বা আল্‌গা-বুনন সূতার বস্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফ্লানেলের মধ্যে

'লানোলিন্' (Lanoline) নামক বসাজাতীয় একপ্রকার পদার্থ অবস্থিতি করে; ইহা থাকে বলিয়াই ফ্লানেল্ এরূপ উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন। কিন্তু কাচিবার দোষে এই পদার্থ ফ্লানেল্-হইতে নির্গত হইয়া যায়; তখন ফ্লানেল্ এক প্রকার অকেযো হইয়া পড়ে। ধোবারা যেরূপ ভাবে কাপড় কাচে, তাহাতে ফ্লানেল্ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ফ্লানেল্ ফুটন্ত জলে কাচা উচিত নহে। ফ্লানেল্ কাচিবার জন্য ঈষদুষ্ণ জল ও উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করাই উচিত। ভাঁটিতে ফ্লানেল্ বস্ত্র ফুটাইলে উহার মধ্যস্থিত সমস্ত লানোলিন্ বহির্গত হইয়া উহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

আজকাল 'ফ্লানেলেট্' (Flanellete) নামক এক প্রকার বস্ত্র বালক-বালিকাদিগের পোষাকের নিমিত্ত বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বেশ নরম হইলেও ইহার মধ্যে পশম নাই, কেবল সূতা। ইহার দোষ এই যে অগ্নি-সংযুক্ত হইলে ইহা অতি শীঘ্র জ্বলিয়া যায়; সেই জন্য ইহা বালক-বালিকাদিগের পোষাকের জন্য ব্যবহৃত হওয়া নিরাপদ্ নহে।

পশমী বস্ত্র মাত্রেরই দোষ এই যে কাচিলে উহা সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং উহাদিগের কোমলত্ব নষ্ট হয়। পুনশ্চ

পশমনির্ম্মিত বস্ত্র সূতানির্ম্মিত বস্ত্রের ন্যায় দৃঢ় ও টেঁকসই হয় না। অনেক সময়ে পশমের সহিত অল্প পরিমাণ সূতা মিশ্রিত করিয়া গরম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। শীত-নিবারণের জন্য সাধারণের পক্ষে এরূপ বস্ত্রের ব্যবহার সবিশেষ উপযোগী। এরূপ বস্ত্র সহজে ছিঁড়ে না, কাচিলে বেশী ছোট হইয়া যায় না এবং আমাদের এদেশে যেরূপ শীত হয়, তাহা এরূপ বস্ত্র দ্বারা সহজেই নিবারিত হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে শ্বেতবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করা প্রশস্ত। সাদা রংএর কাপড় সূর্য্য বা অগ্নির উত্তাপ সামান্য পরিমাণে শোষণ করে মাত্র, অধিকাংশ উত্তাপ প্রতিফলিত হইয়া কাপড় হইতে নির্গত হইয়া যায়, এইজন্য সাদা রংএর কাপড় বেশী গরম হয় না। কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র মাত্রেই সূর্য্যতাপ বা অগ্নিতাপ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শোষণ করিতে সমর্থ, সুতরাং এই রংএর বস্ত্র শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইজন্য গ্রীষ্মকালে উহার ব্যবহার সুখকর হয় না। শীতকালে কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ আরামদায়ক হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রংএর কাপড় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় তাপ শোষণ করিয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাপ শোষণ করিতে সমর্থ। গাঢ় নীলবর্ণ বস্ত্র তাপ-শোষণ সম্বন্ধে দ্বিতীয়, তৎপরে ফিকা নীল, তদপেক্ষা কম গাঢ় সবুজ, তৎপরে

লাল, তাহার নীচে ফিকে সবুজ, তৎপরে গাঢ় পীত, অনন্তর ফিকা হরিদ্রা এবং সর্ব্বশেষে শাদা রংএর কাপড় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প তাপ শোষণ করিয়া থাকে। এইজন্য গ্রীষ্মকালে শাদা কাপড় ব্যবহার করিলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে এবং এই-জন্যই ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শাদা কাপড়ের ব্যবহার অধিক প্রচলিত। কাহারও মতে রাঙ্গা রংয়ের কাপড় ঠিক গায়ের উপরে থাকিলে সূর্য্যের রশ্মি-বিশেষ (Chemical rays) হইতে দেহকে রক্ষা করিয়া "সর্দ্দি-গর্ম্মি" নিবারণ করে। এই মত কতদূর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই; তবে এই মত অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ গ্রীষ্মকালে এদেশে "সোলারো" (Solaro) নামক লাল কাপড়ের জামা ঠিক গায়ের উপর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কোনপ্রকার রঙিন্ বস্ত্র ঠিক গায়ের উপর ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। সচরাচর যে সকল রংয়ে বস্ত্র রঞ্জিত করা হয়, তাহাদিগের অধিকাংশের সহিত খনিজ বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। অনেকস্থলে এরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া চর্ম্মের প্রদাহ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা বালকবালিকাদিগের পরিচ্ছদ প্রায়ই রঙ্গিন্ কাপড়ে প্রস্তুত করাইয়া থাকি। বাহিরের কাপড়

রঙ্গিন্ হইলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু যে কাপড় ঠিক গায়ের উপর থাকিবে, তাহা রঙ্গিন্ হইলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

যে পোষাক গায়ে আঁটিয়া ধরে, তাহা কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কাহারও পরিচ্ছদ গায়ে আঁটিয়া থাকা স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল নহে। পরিচ্ছদ যত আল্গা ও হাল্কা হইবে, রক্তসঞ্চালন এবং শারীরিক অন্যান্য ক্রিয়া ততই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকিবে। ভারতবাসী কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেই ঢিলা পোষাক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে শরীর আরামে থাকে, শরীরের কোন স্থানে অযথা চাপ পড়িয়া কোন শারীরিক যন্ত্র স্থানচ্যুত হয় না এবং রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-ক্রিয়া, অঙ্গচালনা প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মেমেরা যেরূপ পোষাক পরিয়া থাকেন, তাহা স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল নহে। বেশী আঁট স্কার্ট্ (Close-fitting skirts), গায়ে লেপা আস্তিন (Tight sleeves), ষ্টেস্ (Stays), গার্টার্ (Garter), কোমরবন্ধ ও গলাবন্ধ (Waist-bands and neck-bands), আঁট দস্তানা (Gloves) ও কসা সরু জুতার ব্যবহার মেমেদের মধ্যে বিস্তৃত-ভাবে প্রচলিত দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহাদিগের ব্যবহারে শরীর বিকৃত এবং দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদিগের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত সাধিত হয়। কটিদেশ অপ্রশস্ত এবং দেহের উপরিভাগ উন্নত রাখিবার চেষ্টায় যে সকল পোষাকের তোড়তোড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ ও প্লীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য তাহাদিগের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়। ইয়োরোপীয়গণ এরূপ বুদ্ধিমান হইয়া কিরূপে এই অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যনাশক প্রথার সমর্থন করেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। অবশ্য ইঁহারা সকলেই এই কুপ্রথার পক্ষপাতী নহেন। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং চিকিৎসকেরা এবিষয়ের প্রতিবাদ করিলেও এপ্রথার সংস্কার এখনও বহু সময়সাপেক্ষ। আশা করি আমাদের দেশের যে সকল মহিলা পোষাকের বিলাতী "তোড়জোড়ের" পক্ষপাতিনী, এই কথাগুলি তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইবে।

ভারতবর্ষের জলবায়ু এবং ভারতবাসীদিগের সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, এদেশীয় রমণী-দিগের মধ্যে যে সাড়ী পরিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী, সে বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র

সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে আমাদিগের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা যে ভাবে সাড়ী পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা প্রশংসনীয় নহে। ইহা, কি লজ্জারক্ষা, কি স্বাস্থ্যরক্ষা, কোনটীরই পক্ষে অনুকূল নহে। এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসিনী রমণীদিগের নিকট হইতে আমাদিগের শিক্ষালাভ করিবার যথেষ্ট অবসর আছে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা* যেভাবে সাড়ী পরিয়া থাকেন, তাহাতে নিতান্ত সাবধানে না থাকিলে উহা দ্বারা তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সম্পূর্ণভাবে আবৃত থাকা কঠিন হইয়া উঠে। কায কর্ম্ম করিবার সময়ে পরিধেয় বসন শরীরের অনেক অংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তবে সর্ব্বদা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহারা ইহার অনৌচিত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কিন্তু তীর্থদর্শন, গঙ্গাস্নান, রেল্‌পথে ভ্রমণ বা অপর কার্য্যোপলক্ষে যদি তাঁহাদিগের রাস্তাঘাটে চলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দুষ্ট লোকের কুটিল দৃষ্টি হইতে সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য

* বাঙ্গালী ব্রাহ্ম মহিলাদিগের সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নহে। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্ববাঙ্গালার স্ত্রীলোকদিগের সাড়ী পরিবার প্রথা পশ্চিম বাঙ্গালা অপেক্ষা ভাল।

পরিধেয় বসন লইয়া তাঁহারা কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ ছোট ছেলে কোলে থাকিলে তাঁহারা অনেক সময়ে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। আমাদিগের জননী, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যাগণের যখন দেবস্থান, রেল্‌পথ, পশু-শালা, যাদুঘর প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবার আবশ্যক হইবে, তখন যাহাতে তাঁহাদের লজ্জাশীলতা যথাবিধি রক্ষিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত্‌ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা অতি সুন্দরভাবে আঁটিয়া সাঁটিয়া সাড়ী পরিয়া লজ্জা রক্ষা করিয়া থাকেন। কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালী ভিন্ন অপর সকল ভারতবাসী যতই হীনাবস্থাপন্ন হউক না, নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোক-দিগের লজ্জা রক্ষার জন্য এক একটী জামার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সামান্য কুলী রমণীরা (এমন কি যাহারা ছাদ পিটিতে আসে, তাহারা পর্য্যন্ত) শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র ও মলিন একটী "আংরাখা" দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রমণীজাতির সম্ভ্রম রক্ষা

করিয়া থাকে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম দেশবাসিনী রমণীরা সাড়ী পরিয়া থাকেন, আর আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েরাও সাড়ী পড়েন, কিন্তু সাড়ী পরিবার প্রভেদে একজন কাপড় পরিয়াও অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় রহেন, আর অপর রমণী কার্য্যোপলক্ষে রাজপথে বাহির হইয়াও লোকের অসংযত দৃষ্টি হইতে আপনাকে সুচারুরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আমাদিগের বাঙ্গালী রমণীগণের পরিচ্ছদ-পরিধান-প্রথার সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে।

এস্থলে বলা উচিত যে, অধিকাংশ বাঙ্গালীই সামান্য অবস্থার লোক। যদি আমাদিগের মহিলাকুলের মধ্যে বিলাতী রমণীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদের আড়ম্বর প্রবেশ করে, তাহা হইলে আমাদের সংসারে বিষম অনর্থ ও বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিমতী নারীমাত্রেই এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইবেন। তাহা না হইলে দর্জ্জির দোকানের দেনা মিটাইতেই গৃহস্বামীর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, বালকবালিকাদিগের শিক্ষা এবং তাহাদিগের জন্য পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করাও সুকঠিন হইয়া উঠিবে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আড়ম্বর কাহারও পক্ষে ভাল নহে; সামান্য অবস্থার

লোকের পক্ষে উহা বিষম অনর্থমূলক। মোটা চালচলনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের পক্ষে কিরূপ পরিচ্ছদ সময়োপযোগী ও কার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে এস্থলে দুই চারিটী কথার অবতারণা করিলাম। এ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। যে প্রথা আমাদের অবরোধবাসিনী মহিলাদিগের মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ প্রসার লাভ করিতেছে, তাহারই উপযোগিতা সম্বন্ধে এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আজকাল কলিকাতা সহরে এবং মফস্বলের অনেক ভদ্র পরিবারের বালিকা ও যুবতীদিগের মধ্যে সেমিজের উপর সাড়ী পরিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রথা বয়স্থা রমণীদিগের কৃপাদৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। বলা বাহুল্য যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের সাড়ী পরিবার যেরূপ পদ্ধতি, তাহাতে কি বালিকা, কি যুবতী, কি প্রৌঢ়া, সকলেরই পক্ষে সেমিজ্ (Chĕmise) বা তৎসদৃশ গাত্রাবরণ যে এক অপরিহার্য্য পরিচ্ছদ, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অস্বীকার করিবেন না। সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের অনেক রমণী তাঁতের মিহি কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কাহারও

মিহি কাপড় পরিধান করিবার পক্ষপাতী নহি; তবে মিহি তাঁতের কাপড় বাঙ্গালার একটী উৎকৃষ্ট অননুকরণীয় শিল্প—কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তিই উহার উচ্ছেদসাধন কামনা করিবেন না। কিন্তু এরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে বর্ত্তমান রুচিহিসাবে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলকেই যে সমাজে লজ্জা পাইতে হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা যদি সেমিজের উপর পাতলা কাপড় ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উহা তত দোষের হয় না।

অনেকে নিমন্ত্রণাদি রক্ষা করিবার সময়ে সেমিজ ব্যবহার করিয়া থাকেন, নিজ গৃহ মধ্যে সেমিজ্ ব্যবহার করা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু বাটীর ভিতরেও সপরিবারভুক্ত এবং পাচক ও ভৃত্যাদি অনেকানেক পুরুষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা বাহির হইতে হয়, সুতরাং সেমিজের উপর কাপড় পড়িলে লজ্জারক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কখনই সঙ্কুচিত হইতে হয় না। লংক্লথ্ কাপড়ে ৪টি সেমিজ্ তৈয়ার করিতে ৪৲ টাকার অধিক খরচ হয় না *, অথচ যত্নপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সেগুলি এক বৎসরের অধিককাল চলিতে পারে। সেমিজ্ সর্ব্বদা ধোবার

* বর্ত্তমান সময়ে বস্ত্রের দুর্মূল্যতা হেতু খরচ ইহা অপেক্ষা অবশ্য বেশী হইবে।

বাড়ী পাঠাইবার আবশ্যকতা হয় না; ২।৩ দিন অন্তর গরম জলে সাবান দিয়া কাচিয়া দিলেই উহা পরিস্কৃত হয় এবং ধোবার আছড়ান হইতে রক্ষা পাইয়া অনেকদিন টিকিয়া যায়। বেশী খরচ হইবে বলিয়া যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সেমিজ্ ব্যবহার করেন না, তাহা নহে; প্রাচীন প্রথার বিচারহীন পক্ষপাতিত্বই এরূপ ঔদাসীন্যের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে তাহাই ভাল, আবার একটা নূতন জিনিস জড়াইয়া ব্যতিব্যস্ত হইবার কি প্রয়োজন, অনেকে ইহা মনে করিয়া সেমিজ্ ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন। আজকাল আমাদের সমাজে অনেক সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এখন আমাদের পুরবাসিনী মহিলারা পূর্ব্বের ন্যায় অসূর্য্যম্পশ্যা নাই; এখন তাঁহাদিগকে নানা কারণে সাধারণের সমক্ষে বাহির হইতে হয় এবং তাঁহারা পাঁচ জনে মিলিত হইয়া সাধারণের হিতোদ্দেশ্যে বিবিধ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং পূর্ব্বে কেবল গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জন্য যে পরিচ্ছদ যথেষ্ট বলিয়া আমরা মনে করিতাম, এখন আর তাহা বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নহে, অতএব উহার সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

যদি কাহারও সেমিজ্ পরিতে একান্ত আপত্তি থাকে,

তাহা হইলে দশ হাতের কিছু অধিক লম্বা মোটা সাড়ী হিন্দুস্থানী পদ্ধতি অনুসারে পরিধান করিলে লজ্জারক্ষা বা সৌন্দর্য্যের বিধান, কোন বিষয়েরই ত্রুটি হয় না। হিন্দুস্থানী ধরণে সাড়ী পরিবার পদ্ধতি অতীব প্রশংসনীয়; তবে উহাদের মত কোমর হইতে অত নীচু করিয়া সাড়ী পরা ভাল নহে। আমাদের মেয়েরা কোমরের কাপড়ে যে কসি দেন, তাহা বড় আল্‌গা। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের মত গাঁইট বাঁধিয়া কসি দেওয়া উচিত। যদি কসিটী ডান কাঁকালে থাকে এবং খানিকটা সাড়ী চুনট্ করিয়া সম্মুখে গুঁজিয়া অঞ্চলখানি বাম দিকে ঘুরাইয়া শরীরের ঊর্দ্ধভাগ আবৃত করিয়া বামদিকের কাঁকালে পুনরায় গুঁজিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাড়ী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুচারুরূপে আবৃত হইতে পারে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সাড়ী পরা বড় আল্‌গা রকমের; অল্পায়াসেই শরীর হইতে বস্ত্র বিচ্যুত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র এরূপ আল্‌গা ধরণের হওয়া কখনই উচিত নহে। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক হাতাহাতি করিলেও তাহার পরিধেয় বসন দেহ হইতে বিত্রস্ত হইয়া পড়ে না। এই ধরণের কাপড় পরা বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইলে ভাল হয়।

সেমিজের সঙ্গে সঙ্গে একটী মোটা কাপড়ের জামা ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহের মধ্যে অবস্থিতি করিবার সময় শীতকাল ব্যতীত অন্য ঋতুতে জামা ব্যবহার না করিলেও চলিতে পারে, তবে সে সময়ে গলা পর্য্যন্ত বন্ধ এবং হাফ্ হাতা সেমিজ্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কার্য্য উপলক্ষে কোন স্থানে যাইতে হইলে একটী জামা না পরিয়া যাওয়া উচিত নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সকল মজুর-রমণীরা ছাদ পিটিতে আসে, তাহাদিগকেও কখন শুধু গায়ে দেখিতে পাওয়া যায় না; আর আমরা আমাদিগের কুলমহিলাদিগের লজ্জারক্ষা সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে, তাঁহাদিগকে খালিগায়ে পাঁচজনের বাটীতে পাঠাইতে লজ্জা বোধ করি না। আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু বোধ হয় সামান্য কুলী মজুরেরা পর্য্যন্ত আমাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে সমর্থ। আমি আশা করি যে, আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মাত্রেই বাটী হইতে অন্যত্র গমন করিবার সময় একটি করিয়া জামা ব্যবহার করিবেন।

আজকাল অনেক ভদ্রপরিবারের অবরোধবাসিনী মহিলারা দার্জ্জিলিং, পুরী, মধুপুর, দেওঘর, সিমুলতলা প্রভৃতি নানা স্থানে আত্মীয়স্বজনের সহিত বায়ুপরিবর্ত্তনের

জন্য গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে পথে ও মাঠে বায়ু সেবনার্থ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে এই সকল স্থানের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য সবিশেষ উন্নতি-লাভ করে। এই সকল স্থানে যাঁহারা অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী হইয়া পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে বেড়ান সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বিবেচনা সম্বন্ধে আমি অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহারা এতই স্বার্থপর যে বায়ুপরিবর্ত্তনের সুফলটুকু কেবল নিজেরাই উপভোগ করিতে চাহেন, আর যাঁহারা চিরদিন বায়ু প্রবাহ-বিরহিত সহরের অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, শারীরিক সুখ ও সচ্ছন্দতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিয়া আসিতেছেন, সমাজের গণ্ডীর বাহিরে আসিলেও তাঁহাদের যে ঈশ্বরদত্ত, বিনাব্যয়লব্ধ, জীবনীশক্তি-প্রদায়ক আলোক ও মুক্ত বায়ু সেবনের অধিকার আছে, তাঁহাদিগের কার্য্য দেখিয়া মনে হয় যে তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহা হউক, যে সকল ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকেরা এই সকল স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন, আমার বিবেচনায় তাঁহাদের জুতা ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া প্রাচীনমতাবলম্বী অনেক

বাঙ্গালী ভদ্রলোকই হয় ত আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন। এ স্থলে আমার বক্তব্য এই, আমিও সমাজ-রক্ষা সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই প্রাচীনমতাবলম্বী। তবে যে সকল দেশাচারের অন্ধ অনুসরণে স্বাস্থ্য ও নীতির অবনতি সাধিত হইতেছে, তাহাদিগের সংস্কার সমাজ-রক্ষার জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, এবং যে সকল নূতন আচারের প্রবর্ত্তনে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগের অবলম্বন শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করি। যাঁহারা ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বাঙ্গালা ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশে কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের নারীগণ কোন না কোন প্রকারের জুতা ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল আমাদের বাঙ্গালাদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জুতার ব্যবহার প্রচলিত নাই। অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে জুতার প্রয়োজন হয় না; সুতরাং যখন তাঁহারা বাড়ীর ভিতর থাকেন, তখন তাঁহাদের জুতা পরিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। কিন্তু দার্জ্জিলিংএর ন্যায় শীতপ্রধান দেশে অথবা মধু-পুর প্রভৃতির ন্যায় কঙ্করময় স্থানের ভূমিতে খালিপায়ে ভ্রমণ করিতে হইলে যে বিশেষ কষ্ট হইবার কথা, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পশ্চিমে দুরন্ত শীতের সময়ে খালি

পায়ে থাকিলে, আঙ্গুলগুলি ফুলিয়া উঠে এবং অত্যন্ত বেদনাগ্রস্ত হয়; এরূপ স্থলে গরম মোজা বা জুতা পায়ে দিলে নিতান্ত ক্লেশ উপস্থিত হইয়া নানা রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পশ্চিমের সর্ব্বত্রই মধ্যে মধ্যে প্লেগ্ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকার দংশন দ্বারাই যে প্লেগ্ রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাও এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ সকল পোকা ইঁদুরের দেহ হইতে ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয় এবং সচরাচর আমাদিগের পদদ্বয়ই উহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। মোজা ও জুতা পায়ে দিলে এই বিষম রোগের আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করা যায়। কিন্তু বৃথা লজ্জা বা দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের স্ত্রীলোকেরা নগ্নপদে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন এবং স্থল বিশেষে নিজ জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলেন। আমরাও, লোকে কি বলিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করি না। আমি পুনরায় বলিতেছি যে স্ত্রীলোকের জুতা পরিধান বাঙ্গালায় প্রচলিত না থাকিলেও ইহা বিদেশী প্রথা নহে, ভারতবর্ষের সকল স্থানের সকল সমাজের সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে। যদি কেহ দেশাচারের পক্ষপাতী হইয়া নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের জুতা পরিধান সম্বন্ধে

আপত্তি করেন, তাহাতে আমার কিছু বলিবার নাই। তবে তাঁহাদিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, যাঁহারা প্রয়োজনবশতঃ অথবা আরামের জন্য জুতা পরিধান করেন, তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি তাঁহারা যেন কোনরূপ দোষারোপ বা ক্রূর কটাক্ষপাত না করেন। যাঁহারা চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করা আপত্তিজনক মনে করেন, তাঁহারা কম্বলের (Felt) জুতা সচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। কম্বলের আসন আমরা পূজার নিমিত্ত ব্যহার করিয়া থাকি, সুতরাং কম্বলের জুতা ভাণ্ডার-গৃহ বা রন্ধন গৃহের মধ্যে দারুণ শীতের সময় ব্যবহার করিলেও কোন দোষ হয় না।

আমাদিগের পুরুষ-সমাজে অনেক স্থলেই দুই প্রকার পরিচ্ছদের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। যখন আমরা বাড়ীতে থাকি, তখন ধুতি ও জামা ব্যবহার করি; ইহা আমাদিগের স্বাস্থ্য, গৃহকার্য্য ও আরাম, সকল বিষয়ের পক্ষেই উপযোগী। কিন্তু বাহিরের অনেক কাযকর্ম্ম করিবার সময়ে এরূপ পোষাক সর্ব্বথা সুবিধাজনক বা অনুমোদনীয় নহে। ধুতি পরিয়া কেহ এজ্‌লাসে বসিয়া বিচার করিতে পারেন না অথবা উকিল ব্যারিষ্টারের ব্যবসা করিতেও অনুমতি প্রাপ্ত হন না। যাঁহারা একস্থানে বসিয়া খাতাপত্র লেখেন, ধুতি পরিলে তাঁহাদের কাজের কোন ক্ষতি না

হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের সর্ব্বদা চলিবার 'ফিরিবার প্রয়োজন হয়, তাঁহাদের পক্ষে ধুতি চাদর ব্যবহার করা অনেক সময়ে সুবিধাজনক হয় না। যাঁহারা মেডিকাল্ কলেজে পড়েন, কাজের অসুবিধা হয় বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে চাদর বা অপর কোন প্রকার দোছুটের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদিগের ধুতি চাদর লইয়া কাজকর্ম্ম করা বড়ই অসুবিধাজনক। বেলগাছিয়া পশু-চিকিৎসালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ধুতি ও চাদরের ব্যবহার একেবারেই প্রচলিত নাই। বাহিরের কাযকর্ম্ম করিবার পক্ষে ধুতি চাদর অনেক স্থলেই উপযোগী নহে; পেণ্টুলেন্ ও চাপকান্ বা পেণ্টুলেন্ ও কোট, ধুতি চাদর অপেক্ষা অধিক উপযোগী। অনেক সময়ে ধুতি চাদর পরিলে কর্ম্মস্থলে রাজপুরুষদিগের অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়; ইহাও তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে। যাঁহাদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া কাযকর্ম্ম না করিলে আমাদের চলিবে না, এমন কি অন্নসংস্থান সম্বন্ধেও ক্ষতি হইতে পারে, সেস্থানে তাঁহাদের অনুরাগ বিরাগ সম্বন্ধে দৃষ্টি না রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

কার্য্যক্ষেত্রে পেণ্টুলেন্ ও চাপকানের ব্যবহার অনেকদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পেণ্টুলেন্,

চাপকান্ ও চোগা অতি সম্ভ্রান্ত পরিচ্ছদ। রাজদরবারে ইহাই ভারতবাসীর সম্মানের পরিচ্ছদ, সুতরাং ইহাই আমাদের সরকারী পোষাক হওয়া উচিত। তবে কায-কর্ম্ম করিবার সময় চোগা বড় সুবিধাজনক নহে এবং চাপকান্‌ও পরিবার বা খুলিবার পক্ষে তত সহজ নহে বলিয়া আজকাল অনেকেই চাপ্‌কানের পরিবর্ত্তে কোট্ ব্যবহার করিতেছেন। কোট্ পরিয়া কাযকর্ম্ম করিতে অসুবিধা হয় না; সুতরাং যদি একটু লম্বা কোট্ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহার ব্যবহার প্রচলিত হইলে লাভ ব্যতীত কোন ক্ষতি হয় না। তবে ঠিক ইংরাজের মত আমাদের পোষাক হইবার কোন আবশ্যকতা নাই। উহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং অনেক স্থলে উহা দ্বারা পরিচ্ছদধারীর জাতি-নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। আমাদিগের বিদ্যালয়ের বালকদিগের মধ্যে পেণ্টুলেন্ ও কোটের ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে দেখিতেও বেশ হয় এবং তাহাদিগের ড্রিল্, ব্যায়াম, ক্রীড়া প্রভৃতি সকল বিষয়েরই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আমি ছাত্রমাত্রেরই অভিভাবকের এবং বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

অবশ্য আমাদিগের সামাজিক উৎসবাদিতে ধুতির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে এবং বোধ হয় বরাবর চলিবে। আমাদিগের গৃহে ভোজন, উপবেশন প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য্যের যেরূপ ব্যবস্থা চিরদিন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা যে এখনও বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ প্রথার অনুসরণ করিতে হইলে ধুতি ও সাড়ীর ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে ধুতির ভিতর একটী ড্রয়ার্ (Drawer) ব্যবহার করা সর্ব্বথা সঙ্গত। ইহাতে ধুতিও পরিষ্কার থাকে এবং যাঁহারা মিহি কাপড় ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকেও ভদ্র সমাজে লজ্জা পাইতে হয় না। সুখের বিষয় এই যে আজ কাল অনেক ভদ্র পরিবারের মধ্যে ধুতির নীচে ড্রয়ার্ পরিধান করিবার প্রথা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইব। ধুতির কোঁচা সম্মুখে না ঝুলাইয়া যদি উহাকে পিছনে গুঁজিয়া "মালকোঁচা" ধরণের কাপড় পরা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় ধুতি পরা সম্বন্ধে একটু উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সমাজে ইহা প্রচলিত হইলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গালী ভিন্ন বোধ হয় পৃথিবীর অপর সকল জাতিই মাথার কোন না কোনরূপ আবরণ ব্যবহার করিয়া

থাকেন।" কিন্তু বাঙ্গালীর মাথার আবরণ নাই বলিয়া আমি দুঃখিত নহি, কারণ মাথা সর্ব্বদা আবরণের মধ্যে থাকা স্বাস্থ্যসঙ্গত নহে। ইহাতে মাথায় বাতাস না লাগিয়া শীঘ্র গরম হইয়া উঠে, মাথায় ঘামের দুর্গন্ধ হয় এবং অনেক স্থলে মাথার চুল পাতলা হইয়া টাকের সূত্রপাত হয়। মাথায় যদি কোন আবরণ দিতে হয়, তাহা হইলে উহা যত হাল্কা হয় এবং উহার মধ্য দিয়া বায়ু যাহাতে সহজে সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। টুপি, ক্যাপ্ বা পাগ্ড়ি যদি মাথার চতুর্দ্দিকে চাপিয়া বসে, তাহা হইলে শিরোদেশে রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়া শিরঃপীড়া, চক্ষুঃ ও মস্তিষ্কের রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। হিন্দুস্থানীরা যে খুব হাল্কা পাতলা কাপড়ের টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন, মাথায় পরিবার পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। সার্জ্জন্-জেনেরাল্ সার্ সি পি লিউকিস্ তাঁহার ট্রপিক্যাল্ হাইজিন্ (Tropical Hygiene) নামক পুস্তকে টুপি ব্যবহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আলোক এবং বিশুদ্ধ বাতাস মাথার চুলের বৃদ্ধির প্রধান সহায়, সুতরাং বালকবালিকাদিগের শিরোদেশ নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কখনই ঢাকিয়া রাখিবে না। একটা ইংরাজী

কথা আছে যে মাথা সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখিবে (Keep the head cool), এ কথার সত্যতা তিনি আবাল-বৃদ্ধ, সকলের পক্ষেই সমান উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তবে রৌদ্রে বাহির হইবার সময় টুপি ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নহিলে এদেশে সাহেবদের সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার সম্ভাবনা। আমরা যখন সকলে রৌদ্র নিবারণের জন্য ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকি, তখন ইহার জন্য আমাদের টুপি ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে যাহাদিগকে রৌদ্রে কায কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে ছাতার ব্যবহার সুবিধাজনক হয় না। এরূপ স্থলে রৌদ্র-নিবারণের জন্য তদুপযোগী টুপি ব্যবহার করা উচিত। অধিক শীতের সময় টুপি বা পাগ্ড়ি দ্বারা মাথা ঢাকিবার আবশ্যকতা হইয়া থাকে।

আমরা বালকবালিকাদিগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যথোচিত মনোযোগ প্রদান করি না। অধিকাংশ বাঙ্গালীর বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের প্রায়ই নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। যদি বা শরীরের উপরার্দ্ধ জামা দ্বারা আবৃত থাকে, তবে নীচের ভাগ নগ্ন, অথবা কোমরে কাপড় জড়ান থাকিলেও উপর অঙ্গ প্রায়ই অনাবৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য

আমাদের বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের সর্দ্দি কাসি প্রায়ই লাগিয়া থাকে। স্বাস্থ্যতত্ত্বের একটী কথা যদি আমরা মনে রাখি, তাহা হইলে আমরা অনেক অসুবিধা, অনেক খরচের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। তত্ত্বটী এই যে, বালকবালিকাদিগের শরীরে উত্তাপ যুবা বয়সের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং শরীরের আয়তন হিসাবে তাহাদের শরীর হইতে উহা শীঘ্র পরিচালিত হইয়া যায়, সুতরাং বাহিরের ঠাণ্ডা দ্বারা তাহারা সহজেই অভিভূত হইয়া পড়ে। এই জন্য বালকবালিকাদিগের শরীর বর্ষা ও শীতের সময় গরম কাপড় দ্বারা সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা উচিত, নহিলে তাহাদের সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতি রোগে নিয়ত কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা মনে করেন যে বালকবালিকাদিগকে সর্ব্বদা খালি-গায়ে রাখিয়া তাহাদিগকে "শক্ত" ও কষ্টসহ করিতেছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস সর্ব্বদা ভ্রমশূন্য নহে। তাঁহারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তান-সন্ততিগণকে আজীবন দুর্ব্বল ও তাহাদের দেহ রোগ-প্রবণ করিয়া থাকেন। বালকবালিকাগণের ঐ বয়সে শরীরের বৃদ্ধি সাধিত হয় এবং এই বৃদ্ধি সাধনের জন্য বিস্তর তাপের প্রয়োজন হয়। দেহ অনাবৃত থাকিলে দেহতাপ যথেষ্ট পরিমাণে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং তাপের

অভাবে তাহাদিগের শরীর সমুচিত বৃদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য বর্ষা ও শীতের সময়ে তাহাদিগের পক্ষে ঠিক গায়ের উপরে ফ্লানেল্ বা পশমনির্ম্মিত অন্য বস্ত্র ব্যবহার করা সঙ্গত। খালি-পায়ে খালি-গায়ে শীত বা বর্ষার সময়ে ছোট ছেলেদের কখনই খেলিতে বা দৌড়াদৌড়ি করিতে দেওয়া উচিত নহে। গ্রীষ্মকালে বয়স্থ লোকে যেরূপ সূতার কাপড় জামা ব্যবহার করিয়া থাকেন, বালক-বালিকাদিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। ছেলেদের পক্ষে ঢিলা হাফ্ ইজার্ ও কোট্ সর্ব্বপ্রকারে বিশেষ উপযোগী।

এক বৎসর বয়স না হইলে ছেলেদের পায়ে জুতা দেওয়া উচিত নহে। জুতা চওড়া-মুখ, নরম ও কসা না হওয়া উচিত, নহিলে পা বাড়িবার পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। ছেলেরা চটি জুতা যত অধিক ব্যবহার করে, ততই ভাল। চটি জুতা পদদ্বয়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত করে না।

যে জুতা বা বুট্ পা আঁটিয়া ধরে, তাহা কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। যে জুতা পরিলে আমাদের পায়ের অঙ্গুলিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহাই ব্যবহার করা সঙ্গত। ইহাতে পায়ের স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হয় না। অধিকাংশ ইংরাজ যেরূপ জুতা পরিয়া

থাকেন, তাহা নিতান্ত দোষাবহ। এই কারণে অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজের পায়ের অঙ্গুলিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। সচরাচর উহাদিগের বুড়া আঙ্গুলটী কড়ে আঙ্গুলের দিকে ধনুকের ন্যায় বক্রভাবে অবস্থিতি করে এবং কড়ে আঙ্গুলটী তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গুলির স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করে। আমি হস্পিটালে কত সাহেবের যে এইরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন পা দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই; ইহা কেবল জুতার দোষেই ঘটিয়া থাকে। এমন জূতা পরা উচিত, যাহার মধ্যে আঙ্গুলগুলি অল্প নাড়াচাড়া করিতে পারা যায়। সকল সময়ে চাওড়া-মুখ (Broad-toe) জুতার ব্যবহার প্রশস্ত। তবে যে জুতা পায়ে ঢিলা হয়, তাহা ব্যবহার করিলে পা আরামে থাকে না এবং চলিবার পক্ষেও সুবিধা হয় না।

বৃষ্টি বাদলের সময় "ওয়াটার্ প্রুফ্" (Water-proof) ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা হয়। অল্প খরচে সাদা কাপড়কে সহজেই ব্যবহারোপযোগী "ওয়াটার প্রুফ্" করিয়া লওয়া যাইতে পারে। দুই সের আন্দাজ পেট্রল্ (Petrol) নামক তরল পদার্থের সহিত আড়াই ছটাক ল্যানোলিন্ (Lanoline) এবং পাঁচ ছটাক মোম একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে কাপড় কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া নিংড়াইয়া লইতে

হইবে; পরে ঐ কাপড় বাতাসে শুষ্ক করিয়া লইলেই উহা "ওয়াটার প্রুফের" কার্য্য করিবে। এইরূপ ঘরে-গড়া "ওয়াটার্ প্রুফ্" বৃষ্টি নিবারণের জন্য পোষাকের উপর সচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে ইহা প্রকৃত ওয়াটার্ প্রুফের মত অধিক দিন ব্যবহার করা চলে না।

কাপড়ের দুই পিঠে কেবল মোম ঘসিয়া ইস্ত্রী করিয়া লইলে উহাও কিছুদিনের জন্য "ওয়াটার্ প্রুফের" কায করিতে পারে। মোম উঠিয়া যাইলে পুনরায় মোম লাগাইলে উহা ব্যবহারোপযোগী হয়।

ল্যাপ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিগণ ভল্লুক, সীল্ প্রভৃতি লোমশ পশুচর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। শীত নিবারণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, পরিচ্ছদ যে উপাদান দ্বারাই নির্ম্মিত হউক না কেন, উহাকে সর্ব্বদা পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখার বিশেষ প্রয়োজন। মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান সকলের অবস্থায় ঘটিয়া উঠে না এবং উহা না হইলেও কাহারও মান সম্ভ্রমের কোন ক্ষতি হয়, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। কিন্তু পরিধেয় বসন পরিস্কৃত রাখা কাহারও সাধ্যাতীত নহে—ইহা অভ্যাস, সামান্য আয়াস ও যৎসামান্য ব্যয়-

সাপেক্ষ। মলিন রেসমী চাদর ব্যবহার করা অপেক্ষা পরিষ্কৃত মোটা বোম্বাই চাদর ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর। মলিন বসন পরিধান করিলে, কেবল যে স্বাস্থ্যের হানি হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা মন সর্ব্বদা অপ্রসন্ন থাকে এবং কার্য্যস্থলে সকলেরই বিরাগভাজন হইতে হয়। কাপড় যদি ফর্সা হয়, তাহা হইলে তাহা মোটা বা সেলাই করা হইলেও কোন ক্ষতি নাই এবং উহা পরিধান করিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির লজ্জা বোধ করা উচিত নহে। কিন্তু ময়লা কাপড় পরিলে শুদ্ধ যে সঙ্কুচিত হইতে হয় তাহা নহে, ইহাতে মলিনতার প্রতি স্বাভাবিক বিরাগ ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মলিন বস্ত্রের ব্যবহার একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্য পণ্ডিতগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেবত্বের সমতুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Cleanliness is next to Godliness)।

বাস-গৃহ।

আমরা শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে সাবধান থাকিলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে অনেক সময়ে আমাদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। যে কোন সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিলে আমাদিগের শরীরে ঐ রোগ প্রবেশ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিলে অনেক সময়ে ঐ সকল রোগের আক্রমণ হইতে আমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। যে গৃহে আমরা বাস করিয়া থাকি, তন্মধ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে না পায়, যদি আর্দ্র ভূমির উপর তাহা সংস্থাপিত হয়, যদি তাহার নিকটে আবর্জ্জনাদি দুর্গন্ধময় পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে সত্বর আমাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। যে বাটী স্যাঁৎসেঁতে, যাহার মধ্যে আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব থাকে, তন্মধ্যে বাস করিলে, গৃহবাসীদিগের মধ্যে জর, উদরাময় ও

শর্দ্দি কাসির প্রাদুর্ভাব সবিশেষ লক্ষিত হয়। এরূপ বাসগৃহে বহুলোক একত্রে বাস করিলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব বাসগৃহ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতে হইবে, উহার নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধেও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত সমস্ত নিয়মই প্রতিপালন করিতে হইবে। কিরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

স্বাস্থ্যপ্রদ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

১। স্থান-নির্ব্বাচন।

২। গৃহনির্ম্মাণোপযোগী উপাদান ও নির্ম্মাণপ্রণালী।

৩। আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা।

৪। বায়ু-সঞ্চালন।

৫। জল-নিকাশের ব্যবস্থা।

৬। আবর্জ্জনাদি স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা।

৭। রন্ধনশালা, গোশালা ও অশ্বশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ।

৮। শয়ন-গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তির স্থানের পরিমাণ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ইহাদিগের মধ্যে কোনটিরই বিশদ ভাবে আলোচনা করা অসম্ভব, এজন্য অতি সংক্ষেপে

প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা বলা হইতেছে।

স্থান-নির্ব্বাচন—যে জমীর উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহা যতদূর সম্ভব উচ্চ ও শুষ্ক হওয়া উচিত। নীচুজমি প্রায়ই আর্দ্র হয়; আর্দ্র ভূমিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলে উহা সর্ব্বদা স্যাঁৎসেঁতে থাকে এবং যাহারা ঐ বাটীতে বাস করে, তাহাদেব সর্দ্দি, জ্বর, পেটের অসুখ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। কলিকাতায় বাসগৃহ নিম্মাণ করিবার সময় মনোমত স্থান নির্ব্বাচনের সুবিধা সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাটী নিম্মাণ করিতে হইলে স্থান-নির্ব্বাচনের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয় না, এজন্য উহার উপর লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কলিকাতার যে স্থান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নীচু, যে জমী পুষ্করিণী ভরাট (বিশেষতঃ আবর্জ্জনাদি দ্বারা) করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, যাহার চতুর্দ্দিক উচ্চ গৃহ দ্বারা আবদ্ধ সুতরাং যাহার মধ্যে বায়ু ও সূর্য্যালোক যথোচিত পরিমাণে প্রবেশ করিয়া উহাকে শুষ্ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ রাখিতে পারে না, তাহার উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলে, তাহা কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না।

কাঁকর-জমীর উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত,

কারণ এরূপ জমীর উপর বৃষ্টির জল পড়িলে উহা জমীর মধ্য দিয়া সহজেই নির্গত হইয়া যাইতে পারে। "বেলে" মাটীর জমী হইলে জল নির্গত হইয়া যাইবার অসুবিধা হয় না, কিন্তু জমী "এঁটেল" মাটীর হইলে উহার মধ্য দিয়া জল সহজে নিকাশ হইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং ঐ জমী সর্ব্বদা ভিজা থাকে।

জলা-ভূমি, শ্মশান, গোরস্থান, এবং মল প্রোথিত করিবার ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিবার স্থান হইতে বহু দূরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত। এই সকল স্থানের জল ও বায়ু সর্ব্বদাই অল্পাধিক পরিমাণে দূষিত থাকে। বিশেষতঃ মল প্রোথিত করিবার স্থানের (Trenching ground) নিকটে বাসগৃহ নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে মাছির অত্যন্ত উপদ্রব হইয়া থাকে এবং মলনিহিত বিষাক্ত বীজাণু মক্ষিকার পদসংলগ্ন হইয়া গৃহ মধ্যে আনীত হইবার সম্ভাবনা থাকে। গৃহ-মধ্যে রক্ষিত খাদ্যাদি এই বীজাণুবাহী মক্ষিকা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে উহা বিষাক্ত হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলে কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি উৎকট রোগ এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুর্গন্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুদ্ধ এই কারণে ট্রেংচিং গ্রাউণ্ডের নিকট বাসগৃহ কখনই প্রস্তুত করা উচিত নহে।

জমী নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইলে যাহা চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে উচ্চ, যে জমীর একদিকে একটু ঢাল আছে, যাহার নিকট বড় গাছপালা থাকিয়া যথোচিত আলোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যাঘাত করে না, যাহার কোন অংশ কখন আবর্জ্জনা দ্বারা ভরাট করা হয় নাই (কারণ এরূপ জমীর মধ্য হইতে আবর্জ্জনা পচিয়া নানারূপ দূষিত বাষ্প উঠিবার সম্ভাবনা), যাহার চতুর্দ্দিকে অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা ডোবা নাই, এরূপ স্থান বাসগৃহের জন্য নির্ব্বাচন করা উচিত।

বাসগৃহের জমীর মধ্যে ডোবা বা গর্ত্ত থাকিলে উহা ভাল মাটীর দ্বারা ভরাট করিয়া দেওয়া উচিত, নচেৎ বর্ষাকালে তন্মধ্যে জল সঞ্চিত হইয়া গৃহকে আর্দ্র রাখিবে, উহা বিকৃত হইয়া দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপাদন করিবে এবং তন্মধ্যে মশক জন্মিয়া বিষম উপদ্রবের কারণ হইবে। এক্ষণে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এক জাতীয় মশকের দংশন দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং খানা ডোবা প্রভৃতি যে সকল স্থানে অগভীর জল সঞ্চিত থাকে, মশকীরা তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ডিম্ব প্রসব করে। অতএব বাসগৃহের চতুঃপার্শ্বের কোন স্থানে যাহাতে মশক জন্মিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে যথোচিত প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

বাটীর চতুর্দ্দিকে জঙ্গল থাকিলে উহা পরিষ্কৃত করা উচিত। জঙ্গল থাকিলে জমী সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে এবং উহার মধ্যে মশক, বৃশ্চিক, সর্প প্রভৃতি অনিষ্টকর ও বিষাক্ত প্রাণী-দিগের বাস করিবার সুবিধা হয়।

গৃহনির্ম্মাণোপযোগী উপাদান—ইট, কাঠ, পাথর, চুণ, বালি, সুরকি, মাটী, সিমেণ্ট্, বাঁশ, দড়ি, খোলা, পাতা, ঘাস, লোহার চাদর (Corrugated iron) প্রভৃতি নানাবিধ উপাদান পাকা ও কাঁচা বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য এদেশে ইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইটগুলির পোড় যাহাতে খুব ভাল হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত, নহিলে উহারা জমী হইতে আদ্র্তা শোষণ করিয়া গৃহের দেওয়াল সর্ব্বদা সাঁৎসেঁতে রাখিবে, দেওয়ালের রং নষ্ট হইয়া যাইবে, লোণা ধরিয়া উহার বালি খসিয়া পড়িবে, এবং যাহা কিছু গৃহসজ্জা বা পুস্তকাদি দেওয়ালের নিকট থাকিবে, তাহাই আদ্র্তা (Damp) সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যাইবে। কলিকাতার অধিকাংশ পুরাতন বাটীর নিম্নতলের ঘর এই কারণে বাসের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া থাকে। জলের একটি ধর্ম্ম এই যে উহা কৈশিক আকর্ষণ

গুণে (Capillary attraction) উহার আধার হইতে প্রায় ২২ হাত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। ইট, সুরকি প্রভৃতি পদার্থ জল শোষণ করে বলিয়া উহারা ভিজা জমী হইতে কৈশিক আকর্ষণ দ্বারা দেওয়াল বাহিয়া জলের ঊর্দ্ধদেশে উঠিবার পক্ষে সহায়তা করে। ভাল পোড়ের ইট ও সুর্‌কি হইলে এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। তবে বাসগৃহ শুষ্ক রাখিতে হইলে তন্মধ্যস্থ সমস্ত ভূমি (উঠান প্রভৃতি) কাঁকর, সুর্‌কি ও চূণ দিয়া উত্তম-রূপে পিটাইয়া তদুপরি পুরু করিয়া সিমেণ্ট্ লাগাইয়া দেওয়া উচিত, বাটীর মধ্যে কোন স্থানে খালি মাটী থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে বাটীর মেঝে দুই হাত উচ্চ হইলে গৃহের আর্দ্রতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং জমীর সমতলে ভিত্তির উপর যে স্থানে দেওয়ালের আরম্ভ হয়, তথায় পুরু করিয়া আর্দ্রতা-নিবারক কোনরূপ পদার্থ রক্ষা করিয়া তদুপরি দেওয়াল গাঁথিলে দেওয়ালের আর্দ্রতা যথেষ্ট পরিমাণে নিবারিত হয়। সিমেণ্ট্, কড়িকোটার ন্যায় মসৃণ আবরণযুক্ত ইট বা টাইল্, স্লেট্ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ জল শোষণ করে না, তাহারাই এই কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। আলকাতরা ফুটাইয়া তন্মধ্যে ইট ডুবাইয়া তদুপরি শুষ্ক বালি মাখাইয়া

লইলে ঐ ইট আর জল শোষণ করে না, সুতরাং ভিত্তির উপর এইরূপ ৩।৪ খানা ইটের গাঁথনি করিয়া পরে অন্য ইটের গাঁথনি করিলে অল্প খরচে দেওয়ালের আর্দ্রতা নিবারিত হইতে পারে।

গৃহের ছাদ যত নীচু হইবে ঐ গৃহ গ্রীষ্মকালে তত অধিক গরম ও শীতকালে অধিক শীতল হইবে; এই জন্য গৃহের ছাদ সর্ব্বথা বেশী উচু করিয়া প্রস্তুত করা উচিত। লোহার চাদরের ছাদ গৃহকে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক উষ্ণ ও শীতকালে অতিশয় শীতল রাখে, তজ্জন্য এরূপ গৃহে বাস কোন সময়েই সুখের হয় না। তবে লোহার ছাদের কয়েক ফিট্ নীচে তক্তার একটি আবরণ দিলে অথবা উহার নীচে পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া রাখিলে গৃহ অধিক উষ্ণ বা শীতল হয় না। খড় বা পাতার "চাল" গৃহকে শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল রাখে, কিন্তু ইহার মধ্যে ইঁদুর, সাপ, বিছা, কীট পতঙ্গাদি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের অশান্তির কারণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এরূপ গৃহে অগ্নি-দাহের আশঙ্কা প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। খোলার "চাল" বেশী উচু না হইলে গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম হয় এবং বৃষ্টির সময় উহার মধ্য দিয়া কোথাও না কোথাও জল পড়িতে দেখা

যায়; বিশেষতঃ খোলার "চাল" হইতে ধুলা কুটা সর্ব্বদাই নীচে পড়ে এবং ক্ষুদ্র পক্ষী ও নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি তন্মধ্যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। খড়, খোলা বা লোহার চাদরের ছাদ হইলে উহার নিম্ন দেশে একটি একটি কাঠের বা পাতলা টাইলের কৃত্রিম ছাদ (Ceiling) প্রস্তুত করা উচিত। মোটা কাপড়ের "সিলিং" দেখিতে পরিস্কৃত হয় বটে, কিন্তু উহা অধিক দিন টিকে না এবং বর্ষার সময়ে জল পড়া একেবারে নিবারণ করিতে পারে না। "সিলিং" থাকিলে গৃহটী পাকাবাড়ীর অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অধিক শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ থাকে, কারণ সিলিং ও ছাদের মধ্যে যে বায়ু ব্যবধান থাকে, উহা তাপ-অপরিচালক বলিয়া বাহির হইতে অধিক তাপ বা শৈত্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না।

আলোক প্রবেশ ও বায়ু সঞ্চালন—জমীর চারিদিকেই কিছু খোলা জায়গা রাখিয়া বাস গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য, কারণ নিজের জমী পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা আপনার আয়ত্তের মধ্যে কিন্তু পার্শ্বে অপরের জমী থাকিলে তাহা পরিস্কৃত রাখান সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। কাহারো দেওয়াল চাপিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা বড়ই অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা; ইহাতে নিজের ও প্রতিবাসীর উভয়েরই যথেষ্ট অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহাতে উভয় বাটির মধ্যে বায়ু

সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে এবং বৃষ্টির জল উভয় দেওয়ালের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কতক পরিমাণে অবরুদ্ধ থাকিয়া উভয় বাটীর দেওয়ালকেই ভিজা রাখে। বাসগৃহের চতুঃপার্শ্বে যত অধিক মুক্ত স্থান রাখিতে পারা যায়, তাহা রাখা উচিত। আপনার জমী না থাকিলে বাসগৃহের চতুঃপার্শ্বে দরজা জানালা রাখিতে পারা যায় না, অথচ যদি বাসগৃহের চতুঃপার্শ্বে দরজা জানালা না থাকে, তাহা হইলে বাসগৃহ মধ্যে যথেষ্ট-পরিমাণে আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর আইনানুসারে দুইটী বাটীর মধ্যস্থলে অন্ততঃ ৪হাত পরিমাণ স্থান রাখিবার ব্যবস্থা আছে। উহা যথেষ্ট না হইলেও বায়ুসঞ্চালন ও আলোক প্রবেশের পক্ষে কথঞ্চিৎ সহায়তা করে। একজনের দেওয়াল চাপিয়া আর একজনের বাটী তুলিতে দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা। বাটীর চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থান রাখিবার ব্যবস্থা না করিলে কাহাকেও বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেওয়া উচিত নহে। এ সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে মৎপ্রণীত "বায়ু" নামক পুস্তকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"বাটীর চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থান না রাখিলে,

কোনও কারণেই বাটী প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করা উচিত নহে। অনেকে বলিবেন যে এরূপ কঠিন আইন প্রচলিত হইলে লোকের কলিকাতায় বাস বাস করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এস্থলে বক্তব্য এই যে কলিকাতায় অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক লোক থাকিলে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই অল্প-সংখ্যক লোক যাহাতে সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত এইরূপ সুনিয়ম প্রচলিত হইলে যাঁহারা এই নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা আমি অসুবিধা বা অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করি না। তাঁহারা সহরের উপকণ্ঠে অথবা পল্লীগ্রামে গমন করিয়া প্রশস্ত স্থানে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল বাসগৃহ অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন এবং অন্যান্য কার্য্যেও তাঁহাদের যথেষ্ট অর্থানুকূল্য ঘটিবে। এইরূপে অনেক ভদ্রলোক যদি পল্লীগ্রামে যাইয়া বাস করেন, তাহা হইলে সেই ভ্রষ্টশ্রী গ্রামগুলির পুনরায় শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে—সেখানে বিদ্যালয়, সুচিকিৎসক এবং উত্তম ঔষধের অভাব হইবে না—তাঁহাদিগের সমবেত চেষ্টায় পানীয় জল ও জল-নিকাশের (Drainage) সুবন্দোবস্ত হইবে

গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া যাইবে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি স্বাস্থ্য, সচ্ছন্দতা ও শান্তিপূর্ণ হইয়া হাসিতে থাকিবে—বাঙ্গালার পূর্ব্ব গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে। এ বিষয় চিন্তা করিতেও মনোমধ্যে যে আশা ও আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।"

আমরা এই স্থানে বাসগৃহ মধ্যে আলোক-প্রবেশ, বায়ু-সঞ্চালন প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণের সময়ে যাহাতে তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। নিম্ন বঙ্গদেশে বৎসরের অধিকাংশ সময় দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, এজন্য এ প্রদেশে বাসগৃহগুলি উত্তর-দক্ষিণমুখী হইলে ভাল হয়, এবং যাহাতে বাটীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খানিকটা খোলা জায়গা থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। এইজন্য প্রতিবাসীর বাটীর দেওযাল চাপিযা গৃহ নিৰ্ম্মাণ করা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা। ইহাতে উভয়ের বাটীতেই বায়ু-সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সাধিত হয়।

আমরা বাটীর মধ্যে সচরাচর দুইটী অঙ্গনের ব্যবস্থা

করিয়া তাহাদিগের চতুঃপার্শ্বে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। বাটীর চতুর্দ্দিকে মুক্তস্থান থাকিলে অঙ্গন দুইটী বায়ু-সঞ্চালনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু বাটীর চতুঃপার্শ্বে খোলা যায়গা না থাকিলে অঙ্গনের বায়ু বাহিরে পরিবাহিত হইবার অথবা বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত যথোচিত পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া পরিষ্কৃত হইবার সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ যদি অঙ্গন অল্পপরিসর হয় এবং চতুর্দ্দিকের গৃহগুলি দ্বিতল বা ত্রিতল উচ্চ হয়, তাহা হইলে অঙ্গনগুলি এক একটী গভীর কূপের ন্যায় অবস্থিত হইয়া গৃহস্থিত দূষিত বায়ুকে সহজে সঞ্চালিত হইয়া পরিষ্কৃত হইতে দেয় না। এরূপ চকবন্দি বাটী কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। কলিকাতার জমী অতিশয় দুর্মূল্য; এখানে বাটীর মধ্যে দুইটী অঙ্গন এবং বাটীর চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত পরিমাণ খোলা জায়গা রাখা অনেকেরই পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে বাটীর মধ্যে অঙ্গনের বন্দোবস্ত না করিয়া যদি বাটীর চতুঃপার্শ্বে খানিকটা খোলা জায়গা রাখা যায় এবং একহারা অথবা দোহারা দ্বিতল বা ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়া গৃহগুলির বায়ুপথ সমূহ খোলা জায়গার উপর অবস্থিত হয়, তাহা হইলে কোন গৃহেই বায়ু বা আলোক প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটে না। অল্প পরিসর

স্থানের উপর যাঁহাদিগের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাঁহারা যদি অগ্রে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা যে অনেক অসুবিধার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করি, সুতরাং বাধ্য হইয়া বৎসরের মধ্যে প্রায় নয় মাস কাল দিবাভাগে আমাদিগের বাসগৃহের দরজা জানালা সমস্তই উন্মুক্ত রাখিতে হয়। এজন্য শীতপ্রধান দেশের ন্যায় গৃহ মধ্যে বায়ু-সঞ্চালনের নিমিত্ত এদেশে কোনরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের ভ্রান্ত সংস্কার ও বাসগৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালীর দোষে আমরা প্রকৃতিদত্ত অনায়াসলভ্য আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের সুখ ভোগ হইতে অনেক সময়ে বঞ্চিত থাকি। বাস্তবিক কত লোক যে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অভাবে স্বাস্থ্যহীন ও কঠিন রোগগ্রস্থ হইয়া অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা "ঠাণ্ডা" লাগিবার অমূলক আশঙ্কায় রাত্রিকালে অনেক সময়ে গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া থাকি। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে শীতল বায়ু সেবন করিলে উৎকট কাশ রোগ উৎপন্ন হয়। এ বিশ্বাসটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক

ও প্রভৃত অনিষ্টের কারণ। অবশ্য “ঠাণ্ডা” লাগাইলে সর্দ্দি কাশি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত থাকিলে, শয়ন গৃহে কেন, শীত বা বর্ষাকালে খোলা জায়গায় থাকিলেও “ঠাণ্ডা” লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। অধিকাংশ কাশরোগই কোন না কোনরূপ বীজাণু (Bacteria) দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বহুজনাকীর্ণ স্থানের, অথবা যে গৃহে কোন সংক্রামক শ্বাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তি বাস করে, সেই গৃহের বায়ুর মধ্যে ঐ সকল রোগোৎপাদক বীজাণুর প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় এবং ঐ বীজাণুমিশ্রিত দূষিত বায়ু নিশ্বাসের সহিত আমাদের ফুস্ফুসের (Lungs) অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ উৎকট কাশরোগ উৎপাদন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে দূষিত বায়ু সেবনের দ্বারাই ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঘর খোলা থাকিলে কেবল “ঠাণ্ডা” লাগিয়া কখনই ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হয় না। সূর্য্যালোক এবং বায়ুস্থিত অক্সিজেন্ উভয়ই বীজাণুর পরম শত্রু; গৃহমধ্যে রৌদ্র ও বায়ুপ্রবেশের যথেষ্ট সুবিধা থাকিলে বায়ুস্থিত রোগোৎপাদক বীজাণু শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং দূষিত বায়ুর রোগজননশক্তি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ষ্টর্ণবর্গ্ বলেন যে, রোগোৎপাদক বীজাণু নাশের জন্য রৌদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং সহজ-লভ্য পদার্থ আর

নাই—"One of the most potent and one of the cheapest agents for the destruction of pathogenic bacteria"। একটা সাধারণ ইংরাজী কথা প্রচলিত আছে যে, যে বাটিতে সূর্য্য প্রবেশ করে না, তাহার দ্বার চিকিৎসকের প্রবেশ জন্য সর্ব্বদা মুক্ত থাকে—"Where sun does not enter, the Doctor does"—ইহা অতি সত্য কথা। সংক্রামক রোগগ্রস্থ ব্যক্তির গৃহমধ্যে আলোক-প্রবেশ ও বায়ু-সঞ্চালনের যথোচিত বন্দোবস্ত থাকিলে শুশ্রূষাকারী সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে ভীষণ প্লেগ্ আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারও বীজাণু বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক সংস্পর্শে শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ ভীষণ রোগের বীজ যে এত সহজে ও বিনাখরচে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ চিকিৎসালয়ে অনেক প্লেগ্ রোগী একত্রে থাকিলেও যাহারা তাহাদিগকে দিবারাত্র শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহারা ঐ রোগে কদাচ আক্রান্ত হইয়া থাকে। অথচ ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপরিচ্ছন্ন জনতাপূর্ণ পল্লীর মধ্যে কোন বাটীতে একটী মাত্র লোক প্লেগ্ রোগে আক্রান্ত হইলে, উহা দাবানলের ন্যায় সত্বর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এইজন্য কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, প্লেগের সময় সাধারণ চিকিৎসালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ স্থান।

আধুনিক চিকিৎসকদিগের মত এই যে, মাতা-পিতা বা তদূর্দ্ধ পুরুষের মধ্যে যক্ষ্মা থাকিলেই যে সন্তানসন্ততির মধ্যে যক্ষ্মার সঞ্চার হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অনেক স্থলে শুদ্ধ শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা কলুষিত বায়ু সেবন করিলেই যক্ষ্মার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, যক্ষ্মার বীজাণুর অভাবে ঐ রোগ উৎপন্ন হয় না। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বহুজনপূর্ণ সহরের প্রায় সর্ব্বস্থানের বায়ুমধ্যে এই রোগের বীজাণু অল্লাধিক পরিমাণে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। মুক্তস্থানের বায়ুতে ইহারা সূর্য্যালোক ও বায়ুস্থিত প্রচুর অক্সিজেন্ সংযোগে শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু রুদ্ধ গৃহের প্রশ্বাস কলুষিত বায়ুর মধ্যে থাকিলে উহারা বিনষ্ট না হইয়া সত্বর সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উহাদিগের সংক্রামকতাধর্ম্মও প্রবল হয়। এইজন্য প্রশ্বাস কলুষিত বায়ু সেবনে এই রোগের বিস্তৃতি সংসাধিত হইতে থাকে। ডাক্তার কার্মাইকেল্ ইংলণ্ডের অনেক বিদ্যালয়ের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অপ্রচুরতা না থাকিলেও শুদ্ধ প্রশ্বাস-কলুষিত বায়ু সেবন

করিয়া এবং খোলা জায়গায় ব্যায়াম চর্চ্চা না করিয়া, বালকেরা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অধ্যাপক এলিসন্, সার্ জেম্স্ ক্লার্ক্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া কার্মাইকেলের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ডে স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নানাবিধ উন্নতি সাধিত হওয়ায়, যক্ষ্মা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই রোগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে দেখা যাইতেছে এবং এই রোগের মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সূর্য্যালোক ও মুক্ত বায়ু সংস্পর্শে রোগোৎপাদক বীজাণু সকল শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইজন্য যদি সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সুস্থ ব্যক্তির এক গৃহে বাস করিতে হয় (যাহা সাধারণ লোকের বাটীতে সকল সময়ে ঘটিয়া থাকে), তাহা হইলে সেই গৃহের বায়ুপথ সকল সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত। নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি কাশরোগে ফুস্ফুসের অল্পাধিক স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হয়, সুতরাং রক্তশোধনের জন্য যে পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করা উচিত, রোগগ্রস্ত ফুস্ফুস্ তাহা গ্রহণ করিতে না পারায় রোগীর শরীরস্থিত রক্ত

যথারীতি পরিষ্কৃত হইতে পায় না, সুতরাং রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ সময়ে যদি আবার আমরা রোগীকে "ঠাণ্ডা" লাগিবে, এই অমূলক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া গৃহের তাবৎ বায়ুপথ রুদ্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে রোগীর সাধ্যমত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার যথেষ্ট অসুবিধা উপস্থিত হয়, সুতরাং এরূপ স্থলে আমরা তাহার আরোগ্যের অন্তরায় ও অনেক সময়ে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকি। দুঃখের বিষয় এই যে, বহুদর্শী চিকিৎসকগণ উচিত পরামর্শ দিলেও আমরা ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ তদনুরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হই না। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে যতক্ষণ রোগী রুদ্ধ গৃহের দূষিত বায়ু সেবন করিতে থাকিবে, ততক্ষণ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার রোগের প্রতীকার করিবার চেষ্টা করা বৃথা। যে ক্ষয়কাশরোগে আমরা রোগীকে রুদ্ধ গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিলে নিরাপদ্ বিবেচনা করি, সেই দুঃসাধ্য রোগ এক্ষণে, যেখানে সর্ব্বদা বরফ পড়িতেছে, এরূপ অত্যধিক শীতল স্থানে উন্মুক্ত বায়ুমধ্যে থাকিয়া প্রশমিত হইতেছে। সাধারণ হস্পিটালের দরজা জানালা, কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল ঋতুতেই, দিবারাত্রি মুক্ত রাখা হয়, অথচ তাহাতে রোগীদিগের কোন অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায় না।

নানাবিধ সামাজিক কারণ ও আর্থিক অভাব নিবন্ধন আমরা বহু পরিবার লইয়া ক্ষুদ্রগৃহে বাস করিতে বাধ্য হই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা "হিম" লাগিবার ভয়ে রাত্রিকালে শয়ন-গৃহের প্রায় সমস্ত বায়ুপথই রুদ্ধ করিয়া দিই। রোগ আমাদের নিত্য সহচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং গৃহবাসীদিগের মধ্যে দুই একটী রোগী থাকাও অসম্ভব নহে। এস্থলে বলা উচিত যে, পীড়িতাবস্থায় আমাদিগের প্রশ্বাস ও ত্বক্ দ্বারা অধিক পরিমাণ কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ ও নানাবিধ দূষিত অর্গানিক্ (Organic) পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। শিশুসন্তানগণ অনেক সময়ে শয্যার উপরেই রাত্রিকালে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে এবং গৃহিণীদিগের আলস্যবশতঃ তাহা সমস্ত রাত্রি সেই রুদ্ধ গৃহের এক পার্শ্বে সঞ্চিত থাকে। এইরূপে গৃহবাসী-দিগের শ্বাসক্রিয়া, রোগীর শরীর হইতে পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থ এবং গৃহমধ্যে সঞ্চিত মলমূত্র দ্বারা শয়নগৃহের বায়ু শীঘ্র অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত রোগী বা শিশুর পরিচর্য্যা নিবন্ধন অনেক সময়ে গৃহমধ্যে একটী আলোক রাখিবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং উক্ত গৃহের বায়ুস্থিত অক্সিজেনের অংশ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং বায়ুমধ্যে কার্ব্বনিক্ এসিড্ প্রভৃতি দূষিত পদার্থের অংশ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হয়। গৃহ রুদ্ধ থাকে বলিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ু তন্মধ্যে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে প্রবেশ করিয়া দূষিত বায়ুকে পরিষ্কৃত ও স্থানান্তরিত করিতে পারে না, সুতরাং উক্ত গৃহের বায়ু যে কিরূপ বিষাক্ত হয়, তাহার বর্ণনার অতীত। এই দূষিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কিন্তু যাহারা গৃহ মধ্যে বাস করে, তাহারা বার বার উহা নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে বলিয়া তাহাদের ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়, সুতরাং গৃহবাসীরা উক্ত দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পারে না। আমরা বার মাস ত্রিশ দিন এইরূপ অবস্থাপন্ন শয়নগৃহের মধ্যে রাত্রি যাপন করিয়া থাকি, সুতরাং ইহাতে যে আমাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

আমরা যে নির্ম্মল বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করি, তাহাতে শতকরা ·০৪ ভাগ মাত্র কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করি, তাহার প্রতি ১০০ ভাগে ৪ ভাগ কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ থাকে, সুতরাং গৃহ রুদ্ধ থাকিলে, উহার বায়ু শ্বাসক্রিয়া দ্বারা যে কত শীঘ্র দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া পড়ে, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। অক্সিজেন্ গ্যাস্ আমাদের জীবন ধারণের সহায়। রুদ্ধ গৃহের বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন্ থাকে, তাহা ক্রমশঃ আমরা নিশ্বাসের সহিত টানিয়া লই

এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে: প্রশ্বাস-ত্যক্ত বিষাক্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ দ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ হইতে থাকে। গৃহের বায়ুপথ মুক্ত থাকিলে বাহিরের নির্ম্মল বায়ু গৃহস্থিত দূষিত বায়ুর সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বনিক্ এসিডের পরিমাণ কমাইয়া এবং উহার কতকাংশ গৃহ হইতে দূর করিয়া দিয়া, উহাকে পুনরায় শ্বাসোপযোগী করে। এজন্য কি গ্রীষ্মকাল, কি শীতকাল, কি দিবা, কি রাত্রি, যে গৃহে বাস করা যায়, তাহার বায়ু-পথ-সমূহ রুদ্ধ রাখা নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, এজন্য এদেশের বাসগৃহের দরজা ও জানালাগুলি উত্তর-দক্ষিণমুখী ও ঋজু * হওয়া উচিত। বায়ু পথগুলি ঋজু না হইলে গৃহমধ্যে কখনই অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে না। কোনও গৃহের একটী মাত্র ঋজু বায়ু-পথ মুক্ত থাকিলে বায়ু সঞ্চালনের যেরূপ সুবিধা হয়, এক দিকে দুই তিনটী বায়ু-পথ উন্মুক্ত থাকিলেও সেরূপ সুবিধা হয় না। গৃহের

* উত্তর দক্ষিণে বা পূর্ব্ব পশ্চিমে সমসূত্রপাতে অবস্থিত দ্বার বা জানালাকে লোকে ঋজু দ্বার বা জানালা বলিয়া থাকেন, আমি সেই অর্থে 'ঋজু' শব্দের ব্যবহার করিলাম।

চতুঃপার্শ্বে দরজা জানালা থাকিলে গৃহ মধ্যে আলোক-প্রবেশের ও বায়ু-সঞ্চালনের সবিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। দরজা ও জানালাগুলি দৈর্ঘ্যে ৬½ ফিট্ এবং প্রস্থে ৩¾ ফিটের কম হওয়া উচিত নহে। জানালা অপেক্ষা খড়্খড়ি গৃহের বায়ু-সঞ্চালনের পক্ষে অধিক উপযোগী। খড়্খড়ির "পাখি" ফেলা থাকিলেও তাহাদিগের ফাঁক দিয়া গৃহে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু খড়্খড়ির সহিত আমরা যে "সাসি" প্রস্তুত করিয়া থাকি, তাহা প্রভূত অনিষ্টের কারণ। গৃহের শোভার জন্য "সাসি" নির্ম্মিত হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু "সাসি" কখন রুদ্ধ করা উচিত নহে।

প্রত্যেক গৃহের বায়ু-নির্গমনের স্বতন্ত্র পথ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ যাহাতে এক গৃহের দূষিত বায়ু অপর গৃহে প্রবেশ না করে, তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। গৃহের দেওয়ালের উপরিভাগে কতকগুলি ছিদ্র রাখা কর্ত্তব্য। প্রশ্বাস-ত্যক্ত বায়ু ও দীপালোক-সম্ভূত কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ উষ্ণতাহেতু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, সুতরাং দেওয়ালের উপরিভাগে ছাদের নিম্নে কতকগুলি ছিদ্র থাকিলে তদ্দ্বারা ঐ দূষিত বায়ু গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যায় এবং মুক্ত দরজা ও জানালা দিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার স্থান অধিকার করে।

বিশেষতঃ বিদ্যালয়, কারখানা, সভাগৃহ, নাট্যশালা, উপাসনা-মন্দির প্রভৃতি যে সকল স্থানে একত্র বহুলোক সমাগত হয়, তথাকার দেওয়ালের উপরিভাগে বহুসংখ্যক ছিদ্র এবং ঐ সকল গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত। অবশ্য গ্রীষ্মকালে রুদ্ধ গৃহে থাকিতে যেরূপ কষ্ট হয়, শীতকালে সেরূপ হয় না; কিন্তু গৃহ রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিলে তথাকার বায়ু, কি গ্রীষ্মকাল, কি শীতকাল, সকল সময়েই সমভাবে দূষিত হইয়া থাকে, সুতরাং শীতকালেও শয়ন-গৃহের কয়েকটী বায়ু-পথ উন্মুক্ত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। পৌষ মাঘ মাসে কলিকাতার বাঙ্গালী টোলায় সন্ধ্যার পর যে বাটীর প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তাহারই দরজা জানালা রুদ্ধ থাকিতে দেখা যায়, সুতরাং বাটীটি যেন পরিত্যক্ত জনশূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐ সময়ে চৌরঙ্গী মহলে দেখা যায় যে, সকল বাটীরই দরজা জানালা খোলা রহিয়াছে এবং উহাদিগকে আলোকমালায় সজ্জিত দেখিয়া মনে হয়, যে প্রত্যেক বাটীতে কোন রূপ উৎসবের আয়োজন হইতেছে। এদেশে সাহেবেরা শীতকালেও শয়ন গৃহের বায়ু-পথ এককালে বদ্ধ করিয়া রাখেন না। তাঁহারা দিবারাত্র নির্ম্মল বায়ু সেবন করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে থাকিতে দেখা যায়। আমরা দেখিতে

পাই, যে কলিকাতায় গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে রোগের প্রভাব অধিক এবং মৃত্যু-সংখ্যার আতিশয্য হইয়া থাকে। শীতকালে সমস্ত রাত্রি রুদ্ধ গৃহে বাস করিয়া বিষাক্ত বায়ু সেবন করা যে ইহার একটী প্রধান কারণ নহে তাহা কে বলিতে পারে ?

শয়নগৃহে প্রত্যেক ব্যক্তির স্থানের পরিমাণ— গৃহের মধ্যে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হইলে, তাহাদিগের শ্বাসক্রিয়া দ্বারা গৃহমধ্যস্থ বায়ু এত শীঘ্র এবং এত অধিক পরিমাণে দূষিত হয় যে, বায়ু-পথসমূহ উন্মুক্ত থাকিলেও বহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু গৃহস্থিত দূষিত বায়ুকে শীঘ্র পরিষ্কৃত করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য প্রত্যেক গৃহের মধ্যে (বিশেষতঃ শয়ন-গৃহে) কতগুলি লোক বায়ুকে অতিরিক্ত ভাবে দূষিত না করিয়া একত্র অবস্থান করিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার একটী সহজ উপায় আছে। এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত লোকের উক্ত গৃহে বাস করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, শয়ন-গৃহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কত, তাহা প্রথমতঃ নির্ণয় করিতে হইবে। মনে কর কোন একটী গৃহের দৈর্ঘ্য ২৫ ফিট্, প্রস্থ ১২ ফিট্ এবং উচ্চতা ১২ ফিট্। এক্ষণে এই সংখ্যাগুলি গুণ

করিলে যে গুণফল হইবে, তাহার দ্বারাই গৃহের মধ্যে কত বায়ু-স্থান (Air-space) আছে, তাহা নির্দ্ধারিত হয়। আমাদের উক্ত গৃহটীর আয়তন (Volume) ২৫ × ১২ × ১২ = ৩৬০০ ঘন ফিট্ (Cubic feet)। ইংলণ্ডে সৈন্যাবাস ও সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ বা রোগীর জন্য ৬০০ ঘন ফিট্ পরিমিত বায়ু-স্থান নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডের ভাড়াটিয়া বাটীগুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থানের জন্য ৩০০ ঘন ফিট্ পরিমিত বায়ু-স্থান আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে আমাদিগের বিচারাধীন গৃহটীর মধ্যে ১২ জন লোক শয়ন করিতে পরে। কিন্তু শয়ন-গৃহের পক্ষে ৩০০ ঘন ফিট্ পরিমিত বায়ু-স্থান একজন মনুষ্যের পক্ষে একেবারেই পর্য্যাপ্ত নহে; শয়ন গৃহে এরূপ অল্প পরিমাণ স্থান হইলে গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য শীঘ্র ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহারা দুর্ব্বল হয় এবং রক্তহীনতা (Anaemia) রোগ জন্মে। আমাদের কলিকাতা মিউনিসিপালিটীও ভাড়াটিয়া বাড়ীগুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ন্যূনসংখ্যা এই পরিমাণ স্থান আইন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; ইহার পরিবর্ত্তন একান্ত-আবশ্যক। সার্জ্জন্ জেনারাল্ সার্ সি পি লিউকিস্ তাঁহার ট্রপিকাল্ হাইজিন্ নামক গ্রন্থে

ভারতবর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শয়ন-গৃহে ১০০০ ঘন ফিট্ (অর্থাৎ ১০×১০×১০) পরিমিত বায়ু-স্থানের ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সকল অবস্থায় যদি ১০০০ ঘন ফিটের সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ৬০০ ঘন ফিট্ বায়ু-স্থানের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, সাধারণ লোকের বাটীর গৃহগুলির উচ্চতা প্রায় ১০ হইতে ১২ ফিট্ হইয়া থাকে। সুতরাং গৃহের উচ্চতা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা গৃহের শুদ্ধ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গণনা করি, তাহা হইলে আইন অনুসারে যে ৩০০ ঘন ফিট্ পরিমিত স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে একজনের ৩০ বর্গ ফিটের (Square feet) অধিক পরিমাণ স্থান অধিকার করিবার সুবিধা হয় না অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ৬ ফিট্ এবং প্রস্থে ৫ ফিটের অধিক স্থান তাহার অংশে পড়ে না, কারণ ৬×৫=৩০×১০ ফিট্ উচ্চতা=৩০০ ঘন ফিট্। ৩০ বর্গ ফিট্ পরিমিত স্থান একজনের পক্ষে যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শয়ন-গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্ততঃ ৬৪ বর্গ ফিট্ (৮ ফিট্ দৈর্ঘ্য × ৮ ফিট্ প্রস্থ) পরিমিত স্থানের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ডাক্তার লিউকিস্ শয়ন-গৃহে প্রত্যেক লোকের জন্য ১০০ বর্গ ফিট্

(অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ১০ ফিট্ × প্রস্থ ১০ ফিট্) পরিমিত স্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। গৃহের মধ্যে গৃহসজ্জা (Furniture) যত অধিক থাকিবে, ঐ গৃহের বায়ুস্থান ততই কমিয়া যাইবে। এজন্য শয়ন-গৃহে গৃহসজ্জার পরিমাণ যত অল্প হয়, উহা ততই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল। শয়ন-গৃহের মধ্যে আলমারি, বাক্স, সিন্দুক, টেবিল্, চেয়ার প্রভৃতি যত অল্প থাকে, ততই ভাল।

আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে রাত্রিকালে গৃহমধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিলে গৃহের বায়ু দূষিত হয়। অনেক সময়ে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া গৃহে দীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়, সুতরাং শয়ন-গৃহের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির যে পরিমাণ স্থানের (৬৪ বর্গ ফিট্) উল্লেখ করা গিয়াছে, যাহাতে কোনক্রমে তাহার কম না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে গৃহের মধ্যে যে কোন আলোকই জ্বলুক না কেন, তাহা দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে; কেবল ইলেক্‌ট্রিক্ আলোক দ্বারা বায়ু দূষিত হয় না।

গৃহমধ্যে "টানা পাখা" অথবা "ইলেকট্রিক্ ফ্যান্" চালাইলে বায়ু সঞ্চালনের পক্ষে কিয়ৎ-পরিমাণে সুবিধা হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহ রুদ্ধ থাকিলে বায়ু-প্রবাহের

অভাবে পাখা দ্বারা কেবল ঘরের বায়ুরই নাড়াচাড়া হইয়া থাকে, তাহা পরিষ্কৃত হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না। তবে তদ্দ্বারা দেহ-নিঃসৃত ঘর্ম্ম শীঘ্র শুকাইয়া যায় বলিয়া শরীর শীতল হয় এবং এই জন্য পাখার বাতাস গ্রীষ্মকালে আরাম-দায়ক হইয়া থাকে।

রন্ধনশালা, গোশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ—আমরা সচরাচর বাটীর নিম্নতলে সুবিধামত যে কোন একটী গৃহে রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। ইহাতে বাটীর মধ্যে সকালে ও বৈকালে উনানে আগুন দিবার সময় এত অধিক ধুঁয়া হয় যে, সে সময়ে বাটীতে থাকা অনেকের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত এই ধূমের জন্য বস্ত্রাদি অতি সত্বর মলিন হইয়া যায়। রন্ধনশালা বসতবাটী হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত এবং তন্মধ্য হইতে ধূম নির্গমনের জন্য সুবন্দোবস্ত করা উচিত। পল্লীগ্রামে গৃহস্থ লোকের বাটীতেও রন্ধন-শালা বাসগৃহ হইতে অল্প দূরে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহাতে ধুঁয়া, ছাই ইত্যাদি দ্বারা বাসগৃহ ও বস্ত্রাদি মলিন হয় না এবং যাঁহারা রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন৷ তাঁহাদিগকে ধুঁয়ার জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। কলিকাতায় স্থানাভাব-বশতঃ স্বতন্ত্র স্থানে পাকশালা প্রস্তুত করিবার সর্ব্বদা

সুবিধা হয় না। এরূপ স্থলে বাটীর উপরতলে (ছাদের উপর) পাকশালা নির্ম্মাণ করিলে, ধূঁয়ার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। যাঁহারা নূতন বাটী প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা যেন উনানের সহিত একটী চিম্‌নির বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে নীচের তলে রান্নাঘর হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, চিম্‌নি দিয়া সমস্ত ধূঁয়া উপর দিকে উঠিয়া যাইবে। ধূম নির্গমনের জন্য রান্নাঘরের মধ্যে ছাদের নিম্নে দেওয়ালের উপর ছিদ্র রাখা হইয়া থাকে; অভাবপক্ষে এগুলি ভাল, তবে চিম্‌নি দ্বারা ধূম যেরূপ সহজে বাহির হইয়া যায় এবং রান্নাঘরের মধ্যে ও বাটীর অন্যান্য স্থানে জমিয়া থাকে না, এই ছিদ্রগুলি দ্বারা সেরূপ হয় না।

রান্নাঘরটী গোশালা, অশ্বশালা বা পাইখানার নিকট অবস্থিত হওয়া উচিত নহে। ইহাতে ঐ সকল স্থান হইতে দূষিত বায়ু রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাদ্যদ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত এরূপ স্থানে রান্নাঘর অবস্থিত হইলে তন্মধ্যে মাছির উপদ্রব হইতে দেখা যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মাছি দ্বারা রোগোৎপাদক বীজাণু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়; ঐ সকল মাছি খাদ্যদ্রব্যের উপর

বসিলে, উহা বীজাণু-দুষ্ট হয় এবং উহার ব্যবহারে নানারূপ সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়। মাছি তাড়াইবার জন্য রান্না-ঘরের জানালাগুলি সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবৃত হওয়া উচিত এবং দরজায় একখানি চিক্ ফেলিয়া রাখা আবশ্যক। রান্নাঘরের নিকট তরকারির খোসা, মাছের আঁইস, ভাতের ফেন এবং অন্য কোন আবর্জ্জনা সঞ্চিত করিয়া রাখা উচিত নহে; ইহাতে রান্নাঘরের মধ্যে মাছির উপদ্রব হইয়া থাকে।

গোশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী রাখিবার স্থান বাটী হইতে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত। কলিকাতায় অনেক বাটীতে নিম্নতলে গোশালা বা অশ্বশালা অবস্থিত আছে এবং উপরতলে অধিবাসিগণ বাস করিয়া থাকেন; ইহা যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর প্রথা, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। এরূপ ব্যবস্থায় গৃহবাসিগণকে সতত গোশালা বা অশ্বশালা হইতে উদ্ভূত দূষিত বাষ্প-মিশ্রিত বায়ু সেবন করিতে হয়। গোশালা বা অশ্বশালার মেঝে "পাকা" হওয়া উচিত এবং উক্ত গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর না রাখিয়া উহা সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। গৃহের "চাল" দুধারে একটু বেশী গড়ানে হইলে, রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে পশুগণ সুন্দরভাবে রক্ষিত

হইতে পারে, অথচ চতুর্দ্দিক্ খোলা থাকিবার জন্য তন্মধ্যে বায়ুসঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় না। গৃহের মেঝে একদিকে একটু ঢালু থাকিবে এবং গৃহের বাহিরে "পাকা" নর্দ্দামা প্রস্তুত করিয়া যাহাতে মল-মূত্রাদি দূরে চলিয়া যাইতে পারে (অর্থাৎ নিকটস্থ জমিতে না শোষিত হয়), তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত।

আবর্জ্জনাদি স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা— পল্লীগ্রামে বাসগৃহ হইতে বহুদূরে ভূমি খনন করিয়া মল, মূত্র ও অন্যান্য আবর্জ্জনা তন্মধ্যে প্রোথিত করা উচিত। কালে এই সকল পদার্থ উৎকৃষ্ট "সারে" পরিণত হয় এবং তখন উহা কৃষিকার্য্যের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

"পাইখানা" বাসগৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। "পাইখানার" উপরের ও নীচের মেঝে সিমেণ্ট্ দ্বারা "পাকা" করিয়া লওয়া উচিত এবং বায়ু ও আলোক প্রবেশের জন্য তন্মধ্যে ২টী জানালা রাখা উচিত। যে "পাইখানা"য় একটী দরজা ব্যতীত অন্য কোন বায়ুপথ থাকে না, তাহা সর্ব্বদা ভিজা ও দুর্গন্ধময় হইতে দেখা যায়। যদি ড্রেনের "পাইখানা" না হয়, তাহা হইলে উহার মধ্য হইতে মেথর যাহাতে মল সহজে স্থানান্তরিত করিতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করা একান্ত

আবশ্যক। নীচের স্থান সংকীর্ণ হইলে, মেথর উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভালরূপে পরিষ্কার করিতে পারে না, সুতরাং চিরদিন পাইখানার নিম্নদেশ নিতান্ত অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় রহিয়া যায়। "পাইখানার" নিম্নতলে মেথরের "খাটিবার" দরজা ব্যতীত আর একটী ছোট বায়ু-পথ রাখা উচিত; তাহা হইলে উহার মধ্যে সর্ব্বদা আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিয়া উহাকে শুষ্ক রাখিবে এবং উহার দুর্গন্ধও যথেষ্ট-পরিমাণে কমিয়া যাইবে। "পাইখানার" জল "পাকা" নর্দ্দামা দিয়া বাটী হইতে দূরে যাহাতে নিকাশ হইয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। "পাইখানার" গাম্‌লা বা বাল্‌তিগুলিতে মাঝে মাঝে আল্‌কাতরা মাখান হইলে উহারা পরিষ্কৃত থাকে এবং মাটীর গামলার মধ্যে মলমূত্রাদি শোষিত হইতে পারে না।

মল পরিত্যাগের পর তদুপরি কিছু পরিমাণ শুষ্ক মাটী চাপা দিলে তাহার দুর্গন্ধ নিবারিত হয় এবং "খাটা" পাইখানার অসুবিধা হইতে অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

প্রতি বৎসর একবার করিয়া বাটী চূণকাম (Lime-washing) করিলে ভাল হয়। যদি বাটীতে কোন সংক্রামক রোগ হয় তাহা হইলে রোগ-মুক্তির পর প্রথমতঃ গৃহের মধ্যে গন্ধক জ্বালাইয়া পরে সমস্ত বাটী (দেওয়াল ও ছাদের নিম্নতল

পর্য্যন্ত) ফেনাইল্ (Phenyle) বা অন্য বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া চূণকাম করিয়া লওয়া উচিত।

বাটীর নিকটে দুই চারিটী ছোট গাছ এবং ফুল গাছ থাকিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই, কিন্তু বেশী গাছ-পালা বা কোন বৃহৎ বৃক্ষ বাটীর নিকটে থাকিলে বায়ু-সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় এবং অনেক সময়ে ছোট গাছপালার জন্য মশকের উপদ্রব হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

মাটীর ঘর—মাটীর ঘর নির্ম্মাণ করিতে হইলে, প্রত্যেক গৃহে অধিক-সংখ্যক বায়ু-পথ রাখা এবং সেগুলি পরস্পর ঋজু হওয়া উচিত। জানালাগুলি উচ্চতায় ও প্রস্থে তিন ফিটের কম হওয়া উচিত নহে। মাটীর গৃহে অধিক-সংখ্যক বায়ু-পথ না থাকিলে, প্রচুর-পরিমাণ আলোক ও বায়ুর অভাবে গৃহ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। মেঝে, চতুর্দ্দিকের ভূমি হইতে যথেষ্ট উচ্চ হওয়া উচিত এবং সিমেণ্ট্ দ্বারা "পাকা" করিয়া লইলেই ভাল হয়। যদি মাটীর মেঝে হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে উহা হইতে কয়েক ইঞ্চি মাটী তুলিয়া নূতন মাটী দিয়া পিটিয়া তদুপরি "লেপ" দেওয়া উচিত। অধিকাংশ স্থলে "গোবর মাটীর" লেপ্ দেওয়া হইয়া থাকে এবং ইহাতে কোন ক্ষতি হইতে দেখা যায়

না। তবে পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ গোবরের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বলেন যে, মেঝেয় গোবর দিলে মেঝে ভিজা থাকে এবং গৃহে কীটাদির উপদ্রব হয়। আমি পল্লীগ্রামবাসী অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, মেঝেয় গোবর-মাটীর লেপ দিলে জমী ভিজা থাকে না এবং কীটাদিরও উপদ্রব হয় না। তাঁহারা আরও বলেন যে, গোবরের লেপ্ দ্বারা দেওয়ালের "লোণা" নিবারিত হইয়া থাকে। গোবর পচন-নিবারক বলিয়া এ দেশের অনেক লোকের বিশ্বাস। ইহার পচন-নিবারক গুণ আছে কি না তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে পরীক্ষিত হয় নাই। তবে আস্তাকুঁড়, মুত্‌কুড় প্রভৃতি যে সকল স্থানে ময়লা ও আবর্জ্জনা সর্ব্বদা সঞ্চিত হইয়া দুর্গন্ধ উৎপাদন করে, টাট্‌কা গোবর জলের সহিত মিশাইয়া ঢালিয়া দিলে দুর্গন্ধ যে শীঘ্র নিবারিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। গৃহের 'চাল' একটু উচ্চ হওয়া উচিত, নহিলে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। বিশেষতঃ গৃহের ছাদ বা 'চাল' নীচু হইলে, গৃহটী গ্রীষ্মকালে বেশী গরম এবং শীতকালে বেশী শীতল হয়। গৃহের দেওয়ালগুলিতে চুণফিরাইয়া দেওয়া উচিত এবং মধ্যে মধ্যে চুণকাম বদলান কর্ত্তব্য। গৃহের "চাল" উচ্চ হইলে, এবং চতুঃপার্শ্বে প্রশস্ত

'দাওয়া' থাকিলে গৃহগুলি বেশ সুশীতল থাকে। বাটীর চতুঃপার্শ্বের জমীতে যাহাতে আবর্জ্জনা ও মলিন জল সঞ্চিত না হইতে পারে (কারণ যে কোন স্থানে জল বদ্ধ থাকিলেই গৃহ আর্দ্র হইবে এবং সেই স্থানে মশকের প্রাদুর্ভাব হইবে), এবং বৃষ্টির জল ভূমির মধ্যে শোষিত না হইয়া যাহাতে সহজে বাটী হইতে দূরে নিকাশ হইয়া যাইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা উচিত। মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার স্থান বাটী হইতে দূরে নির্ম্মাণ করিবে এবং যাহাতে ঐ সকল দূষিত পদার্থ শীঘ্র দূরে স্থানান্তরিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবে। মল-মূত্রাদি মাঠের মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্য প্রোথিত করিয়া যথেষ্ট-পরিমাণ শুষ্ক মাটী দ্বারা উহা চাপা দেওয়া উচিত।

ভূমি নিতান্ত আর্দ্র হইলে, কাঠ বা বাঁশের 'মাচান' করিয়া তাহার উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।

জল নিকাশের ব্যবস্থা—কলিকাতায় বাঙ্গালী-টোলায় পূর্ব্বে প্রায় সকল বাটীর মধ্যে ড্রেণের পিট্ দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে নূতন প্রণালী মতে ড্রেণ্ নির্ম্মিত হয় বলিয়া এই অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। বাটীর মধ্যে সর্ব্বত্র 'পাকা' নর্দ্দামা (Surface drain) করিয়া সেগুলিকে বাটীর

বাহিরে ড্রেণের সহিত সংযুক্ত করা উচিত। বাটীর মধ্যে ড্রেণের পিট্ থাকিলে, উহা হইতে দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হইয়া গৃহস্থিত বায়ুকে সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত রাখে এবং ইহা দ্বারা নানাবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সুবৃহৎ অট্টালিকাই হউক আর ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরই হউক, উহার অভ্যন্তর ও বহিঃপ্রদেশ সর্ব্বদা শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিবে। যে গৃহগুলি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, সেগুলিও প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা কাল খুলিয়া রাখিবে। গৃহের কোন স্থানে বা কোন গৃহসজ্জার উপর ধূলা জমিতে দিবে না। অনাবশ্যক কাঠ কুট্রা, ভাঙ্গা বোতল, টিন্ বা মাটীর বাসন, পুরাতন বিছানা বা কাগজপত্রাদি বাটীর কোন স্থানে সঞ্চিত হইতে দিবে না; ইহাতে বাস-গৃহের মধ্যে ইঁদুর, বিছা, মাকড়সা ও মশার আশ্রয় লইবার বড় সুবিধা হয়। প্রয়োজন না থাকিলে ঐ সকল অব্যবহার্য্য পদার্থ পোড়াইয়া ফেলিবে। সর্ব্বদা জল ঢালিয়া বাড়ী ধুইলে, গৃহগুলি স্যাঁৎসেতে হয়, ইহাতে বালকবালিকা-দিগের সর্দ্দি কাসি সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা। ভিজা কাপড় দিয়া ঘরের মেঝে মুছিয়া ফেলিলে, উহা শুকাইতে বিলম্ব হয় না। তবে মাঝে মাঝে বাসগৃহ জল দিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত।

বাটীর চতুঃপার্শ্বে "আগাছা" জন্মিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিবে, এবং বাটীর আবর্জ্জনা সমূহ এক স্থানে জমা করিয়া "ময়লা"র গাড়ী আসিবামাত্র তাহা স্থানান্তরিত করিবে অথবা দূরস্থিত মাঠে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া ফেলিবে। বাটীর মধ্যে যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবে না, থুথু ফেলিবার জন্য দুই এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট পাত্র রাখিয়া দিবে। এক কথায় বাটীখানিকে ছবিখানির মত করিয়া রাখিবে; ইহাতে গৃহবাসীদিগের চিত্ত এবং যাঁহারা বাটীতে শুভাগমন করিবেন, তাঁহাদেরও মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবে।

সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি প্রতিপালন করিলেও কোন' সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সময়ে আমরা অনেক স্থলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই না। সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার যে সকল কারণে ঘটিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই আমাদিগের এই দুরবস্থার প্রধান কারণ। সুতরাং লোক-সমাজে যাহাতে এই সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিতে পাই যে, পরিবারের মধ্যে একজনের কোনরূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে, একটীর পর আর একটী করিয়া বাটীর সমস্ত লোকেই ক্রমে ক্রমে ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ক্রমে পল্লীর মধ্যে ঐ রোগ ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে উহা মহামারীর আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। কতকগুলি বিষয়ে সাবধান হইলে, এই সকল রোগের

আক্রমণ হইতে আমরা আত্মরক্ষা করিতে এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যেও উহাদিগের পরিব্যাপ্তি কতকাংশে নিবারণ করিতে সমর্থ হই। প্রত্যেক গৃহস্থ এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিলে, পল্লীর মধ্যেও এই রোগের বিস্তৃতি-লাভের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং এইরূপ কার্য্য দ্বারা কেবল যে নিজের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা নহে, প্রতিবেশী সমাজকেও নানারূপ অসুবিধা, ক্লেশ ও বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে, এইরূপ বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

প্রথমতঃ সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে এবং কিরূপে উহার উৎপত্তি হয়, তাহাই আমাদের ভালরূপে জানা উচিত। রোগের প্রকৃত কারণ জানা না থাকিলে, উহার নিবারণের চেষ্টা করা বৃথা হইয়া থাকে এবং এই জন্য আমরা অনেক সময়ে অর্থনাশ, অসুবিধা ও মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকি।

চক্ষুর অগোচর কতিপয় নিম্নশ্রেণীর বিশেষ বিশেষ জীব বা উদ্ভিদ্ জাতীয় পদার্থ আমাদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইয়া

থাকে। অণুবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের কতকগুলির আকৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পর্শ দ্বারা, অপরগুলি স্পর্শ ব্যতীত অন্য উপায়ে, রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চুলকনা, খোস-পাঁচড়া, দাদ, হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সমূহ, রোগীর সংস্পর্শে বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও শয্যাদির স্পর্শ দ্বারা, অথবা বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হইয়া, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। যক্ষ্মার বীজ রোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মার মধ্যে বিদ্যমান থাকে ; উহা শুষ্ক হইলে পর উহার সূক্ষ্মাংশ ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুদ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয় এবং খাদ্য বা নিশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা উৎপাদন করে। কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ মনুষ্যের শরীর হইতে বমন বা মলের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া যদি পানীয় জল বা খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হয় এবং উক্ত জল বা খাদ্য কোন প্রকারে আমাদের উদরস্থ হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ সকল সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। ডিপ্থিরিয়া রোগের বীজ একজন রোগীর গলদেশ হইতে বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া অপর রোগীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এবং

এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করিয়া, স্বল্পকালের মধ্যে সাংঘাতিক রোগ উৎপাদন করে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগের বীজ (এক প্রকার কীটাণু) স্পর্শ দ্বারা অথবা পানীয় জল বা দূষিত খাদ্য সহযোগে একের শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহাদিগের বীজ কোনরূপে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইলে উহাদিগের পরিব্যাপ্তি অসম্ভব। ম্যালেরিয়া রোগের বীজ রোগীর রক্তের মধ্যে অবস্থিতি করে। এক জাতীয় মশকী দংশন কালে রোগীর শরীর হইতে শোষিত রক্তের সহিত উহা উঠাইয়া লয়। পরে উক্ত কীটাণু ঐ মশকীর দেহাভ্যন্তরে পুষ্টিলাভ করে এবং উহা যখন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে, তখন তাহার শরীরে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ইয়োলো ফিভার্ (Yellow fever), ফাইলেরিয়েসিস্ (Filariasis), কাল-নিদ্রা (Sleeping Sickness) প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ বিভিন্নজাতীয় মশক, মক্ষিকা বা পোকার দংশন দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লেগ্ রোগ ইন্দুরের দেহে অবস্থিত এক প্রকার পোকার (Rat-flea) দংশন দ্বারা মনুষ্যের শরীরে সংক্রামিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে আসামের সাংঘাতিক কালাজ্বর (Kala-azar) ছারপোকা

দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। জলাতঙ্ক রোগের (Hydrophobia) বীজ ক্ষিপ্ত কুকুর শৃগাল প্রভৃতির লালার (Saliva) মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যখন ঐ কুকুর মনুষ্য বা অপর প্রাণীকে দংশন করে, তখন উক্ত রোগের বীজ লালার সহিত তাহার ক্ষতস্থানের রক্তের সহিত একেবারে মিশ্রিত হইয়া যায়।

বহুশ্রমসাধ্য গবেষণার দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড ফিভার্, যক্ষ্মা, প্লেগ্, ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি অনেকানেক সংক্রামক রোগের বীজের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল বীজ বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিজ্জাতীয়। ইহারা চক্ষুর অগোচর, অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টি গোচর হয় না। ইহাদিগের একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, মনুষ্য দেহে প্রবেশ করিবার পর অনুকূল অবস্থা পাইলে ইহাদিগের এক একটী অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য উদ্ভিদণুতে পরিণত হয় এবং সেই সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) উৎপাদন করে। ইহাই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে। হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ কিরূপ, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ঐ সকল রোগে যখন "ছাল' উঠিতে আরম্ভ হয়, সেই ছালের মধ্যে ঐ সকল রোগের বীজ

নিহিত থাকে এবং বায়ু, বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, রোগের বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই যে উক্তরোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যে কোন রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক স্বাভাবিক শক্তি (Natural immunity) আমাদের শরীরের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। নানা কারণে এই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথোচিত পুষ্টিকর আহারের অভাবে, অত্যধিক পরিশ্রম বা অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক অত্যাচারের ফলে, অথবা স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতিকূল অবস্থায় থাকিলে, এই শক্তি যথোচিত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় কোন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে, উহা অবাধে বিষ-ক্রিয়া প্রদর্শন করে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যাহারা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে অথবা যাহারা যথেষ্ট-পরিমাণ পুষ্টিকর আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না, তাহারাই অধিক সংখ্যায় উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি পালন করিলে এই শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হয়, সুতরাং

রোগ-বিস্তৃতির মধ্যে বাস করিয়াও লোকে অনেক সময় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

পুনশ্চ বসন্ত প্রভৃতি এমন কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে, যাহা একবার হইলে প্রায় আর পুনরায় হইতে দেখা যায় না (Acquired immunity)। এস্থলে বলা উচিত যে যে কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রোগমুক্ত ব্যক্তির পুনরায় ঐ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্, প্লেগ্ প্রভৃতি রোগে এই রক্ষণশীল অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

উপর্য্যুক্ত তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া কতকগুলি সংক্রামক রোগের বীজকে আমাদের পরীক্ষাগারে কৌশলক্রমে অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করাইয়া, উহাদিগের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে পারা যায় যে তদবস্থায় উহারা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ঐ সকল রোগ প্রতিষেধ করিতে সমর্থ হয়। রোগের বীজ এইরূপে ব্যবহৃত হইলে উহাকে "টিকা" দেওয়া কহে। এতদ্দ্বারা ঐ সকল রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে স্বল্প বা দীর্ঘকালের জন্য অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। বসন্ত রোগের "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিকাংশ স্থলেই বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে দেখা

যায়; এইজন্য যাহাদের একবার বসন্ত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে প্রায় দেখা যায় না। প্লেগ্, টাইফয়েড্ ফিভার্, কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্যও এইরূপ "টিকার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল রোগে "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিক দিন বিদ্যমান না থাকিলেও, যে সময়ে উহারা মহামারীরূপে আবির্ভূত হয়, তখন "টিকা" লইলে উহাদিগের আক্রমণ হইতে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে পরে দুই চারিটী কথা বলিব।

সংক্রামকতা-বাহক কীটাদি।—মশা, মাছি প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র প্রাণীর সাহায্য সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি সাধিত হয়; ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে, অপরগুলি পরোক্ষভাবে রোগ-বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকে। মশক প্রভৃতি কতকগুলি কীট দংশন দ্বারা রক্তের সহিত রোগের বীজ মিশ্রিত করিয়া দেয়। সাধারণ মাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণীসমূহ প্রত্যক্ষভাবে শরীরের মধ্যে রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয় না; তাহারা পদ, শুঁয়া, ডানা বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা রোগের বীজ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এই অবস্থায়

উহারা আমাদিগের খাদ্যাদির সংস্রবে আসিলে তাহা রোগের বীজ সংলগ্ন হইয়া যায়। ঐ খাদ্য আমাদিগের উদরস্থ হইলে আমরা ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি।

১। **মশক** (Mosquitoes)—ইহাদিগের মধ্যে বিস্তর জাতিবিভাগ আছে। অবশ্য সকল জাতি মশকই রোগ-বিস্তারের সহায়তা করে না। এনোফিলিস্ (Anopheles) জাতীয় মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বর, কিউলেক্স্ (Culex) জাতীয় মশকের দ্বারা কাইলিউরিয়া (Chyluria), গোদ প্রভৃতি রোগ ও ডেঙ্গু এবং ষ্টেগোমিয়া (Stegomia) জাতীয় মশকের দ্বারা ইয়েলো ফিভার্ (Yellow fever) এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত এনোফিলিস্ জাতীয় মশকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে দূষিত জলপান, দূষিত বায়ুসেবন প্রভৃতি যে সকল কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইত, এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে একটীও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকৃত কারণ নহে। যেখানে মশা নাই, সেখানে ম্যালেরিয়াও নাই, ইহাই বর্ত্তমান-বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, স্ত্রী-মশকদিগের জিঘাংসাবৃত্তি অতিশয় প্রবল। মশকীরাই রক্ত শোষণ করে এবং ইহাদিগের দংশন দ্বারাই ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার ঘটিয়া থাকে। মশক বেচারিরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

২। **মিজেস্** (Midges)—ইহারাও মশকজাতীয় কিন্তু মশক অপেক্ষা আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র। ইহাদের খাদ্য গলিত উদ্ভিদ্। ইহাদের মধ্যে জাতি-বিভাগ আছে এবং প্রায় সকল-গুলিই জলের মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহারা দংশন দ্বারা পেলাগ্রা (Pellagra —আমবাতের ন্যায় রোগবিশেষ) নামক রোগ-বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকে।

৩। **সাণ্ড-ফ্লাই** (Sand-fly)—ইহারা আকৃতিতে মশকের ন্যায় কিন্তু আয়তনে তদপেক্ষা এত ছোট যে, "নেটের" মশারির ছিদ্র দ্বারাও ইহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া বড় জ্বালাতন করিয়া থাকে। মশকীর ন্যায় ইহাদিগের স্ত্রীজাতিই দংশন-পটু এবং দংশন দ্বারা তিন হইতে পাঁচ দিন স্থায়ী এক প্রকার জ্বররোগের (Phlebotomom or Three days fever) বীজ রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। অন্ধকারময় শীতল আর্দ্র স্থানে ইহারা দিবাভাগে থাকিতে ভালবাসে। তরকারীর খোসা ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আবর্জ্জনা

ইহাদিগের প্রধান আহার ; যে সকল স্থানে এইরূপ আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হয়, তথায় ইহারা অবস্থিত করে এবং ডিম পাড়ে। অতএব এই জাতীয় আবর্জ্জনা যাহাতে বাটীর সন্নিকটে সঞ্চিত না থাকে, তাহার উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। ফ্লী (Flea)—ইহারা এক জাতীয় পোকা ; ইহাদিগের ডানা নাই। ইহাদিগের মধ্যে নানা জাতিবিভাগ আছে। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি গৃহপালিত পশুর শরীরে এই জাতীয় পোকা বাস করিতে দেখা যায় কিন্তু উহাদিগের দ্বারা মানুষের কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। যে জাতীয় পোকা ইন্দুরের শরীরে বাস করে (Rat-flea), তাহারাই দংশন দ্বারা প্লেগগ্রস্ত ইন্দুরের শরীর হইতে মনুষ্য শরীরে প্লেগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকা মহাদেশে সাণ্ড ফ্লী (Sand-flea) বা চিগর্ (Chigger) নামক এই জাতীয় পোকাকে বালুকাময় ভূমির মধ্যে বাস করিতে দেখা যায় ; ইহাদিগের দংশনে একপ্রকার ক্ষত রোগ ও জ্বর উৎপন্ন হয়। এক্ষণে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে এই পোকার আবির্ভাব দেখা দিয়াছে।

৫। ছারপোকা (Bed-bug)—কোন কোন চিকিৎসকের মত এই যে আসামের বিষম কালাজ্বর (Kala-azar) ছারপোকার দংশন দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির

শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তবে এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কুষ্ঠ রোগও ছারপোকা দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক, বিছানা মাদুরে অথবা বসিবার আসনাদিতে ছারপোকা যাহাতে কোন মতে থাকিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ছারপোকা একবার জন্মিলে তাহা নির্ম্মূল করা বড়ই কঠিন ব্যাপার—বিশেষতঃ ইহারা বহুদিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া (অর্থাৎ রক্তপান না করিয়াও) বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

৬। **টিক্‌স্** (Ticks)—ইহারা মাকড়সা জাতীয় অতি ক্ষুদ্র পোকাবিশেষ; ইহারাও ছারপোকার ন্যায় বহুদিন উপবাসী থাকিতে পারে। ইহারা মেঝের ফাটলে বা দেওয়ালের ফাটলের মধ্যে দিবাভাগে লুক্কায়িত থাকে এবং ছারপোকার ন্যায় রাত্রিকালে বাহির হইয়া মনুষ্যকে দংশন করে। ইহাদিগের দংশনে রিলাপ্সিং ফিভার্ (Relapsing fever), মিয়ানা (Miana) প্রভৃতি কতকগুলি রোগ একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৭। **টেট্‌সী-ফ্লাই** (Tse-Tse fly)—আফ্রিকা মহাদেশের স্থানবিশেষে ইহারা বাস করে। ইহারা মক্ষিকা জাতীয়। ইহারা দিবাভাগেই উপদ্রব করে এবং স্ত্রীপুরুষ

উভয় জাতিই দংশন দ্বারা রক্ত শোষণ করিয়া লয়। ইহাদিগের দংশনে সাংঘাতিক "কালনিদ্রা" (Sleeping sickness) নামক রোগের বীজ (Trysanosomes) এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী উগাণ্ডা (Uganda) প্রদেশে বহু-সংখ্যক লোক এই মক্ষিকার দংশন দ্বারা "কালনিদ্রায়" অভিভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে।

৮। **সাধারণ মক্ষিকা** (House-fly)—আমাদিগের বাটীর মধ্যে সচরাচর ফেকাসে রংয়ের ছোট মাছি ও নীল রংয়ের বড় মাছি দেখিতে পাই। ইহাদের কোনটীই দংশন করে না, সুতরাং ইহারা প্রত্যক্ষভাবে রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে কোন রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয় না। তবে ইহারা রোগের বীজ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পদ বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে পরোক্ষভাবে রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করে। টাইফয়েড্ জ্বর বা কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত মলাদির উপর এই সকল মক্ষিকা বসিলে উহাদিগের পদদেশে ঐ সকল রোগের বীজ বহুল পরিমাণে সংলগ্ন হইয়া যায়। অতঃপর ঐ সকল মাছি তদবস্থায় আমাদিগের খাদ্য-দ্রব্যে উপবেশন করিলে উহাদিগের পদসংলগ্ন রোগের বীজ

খাদ্যের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যায় এবং ঐ দূষিত খাদ্য আমাদিগের উদরস্থ হইলে আমরা ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। যক্ষ্মা রোগের বীজও মক্ষিকা সাহায্যে এইরূপে স্থানান্তরে পরিবাহিত হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ কোন খাদ্য-দ্রব্যে মাছি বসিলে ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে উহার পেট হইতে একপ্রকার আঠাল পদার্থ খাদ্যদ্রব্যের উপর উদ্গার করিয়া দেয়, এই উদ্গীর্ণ পদার্থের মধ্যে বিবিধ সংক্রামক রোগের বীজ অবস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বাটীর মধ্যে, বিশেষতঃ রান্না ঘরে, যাহাতে মাছির উপদ্রব না হয় এবং উহারা যাহাতে কোন মতে কোন খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যথোচিত সাবধান হওয়া উচিত। একটী স্ত্রী-মক্ষিকা তাহার জীবনে ৪৩০০০০ হইতে ৮৪০০০০ পর্য্যন্ত মাছি প্রসব করিতে পারে।

অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, বাড়ীর নিকটে কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব না থাকিলেও পরিবারের মধ্যে কাহারও সহসা সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে; এরূপ স্থলে যথোচিত সাবধানতা সত্ত্বেও আমাদিগের অজ্ঞাত-সারে মক্ষিকা দ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি হওয়া অসম্ভব নহে। অনেক সময়ে শুনা যায় যে, দোকানের খাবার খাইয়া "কলেরা" হইয়াছে। দোকানে যেরূপ ভাবে খাদ্যদ্রব্য

সাজাইয়া রাখা হয় এবং তজ্জন্য তাহার উপর যেরূপ মাছির উপদ্রব হইয়া থাকে, তাহাতে যাঁহারা বাজারের খাবার ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সর্ব্বদা সম্ভাবনা। খাবার সর্ব্বদা ঢাকা দিয়া রাখিলে এরূপ বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই জন্য কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় বাজারের খাবার কোন মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে। গলিত ফলমূল এবং পচা মাছ মাংসাদি ব্যতীত মনুষ্যের ও গৃহপালিত পশুদিগের বিষ্ঠাও মাছির প্রধান খাদ্য, সুতরাং ইহারা যে তন্মধ্যস্থিত রোগের বীজ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে অথবা আপনাদের উদরের মধ্যে উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এই কথাটি সর্ব্বদা আমাদিগের মনে থাকিলে বোধ হয় আমরা মাছির উপদ্রব নিবারণ করিতে কখনই অমনোযোগী হইব না।

৯। **পিপীলিকা** (Ants)—ইহারাও প্রত্যক্ষভাবে রোগ-বিস্তারের সহায়তা করে না, তবে সাধারণ মক্ষিকার ন্যায় রোগের বীজ বহন করিয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া ইহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। আমাদিগের গৃহিণীরা খাবারে "পিঁপড়া ধরা" বড় একটা দোষের কথা মনে করেন না, পিঁপড়া ঝাড়িয়া সেই খাবার বালকবালিকা-

দিগের হাতে দিতে কোনরূপ দ্বিধা প্রকাশ করেন না। অবশ্য অনেক স্থলে ইহা দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত না হইলেও স্থলবিশেষে মহা অনর্থপাত হইতে পারে। সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য যাহাতে পিপীলিকা সংলগ্ন না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান লইলে এরূপ বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনা থাকে না। খাদ্য-দ্রব্যের পাত্র জলপূর্ণ অন্য পাত্রের উপর বসাইয়া রাখিলে পিপীলিকার উপদ্রব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। পুনশ্চ তদুপরি সূক্ষ্ম জালের ঢাকা চাপা দিলে মাছির উপদ্রবেরও আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যেক বাটীতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের এইরূপ সুব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

খোসের পোকা (Itch-insect)—খোস পাঁচড়া একপ্রকার মাকড়সা জাতীয় পোকার আক্রমণে উৎপন্ন হয়। ইহারা রক্ত শোষণ করে না, তবে স্পর্শ দ্বারা অথবা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, গাত্রমার্জ্জনী বা শয্যা দ্বারা একের শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এই জাতীয় পোকা দ্বারা কুষ্ঠ রোগও বিস্তৃতি লাভ করে।

উকুণ (Pediculidæ)—ইহাদিগকে মস্তকের কেশের মধ্যে এবং গায়ের রোমের গোড়ায় অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। রক্তবীজের ন্যায় ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। একটী স্ত্রী-উকুণকে ২ মাসের মধ্যে ১০০০০ হাজার উকুণ-

শাবক উৎপাদন করিতে দেখা গিয়াছে। গায়ের উকুণ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সহজে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহা দংশন দ্বারাও রিলাপ্সিং ফিভার্ (Relapsing fever) নামক জ্বরের বীজ রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। উকুণ মাথায় বা গায়ে জন্মিলে বুঝিতে হইবে যে সেই ব্যক্তি নিতান্ত অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে,ইহা যে নিতান্ত লজ্জা ও নিন্দার বিষয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত অপর কয়েকজাতীয় কীটও রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করিয়া থাকে; বাহুল্য ভয়ে তাহাদিগের বিষয় এস্থলে বর্ণিত হইল না।

শুশ্রূষার ব্যবস্থা—বাটীর মধ্যে কাহারও কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে, যেরূপে তাহার শুশ্রূষা করিলে ঐ রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারিত হইতে পারে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এ বিষয়ের যথোচিত অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা অনেক সময় নানাবিধ অসুবিধা, ক্লেশ, অর্থনাশ ও মনস্তাপ সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকি।

সকল দেশেই রোগীর শুশ্রূষা করিবার ভার প্রধানতঃ রমণীদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি স্বভাবতই ধীর, মধুর ও স্নেহ-প্রবণ; শ্রমশীলতা

ও সহিষ্ণুতা তাঁহাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহাদিগকে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর শারীরিক ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিতে দেখা যায়। রোগীর যিনি সেবা করিবেন, তাঁহার এই সকল গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক, এবং সর্ব্বত্র রোগীর সেবার ভার রমণীদিগের হস্তে যে অর্পিত থাকিতে দেখা যায়, তাহা এক প্রকার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

ইউরোপে শুশ্রূষা শিক্ষা করিবার সুব্যবস্থা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। তথায় বহুসংখ্যক রমণী যথারীতি শিক্ষা লাভ করিয়া শুশ্রূষাব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। ইহারা নার্স্ (Nurse) নামে পরিচিত এবং ইহারাই যাবতীয় সাধারণ চিকিৎসালয়ে (Hospital) এবং ভদ্রলোকের বাটীতে রোগীর সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে কিছু দিন পূর্ব্বে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের দ্বারা রোগীর সেবা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। তখন সাধারণ চিকিৎসালয়সমূহেও পুরুষদিগের দ্বারাই সেবার কার্য্য সম্পন্ন হইত। এক্ষণে আমাদের দেশের বড় বড় সহরে, বিদেশী ও স্বদেশী, অনেক স্ত্রীলোক এই বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া নার্সের ব্যবসা করিতেছেন। কিন্তু অনেক সময়ে হিন্দু-পরিবারের মধ্যে ইঁহা-

দিগের দ্বারা রোগীর সেবা-কার্য্য সুবিধাজনক হয় না। নার্সের জাতি ও ধর্ম্ম লইয়া অনেকস্থলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়; তাঁহাদের হস্তে ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতে অনেকেই (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা) সম্মত হন না। অপরন্তু ব্যয়বাহুল্যবশতঃ অধিকাংশ গৃহস্থলোকেই রোগীর সেবার নিমিত্ত নার্স্ নিযুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে নার্সের নিয়োগব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া এখনও বহুসময়-সাপেক্ষ। যাঁহারা নার্স নিয়োগ করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের বাটীতেও দেখা যায় যে নার্স্ নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ হৃদয়ের আবেগবশতঃ স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, নার্স্‌কে বড় কিছু করিতে দেন না। সুতরাং যখন এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের হস্তে রোগীর শুশ্রূষার ভার অর্পিত থাকিবে, তখন এ বিষয়ের প্রকৃত শিক্ষা তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে বিস্তার লাভ করে, তজ্জন্য প্রত্যেক সমাজ হিতৈষী ব্যক্তির সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আরোগ্য হওয়া সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা এই উভয় ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; একের অভাব হইলে রোগ-উপশমের সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। চিকিৎসক যদি

সেবা-কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, রোগীর চিকিৎসাসম্বন্ধে তাঁহার ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং তিনি শীঘ্র তাঁহার চিকিৎসার সুফলের পরিচয় প্রাপ্ত হন। এই জন্য বলিতেছি যে, যাহাতে শুশ্রূষাসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারিত-ভাবে আমাদিগের সমাজে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক চিকিৎসকেরই সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত।

অনেক সময়ে যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদিগের অজ্ঞতাবশতঃ পরিবারের মধ্যে সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই অনভিজ্ঞতা হেতু কত আশাপ্রদ জীবনপ্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে, কত পরিবারের সুখ-শান্তি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সুতরাং সেবাসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আমাদের দেশে বিস্তৃত-ভাবে প্রচারিত হইলে যে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ আমরা সংক্রামক রোগের শুশ্রূষার সাধারণ ব্যবস্থাগুলির বিষয় আলোচনা করিব। পরে রোগ-বিশেষে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথার উল্লেখ করিব।

যে কোন সংক্রামক রোগে রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তির মেশামেশি যত কম হয়, ততই রোগের পরিব্যাপ্তির সম্ভাবনা অল্প হইয়া থাকে। এ কারণ সংক্রামক রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তি হইতে যতদূর সম্ভব, পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। এ বিষয়ে আমরা যথোচিত সাবধান হই না বলিয়া অনেক সময় আমাদিগকে গুরুতর বিপদ ভোগ করিতে হয়। রোগীর জন্য এরূপ একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যাহার মধ্যে পরিবারস্থ অপর কাহারও সর্ব্বদা যাইবার আবশ্যকতা হয় না। এই গৃহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আলোক ও বায়ু প্রবেশের সুবিধা থাকা উচিত। যথোচিত বায়ু ও আলোকের অভাবে গৃহ সর্ব্বদা আর্দ্র ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা; এরূপ গৃহে রোগী বাস করিলে, রোগ ও রোগের সংক্রামকতা-দোষ, উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগীর চিত্তও সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল থাকে। যদি বাসগৃহ দ্বিতল বা ত্রিতল হয়, তাহা হইলে রোগীর গৃহ সর্ব্বোচ্চতলে অবস্থিত হওয়া শ্রেয়স্কর। গৃহটী এক পার্শ্বে ও সাধারণের গমনাগমনের পথ হইতে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত, কারণ ঐ গৃহের নিকট দিয়া সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিলে রোগীর বিশ্রামের যে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, শুদ্ধ তাহাই নহে, এতদ্দ্বারা

নানা কারণে ঐ রোগ সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা।

রোগীর মল-মূত্র-ত্যাগের ব্যবস্থা তাহার গৃহের সন্নিকটে কোন স্থানে হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। যে স্থান বাটীর অপর সকলে মল-মূত্র-ত্যাগের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তথায় রোগীর গমন করা কোন মতেই যুক্তি-যুক্ত নহে। অধিকাংশ সংক্রামক রোগে মল-মূত্রের সহিত রোগোৎপাদক বীজাণু দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা পরিজন-বর্গের মধ্যে রোগের পরিব্যাপ্তি সহজেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব সংক্রামক-রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির মল-মূত্র-ত্যাগের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র স্থানে হওয়া আবশ্যক। ঐস্থানে স্বতন্ত্র পাত্র রাখিয়া মল-মূত্র-ত্যাগের পর উহার সহিত কোন বিশোধক ঔষধ (Disinfectant) মিশ্রিত করিয়া উহাকে বাটী হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দিলে রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষ-ভাবে নিবারণ করা যাইতে পারে।

যে গৃহ রোগীর অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তন্মধ্যে গৃহ-সজ্জা যত কম থাকে, ততই রোগীর পক্ষে শুভ। রোগীর গৃহে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ুস্থান (Air-space) থাকা আবশ্যক। গৃহ-সজ্জার পরিমাণ যত অধিক হইবে, গৃহের বায়ুস্থান ততই কমিয়া যাইবে, সুতরাং ইহা দ্বারা রোগ-

উপশমের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহাদের আহার, বিশ্রাম ও শয়নের জন্য রোগীর গৃহের পার্শ্বে আর একটি ঘর থাকা আবশ্যক। অভাবপক্ষে রোগীর গৃহে রোগীর বিছানা ব্যতীত, যিনি তাঁহার সেবা করিবেন, তাঁহার শয়নের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিছানার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। যিনি শুশ্রূষা করিবেন, রাত্রিকালে রোগীর সহিত তাঁহার এক বিছানায় শয়ন করা নিতান্ত দোষাবহ। মশার উপদ্রবের জন্য রাত্রিকালে মশারি খাটাইবার আবশ্যকতা হয়; রোগীর সহিত এক মশারীর মধ্যে শয়ন করিলে সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অনেকস্থলে স্বামী হইতে স্ত্রীর অথবা স্ত্রী হইতে স্বামীর দেহে ক্ষয়কাশ এইরূপে বিস্তার লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। এই দুইটী বিছানা ব্যতীত ঔষধ ও পথ্যাদি রাখিবার জন্য একখানি চৌকি বা একটী টেবিল্, একটী ফুলদানি, একখানি চেয়ার বা টুল্, রোগীর বস্ত্র, তোয়ালিয়া, গামছা প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটী আল্না, একটী পিক্‌দানি, একটী জলের কুঁজা ও গেলাস এবং একটী ঘড়ি উক্ত গৃহে রাখিবার আবশ্যকতা হয়। গৃহ বিস্তৃত হইলে তন্মধ্যে একখানি আরাম-চৌকি রাখা যাইতে পারে; যিনি রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন,

প্রয়োজন মত তিনি উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। সাধারণতঃ রোগীর গৃহে অপর কোনরূপ গৃহ-সজ্জার আবশ্যকতা হয় না। সুতরাং অনাবশ্যক গৃহ-সজ্জা যত শীঘ্র স্থানান্তরিত করা যায়, ততই রোগীর সত্বর আরোগ্য লাভের সুবিধা হইয়া থাকে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলমারি, সিন্দুক, তোরঙ্গ, বাক্স, বোঝাকরা ময়লা কাপড় ও বিছানার দ্বারা রোগীর গৃহ পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, যে, সংক্রামক রোগের বীজাণু, বস্ত্র বা শয্যাদির সহিত একবার সংলগ্ন হইলে, উহাকে সহজে দূরীকৃত করিতে পারা যায় না এবং উহা এইরূপে বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি সংঘটন করে। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় শয্যা ও বস্ত্রাদি, যত দূর সম্ভব, রোগীর গৃহ হইতে দূরে রাখিয়া দিবে। যদিও অনেকস্থলে আমাদিগের অর্থাভাব এবং বাসগৃহে যথোচিত স্থানের অসদ্ভাব হেতু এইরূপ অব্যবস্থা ঘটিতে দেখা যায়, তথাপি আমার বিশ্বাস যে ইহার সমূহ অনিষ্টকারিতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলে, সকলেই যথাসাধ্য এবিষয়ে সাবধান হইতে চেষ্টা করিবেন।

যিনি শুশ্রূষা করিবেন, রোগীর গৃহের বাহিরে তাঁহার

পরিধেয় বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র আল্‌না রাখা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র পরিয়া রোগীর শুশ্রূষা করা যায়, তাহা লইয়া বাটীর অন্য কোন স্থানে গমন করা কদাচ উচিত নহে। কিন্তু এই নিয়মের পালন সম্বন্ধে আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। রোগীর সেবা করিতে করিতে অন্য কোন গৃহ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে যাওয়া তাঁহাদের সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। রন্ধন বা ভাণ্ডার গৃহে যোগাড় দিবার জন্য, পরিজন-দিগের আহারাদি বন্দোবস্ত করিবার জন্য, অথবা রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই রোগীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশোধক ঔষধ ও সাবান দ্বারা হস্ত পদ ধৌত করিয়া এবং বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে অনেক বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাঁহা-দিগকে বুঝাইয়া দিলেও তাহার পালন সম্বন্ধে তাঁহাদের যে বিশেষ কোন দায়িত্ব আছে, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করেন না। এই অনবধানতা বশতঃ পরিবারস্থ একের অধিক লোকের কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর, হাম, রক্তআমাশয় প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। অবশ্য রোগ সংক্রামক না হইলে, ইহা তত দোষের হয় না বটে, কিন্তু

অনেক স্থলে রোগ সংক্রামক কিনা, তাহা প্রথম অবস্থায় নির্দ্ধারণ করা বড়ই সুকঠিন; এমন কি, চিকিৎসকেরাও এ বিষয়ে অনেক সময়ে নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে সমর্থ হন না। সুতরাং রোগীর স্পৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটীর অন্যত্র না যাওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য। ইহাতে অসুবিধা কিছু মাত্র নাই অথচ ইহা পালন করিলে অনেক ভবিষ্যৎ বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদিগের পরিবারস্থ রমণীরা প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রোগীর সেবা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদিগের নমস্যা। তাঁহাদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন শুশ্রূষা সম্বন্ধে এই সহজ নিয়মগুলি পালন করিয়া তাঁহাদের কার্য্য একেবারে নির্দ্দোষ করিতে যত্নবতী হয়েন।

রোগীর গৃহের বাহিরে তাহার মল মূত্র-ত্যাগ করিবার পাত্র, জল, সাবান, বিশোধক ঔষধাদি সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া রাখা উচিত। এই সকল দ্রব্য যথাস্থানে রক্ষিত হইলে প্রয়োজনের সময় উহাদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিবার আবশ্যকতা হয় না, সুতরাং রোগী বা যিনি তাহার সেবা করেন, কাহাকেও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

যাহাদের অবস্থা সচ্ছল নহে, যাহাদের বাটীতে দুই

একটির অধিক ঘর নাই অথচ পরিজনবর্গের সংখ্যা অধিক, যাহাদের বাসগৃহ ও তাহাব চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের অবস্থা স্বাস্থ্যকর নহে এবং যাহাদের লোকবল কম, এরূপ পরিবারের মধ্যে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে রোগীকে সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা। আমাদের দেশের লোকের সাধারণ চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উপর, বিশেষ শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। তদুপরি জাতিনাশ, শব-ব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি নানাবিধ অমূলক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সাধারণ চিকিৎসালয়ে গমন করিতে আপত্তি করিয়া থাকে। আজ কাল সাধারণ চিকিৎসালয়সমূহে সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার যেরূপ সুব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, সাধারণ লোকের বাটীতে তাহা ঘটিয়া উঠা একেবারেই সম্ভবপব নহে। যে একবার হস্‌পিটালে থাকিয়া আসিয়াছে, তাহার মুখে তথাকার প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা কখনই শুনা যায় না। যাহারা এ সম্বন্ধে কিছু জানে না বা কিছু দেখে নাই, তাহাদেরই মুখে হস্‌পিটালের নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের গরীব দেশে যত অধিক লোক হস্‌পিটালে যাইয়া চিকিৎসা করাইবে, ততই অর্থ-ব্যয় ও আরোগ্য উভয় বিষয়েই তাহারা সুফল লাভ করিবে এবং সংক্রামক রোগের

পরিব্যাপ্তিও সবিশেষ কমিয়া যাইবে। বোম্বাই সহরে যখন প্লেগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব, তখন তথাকার একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, প্লেগের সময় সাধারণ চিকিৎসালয়সমূহই প্লেগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ স্থান। ইহা সাধারণ চিকিৎসালয়গুলির পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নহে। যাঁহারা শিক্ষিত এবং যাঁহাদের হস্‌পিটালের কার্য্য ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাধারণ লোকের মনে হস্‌পিটাল্ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার আছে, যদি তাহার অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের একটী প্রকৃত উপকার সাধন করা হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, পরিবারস্থ অপর কাহারও সহিত তাঁহাদের মেশামেশি না হইলেই ভাল হয়। একারণ যাঁহাদের শিশু-সন্তান পালন করিতে হয়, তাঁহাদের উপর রোগীর সেবার ভার ন্যস্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

দুই তিনজন লোকের উপর "পালা" করিয়া রোগীর সেবার ভার অর্পণ করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ৪ ঘণ্টার অধিক কালের জন্য সেবার ভার অর্পণ করা

উচিত নহে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্নেহাধিক্যবশতঃ ৩'৪ জন লোক একত্রে রোগীর কাছে দিবারাত্রি বসিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সকলেরই শরীর শীঘ্র অপটু হইয়া পড়ে এবং এরূপ ব্যবস্থায় আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে পূর্ণমাত্রায় সেবার ফল প্রাপ্ত হই না। "পালা" করিয়া কার্য্য করিলে অল্প পরিশ্রমেই কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রোগীর গৃহে যাঁহারা সেবা করিবেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। এই ব্যবস্থা যদি দৃঢ়ভাবে পালন করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময়ে যাহার সংক্রামক রোগ হইয়াছে, রোগ তাহারই মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যায়, পরিবারের মধ্যে বা পল্লীর মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করিবার অবকাশ পায় না। আমরা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি। রোগ যতই দুরারোগ্য হয়, রোগীর গৃহ ততই একটী বৈঠকখানায় পরিণত হইতে থাকে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই, প্রয়োজন সত্ত্বে বা প্রয়োজনের অভাবে, তথায় সমাগত হইয়া গৃহের বায়ু দূষিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কলরবে রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় এবং তাহার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনেরও (যাহা তাহার পক্ষে ঔষধ অপেক্ষাও অধিক

প্রয়োজনীয়)• সবিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। একেত আমরা রোগীর ঘরের তাবৎ বায়ু-পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া থাকি, তাহার উপর গৃহের মধ্যে জনতা হইলে উক্ত গৃহের বায়ুর কিরূপ দুরবস্থা হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি যে বাহির হইতে রোগীর সংবাদ লইলে প্রকৃত আত্মীয়তা প্রদর্শন করা হয় না, রোগীর গৃহে যাইয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে পর, তবে আত্মীয়ের কায করা হয়। রোগী অনেক সময়ে এই ভালবাসার উপদ্রবে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; পরিবারবর্গ অবশেষে চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া এই অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের সংস্কার এতই প্রবল যে অনেকস্থলে চিকিৎসকের অনুজ্ঞায়ও কোন সুফল দেখা যায় না। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমাদিগের অবিবেচনার কথা মনে হইলে বড়ই লজ্জিত হইতে হয়। আমি আশা করি যে, উপর্য্যুক্ত কয়েক ছত্র যাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাঁহারা যেন এরূপ আচরণের অবৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য সকলকে সদুপদেশ প্রদান করেন। বিশেষতঃ এ কথা যেন সকলে

খন যে, অধিকাংশ স্থলে রোগীর গৃহে লোক-

সমাগম হেতু সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি সাধিত হইয়া থাকে।

রোগীর গৃহের দরজা ও জানালাগুলি সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকা উচিত এবং প্রত্যেক বায়ুপথ এক একটী পর্দ্দা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। এই পর্দ্দাগুলি কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে * ভিজাইয়া রাখিলে সংক্রামক রোগের বীজ গৃহ হইতে বায়ুপ্রবাহের সহিত বাহিরে আসিবার সুবিধা পায় না এবং বাহির হইতে গৃহের মধ্যে মাছি প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময়ে রোগীর গৃহে মাছি প্রবেশ করিয়া তথা হইতে রোগের বীজ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে সংক্রামক রোগের পরিব্যপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। গরম জল একটী পাত্রে রাখিয়া তন্মধ্যে কয়েক ফোটা ল্যাভেণ্ডার্ তৈল ঢালিয়া দিলে উহার গন্ধে মাছি দূরে সরিয়া যায়, অথচ ইহা দ্বারা গৃহের বায়ু পরিষ্কৃত হয় এবং রোগীর পক্ষেও উহার আঘ্রাণ প্রীতিকর ও উপকারী। রোগীর গৃহে এই ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে।

রোগীর গৃহের বাহিরে একটা লৌহপাত্রে আগুন রাখিলে, সেই স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধতা কিয়ৎ-পরিমাণে রক্ষিত

* এক ভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড্ ৩৯ ভাগ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইলে এই দ্রাবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হয়, রোগীর পথ্য বা জল গরম করিবার প্রয়োজন হইলে সহজেই তাহা নিষ্পন্ন করিতে পারা যায় এবং যখন রোগীর শ্লেষ্মাদিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দগ্ধ করিবার আবশ্যকতা হয়, তখন উহাদিগকে বাটীর অন্যত্র লইয়া না যাইয়া ঐস্থানেই ঐ কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহারা রোগীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় হস্ত ও পদ যে কোন বিশোধক ঔষধের দ্রাবণ ও সাবানের দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিবেন। পরিধেয় বস্ত্র যদি জলে কাচিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে কাচিবার পূর্ব্বে কোন পাত্রের মধ্যে উহাকে বিশোধক ঔষধে একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে সাবান ও উষ্ণ জলে কাচিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; এইরূপে ঐ বস্ত্রের সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়। বস্ত্রাদি অধিকক্ষণ রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে অনেক সময়ে উহার সংক্রামকতা-দোষ দূরীভূত হয়। রোগীর গাত্রসংস্পৃষ্ট শয্যা ও বস্ত্রাদি প্রথমতঃ বিশোধক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে জলে অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইলে, উহার সংক্রামকতা দোষ একেবারে বিনষ্ট হয়। অতঃপর ঐ বস্ত্র ধোপার বাটী হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিলে উহা পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে।

সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্রাদি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বিশুদ্ধ না করিয়া ধোপার বাটীতে পাঠান নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। আমরা সচরাচর রোগীর বস্ত্রাদি তদবস্থায় অথবা শুদ্ধ জলকাচা করিয়া এক স্থানে জড় করিয়া রাখি, পরে ধোপা আসিলে, উহাদিগকে তাহার হস্তে সমর্পণ করি। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে এরূপ ব্যবস্থায় সমূহ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্র কেবল জলে ধৌত করিলে উহার সংক্রামকতা নষ্ট হইয়া যায় না। এরূপ বস্ত্র বাটীর মধ্যে জড় করিয়া রাখিলে উক্ত রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ ঐ কাপড় ধোপার বাটী যাইলে অন্য পরিবারের ধৌত বস্ত্রের সংস্পর্শে আসিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ ধোপারা সচরাচর একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে বাস করে এবং তাহার মধ্যেই মলিন ও ধৌত বস্ত্রাদি পাশাপাশি রাখিয়া দেয়। সুতরাং দূষিত মলিন বস্ত্র হইতে ধৌত বস্ত্রে সংক্রামক রোগের বীজ সংলগ্ন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনেক সময়ে হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ বাটীর মধ্যে কোথা হইতে উপস্থিত হইল স্থির করিতে পারা যায় না। ধোপার বাটীর ফর্সা কাপড়ের সহিত উক্ত রোগের বীজের আমদানি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। ধোপার বাটী হইতে কাপড় আসিলে,

২।৩ ঘণ্টার জন্য উহাকে রৌদ্রে রাখিয়া পরে ঘরের ভিতর তুলিলে এই দোষ অনেকাংশে কাটিয়া যায়। কেহ কেহ ধোপার বাটীর কাপড় একবার জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ব্যবহার করেন; ইহা দ্বারা কাপড়ের সংক্রামকতা দোষ কাটিয়া যায়।

সংক্রামকতা-দুষ্ট কাপড় বিশুদ্ধ না করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে তাহার পরিজনবর্গের মধ্যেও ঐ রোগের আবির্ভাব হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ইহা যে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এজন্য রোগীর কাপড় ও শয্যাদি পূর্ব্বেই জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া ধোপার বাটীতে পাঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। হস্পিটালে রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি অত্যুষ্ণ জলের ভাপ্‌রায় অথবা অত্যন্ত গরম বাতাসের দ্বারা বিশুদ্ধ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহস্থের বাটীতে একটা বড় পাত্রে বস্ত্রাদি জলে অধিকক্ষণ ফুটাইয়া লইলেই শোধন-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

রোগীর গৃহ হইতে যে কোন বাসন বাহির করা হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিশোধক ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লওয়া উচিত। রোগী যে পাত্রে মল, মূত্র বা কফ পরিত্যাগ করিবে, গৃহের মধ্যেই উহার সহিত যথেষ্ট

পরিমাণে বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, উহাকে স্থানান্তরিত করিবে।

যখন রোগী আরোগ্য লাভ করিবে, তখন তাহাকে কার্ব্বলিক্ সাবান দ্বারা উষ্ণ জলে স্নান এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া বাটীর অন্যত্র গমন করিতে বা অন্য-লোকের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত। রোগভেদে উহার সংক্রামকতা-দোষ অল্প বা অধিক দিন রোগীর শরীরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। এই সময়ের মধ্যে যদি উক্ত রোগী সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে আইসে, তাহা হইলে সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে রোগীকে কাহারও সহিত মিশিতে না দিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিলে, রোগের পরিব্যাপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। অধিকাংশ রোগেরই সংক্রামকতা-দোষ প্রায় তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে।

রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা তাহার বস্ত্র ও শয্যাদি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। গদি, লেপ, বালিশ প্রভৃতি বিছানা বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করা বড়ই কঠিন। অনেক সময় রোগীর শয্যা ব্যবহার করিয়া উপর্য্যুপরি অনেক লোকের হাম, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি রোগ হইতে দেখা

গিয়াছে। রোগীর জন্য গদি ব্যবহৃত হইলে একখানি বড় অয়েল্ ক্লথ্ দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক মুড়িয়া দিলে গদির উপর রোগীর মলমূত্র পতিত হইতে পাবে না। সুতরাং একান্ত আবশ্যক হইলে গদি এইরূপে রক্ষা করিয়া তোষক বালিশ ইত্যাদি অন্যান্য বিছানা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। রোগীর জন্য অল্প ব্যয়ে যদি আমরা এক প্রস্থ বিছানা প্রস্তুত করাইয়া দিই, তাহা হইলে বোগমুক্তির পর উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না।

সামান্য অবস্থার লোক রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের পক্ষে ঐ সকল সামগ্রী এবং অন্যান্য গৃহসজ্জা একটা রুদ্ধ গৃহের মধ্যে রাখিয়া ক্লোরিণ্ (Chlorine) গ্যাস্ সাহায্যে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। একটা চিনামাটি বা এনামেলের পাত্রে অধিক পরিমাণ ব্লীচিং পাউডার্ (Bleaching powder) নামক বিশোধক ঔষধের গুঁড়া রাখিয়া তাহার উপর জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ (Hydrochloric acid) ঢালিয়া দিলে, ক্লোরিণ্ গ্যাস্ উৎপন্ন হইবে এবং গৃহের সমস্ত বায়ুপথ কয়েক ঘণ্টা কাল রুদ্ধ করিয়া রাখিলে শয্যা ও বস্ত্রাদিসংলগ্ন রোগের বীজ ক্লোরিণ্ গ্যাস্ সাহায্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যে গৃহে রোগী অবস্থান করে,

আরোগ্যের পর সেই গৃহের মধ্যেই এই ব্যবস্থা করিলে গৃহ ও গৃহসজ্জা সমস্তই রোগের বীজমুক্ত হইয়া যাইবে। অতঃপর কয়েক দিন ঐ সকল সামগ্রী প্রখর রৌদ্রে রাখিয়া দিলে সূর্য্য-কিরণ ও মুক্ত বাতাসের সাহায্যে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে ও পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

সচরাচর গন্ধকের ধূম দ্বারা রোগীর গৃহ বিশোধিত হইয়া থাকে। রোগীর গৃহে খাট, বাক্স, তোরঙ্গ প্রভৃতি কাঠের বা লৌহের যে সমস্ত সামগ্রী থাকে, তাহাদিগকে এবং ঘরের দরজা, জানালা ও দেওয়াল সমূহ প্রথমতঃ কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে সিক্ত বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ঘর রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অধিক পরিমাণ গন্ধক কয়েক ঘণ্টাকাল জ্বালাইলে ঘরের মধ্যে যে কোন স্থানে রোগের বীজ সংলগ্ন থাকিবে, তাহা গন্ধকের ধূম দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অবশেষে ঘরের দেওয়ালের চুণ কিয়দংশ চাঁচিয়া ফেলিয়া যাহাতে পুনরায় চুণ ফিরাইয়া দিলে উক্ত গৃহ পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। গৃহের মেঝে এবং ছাদের তলদেশও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত করিতে হইবে।

শাল প্রভৃতি পশমী দামী কাপড় যদি রোগীর সংস্পর্শে

আইসে বা রোগীর ঘরের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহা-দিগকে উপর্যুক্ত উপায়ে (বিশেষতঃ ক্লোরিণ্ সাহায্যে) বিশুদ্ধ করিতে গেলে কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতার কাপড়কে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সহজেই বিশুদ্ধ করিতে পারা যায়। পশমী ও রেশমী কাপড় বিশুদ্ধ করিতে হইলে পূর্ব্বে যে যন্ত্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট করা উচিত। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী এইরূপ একটী যন্ত্র ইটিলিতে (Entally) স্থাপন করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর অনুমতি লইয়া সাধারণ লোকেও সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্র ও শয্যাদি বিশুদ্ধ করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

টিকা লওয়া (Inoculation ; Vaccination)—কোন কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে পুনরায় হইতে দেখা যায় না। যাহার একবার বসন্তরোগ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ভবিষ্যতে বার বার বসন্ত রোগীর সংস্পর্শে আসিলেও প্রায় পুনরায় উক্তরোগে আক্রান্ত হয় না। ইহা দ্বারা চিকিৎসকেরা অনুমান করেন যে, সংক্রামক রোগ হইলে রক্তের এমন কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় অথবা উক্ত রোগের বীজ হইতে এমন কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া দেহমধ্যে অবস্থিত থাকে, যাহা, ঐ ব্যক্তির শরীরে উক্ত রোগের বীজ পুনঃ

প্রবিষ্ট হইলে, তাহার ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহা যে শুদ্ধ বসন্ত রোগেই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। সংক্রামক রোগ মাত্রেই দেহমধ্যে এইরূপ একটী বিষঘ্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহা দেহকে ঐ রোগের পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। তবে বসন্তের ন্যায় অন্য সংক্রামক রোগে এই বিষঘ্ন পদার্থের শক্তি সেরূপ প্রবল বা বহুদিন স্থায়ী হয় না, অল্প দিনের মধ্যেই উহা হীনশক্তি হইয়া লোপ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিলে, উহা দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হাম, পানবসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সচরাচর একবারের অধিক হইতে দেখা যায় না, তবে কখন কখন দুই, এমন কি তিনবার পর্য্যন্ত হাম হইতে দেখা গিয়াছে। বসন্ত যে কখন পুনরায় হয় না, এরূপ নহে। লোকে বসন্ত রোগে দুইবার আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে কিন্তু এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল এবং ঘটিলেও প্রায় প্রাণহানি হয় না। কলেরা প্রভৃতি রোগেও এই নিবারণী-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহাকে অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, যে কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে অল্প বা অধিক দিন ঐ রোগে পুনরায়

আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া প্রায় সকল প্রকার সংক্রামক রোগ নিবারণ করিবার জন্য অধুনা "টিকা" দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে বীজ দ্বারা যে রোগ উৎপন্ন হয়, (১) উহা অতি সূক্ষ্মমাত্রায় বা মৃতাবস্থায়, অথবা (২) উহাকে অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করাইয়া উহার পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, কিংবা (৩) উহা হইতে উৎপন্ন রস বিশেষ (Antitoxin) মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করাইলে ঐ রোগের 'টিকা' দেওয়া হয়। একটী সূচল পিচকারী দ্বারা অথবা চর্ম্মের উপরি-ভাগের ছাল তুলিয়া তদুপরি লাগাইয়া উক্ত পদার্থ রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে উক্ত রোগ অতি মৃদুভাবে শরীরে প্রকাশ পাইয়া এমন একটী বিষঘ্ন পদার্থ দেহের মধ্যে উৎপাদন করে এবং তাহাতে শরীরের এমন এক সহ্য করিবার শক্তি জন্মায় যে, উক্ত রোগের বীজ অধিক মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করিলেও রোগ প্রবলভাবে প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয় না,—এমন কি, অনেক সময়ে রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিলে কসৌলি নামক স্থানে যে টিকা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাও এই প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বসন্ত-নিবারণের জন্য যে

মনুষ্য-বীজের টিকা লওয়া হইত, তাহাতে বসন্ত-রোগীর গুটী হইতে রোগের বীজ সংগ্রহ করিয়া অতি সূক্ষ্মমাত্রায় সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করান হইত। ইহা দ্বারা তাহার শরীরে অতি মৃদুভাবে বসন্ত রোগ প্রকাশ পাইত এবং তদ্দ্বারা শরীবের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত যে তাহার পুনরায বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু বসন্তের টিকা লওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ্ নহে; এইরূপ টিকা লইয়া সময়ে সময়ে সাংঘাতিক বসন্ত রোগ হইতে দেখা গিয়াছে এবং ঐ বীজ বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া কতলোকের জীবন নাশের কারণ হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা বসন্ত-রোগ নিবারণের জন্য গো-বসন্তের (Cow-pox) টিকা লইয়া থাকি। মনুষ্যের বসন্ত, গোরুর শরীরে প্রবেশ করিলে, বীজের এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যে উহা গো-জাতির কোনও অনিষ্ট সাধন করে না, অথচ গো-দেহ হইতে মনুষ্য শরীরে ঐ বীজ পুনঃপ্রবেশ করাইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে এক প্রকার অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। বিখ্যাত ডাক্তার স্যর্ এডোয়ার্ড্ জেনার্ প্রথম এই তত্ত্বের আবিষ্কার করেন এবং তদবধি এই টিকা বসন্ত-প্রতিষেধের জন্য ব্যবহৃত হইয়া অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষার কারণ হইয়াছে এবং পৃথিবীর অনেক স্থান

হইতে বসন্ত রোগ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গো-বীজের টিকা দেওয়াকে ইংরাজীতে Vaccination কহে। শৈশবে একবার এবং ৭ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে আর একবার গো-বীজের টিকা লইলে, বসন্ত রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারা যায়। তবে বসন্তরোগ মহামারী-রূপে আবির্ভূত হইলে অথবা বসন্ত রোগীর সংস্পর্শে আসিবার সম্ভাবনা থাকিলে, সকলেরই সেই সময়ে একবার টিকা লওয়া কর্ত্তব্য। যিনি বসন্তরোগীর সেবা করিবেন, তিনি যেন টিকা নূতন করিয়া লইয়া রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হয়েন, নতুবা ঐ রোগে তিনি আক্রান্ত হইলেও হইতে পারেন। বহুদিনের টিকার উপর এইরূপ অবস্থায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। বসন্ত রোগের ন্যায় প্লেগ্, কলেরা, টাই-ফয়েড্ ফিভার্ প্রভৃতি রোগ নিবারণের জন্যও টিকার ব্যবহার চলিতেছে। যদিও এই সকল রোগের টিকার রোগ-নিবারণী-শক্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তথাপি যাহাদিগকে সর্ব্বদা এই সকল রোগের সংস্পর্শে আসিতে হয়, যাহাদিগকে এই সকল রোগীর সেবা করিতে হয়, তাহারা টিকা লইলে, বেশী দিন না হউক, অন্ততঃ রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় রোগের সংস্পর্শে থাকিয়াও রোগের

আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে টিকা লওয়া সাতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য; ইহাদ্বারা তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে এবং রোগের বিস্তারও বিশেষভাবে নিবারিত হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে যে কোন রোগের টিকা লইলে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না, অথচ অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়, অথবা উক্ত রোগ হইলেও উহা প্রবলভাবে প্রকাশ পায় না এবং কদাচ প্রাণ-হানি হইয়া থাকে। সুতরাং কোন সংক্রামক রোগ মহামারী রূপে প্রাদুর্ভূত হইলে সকলেরই ঐ রোগের টিকা লওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রোগ পল্লীর মধ্যে বিস্তারলাভ করিতে পারে না, অল্পদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়।

ডিপ্‌থিরিয়া, টিটেনাস্ প্রভৃতি রোগে যে টিকা দেওয়া হয়, তাহা রোগ আরোগ্য হইবার জন্য, নিবারণের জন্য নহে। ডিপ্‌থিরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পর এই টিকা দেওয়া হয় এবং ইহার গুণে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমশঃ কমিয়া যায়। পূর্ব্বে ডিপ্‌থিরিয়া রোগে মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল, টিকা দেওয়া প্রচলিত হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা সবিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিশোধক ঔষধের তালিকা—যে সকল বিশোধক ঔষধ আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি এবং যে পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত হইলে উহাদিগের রোগ-বীজ নষ্ট করিবার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, বিশোধক ঔষধমাত্রেই

বিশোধক ঔষধ	ঔষধের পরিমাণ	জলের পরিমাণ
করোসিভ্ সব্লিমেট্ বা পার্ক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি (Perchloride of Mercury)	১ ভাগ	১০০০ ভাগ
চিনসল্ Chinosol) ...	"	১২০০ "
ফর্ম্মালিন্ (Formalin) ...	"	৪০ "
কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid)	"	২০(উষ্ণ)"
লাইসল্ (Lysol) ...	"	২৫ "
ব্লীচিং পাউডার্ বা ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ (Chloride of lime) ...	"	১০০ "
পোটাসিয়ম্ পার্ম্যাঙ্গানেট্ ...	"	২০ "
ফেনাইল্ (Phenyle) ...	"	২০ "
সিলিন্ (Cyllin) ...	"	২০ "
ক্রীওলিন্ (Creolin) ...	"	২ "
Quick line) ...	"	৪ "

বিষাক্ত পদার্থ; অতএব অতি সাবধানে ইহাদিগের ব্যবহার করা উচিত এবং যাহাতে বালকবালিকা বা অপর অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উহাতে হাত দিতে না পারে, তজ্জন্য উহাদিগকে সর্ব্বদা আলমারির ভিতর চাবিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত।

এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে সাবান দিয়া কাপড় কাচিলে সাবানের মধ্যে যে ক্ষার-পদার্থ থাকে, তদ্দ্বারা সংক্রামক রোগের বীজ অনেক পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

রোগীর গৃহ বীজশূন্য করিতে হইলে কতকগুলি বিশোধক ঔষধের ধূম তন্মধ্যে প্রয়োগ করা উচিত। যে প্রণালী মতে উহা প্রয়োগ করিতে হয়, নিম্নে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা গেল।

গন্ধক।—যে ঘরে ১০০০ কিউবিক্ (১০ × ১০ × ১০) ফিট্ বায়ু-স্থান থাকে, তাহার জন্য দেড়সের গন্ধক পোড়াইবার প্রয়োজন হয়। গৃহটীর দরজা, জানালা এবং যেখানে যে ছিদ্র আছে, তাহা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া গন্ধক তন্মধ্যে পোড়াইতে হইবে।

ক্লোরিণ্ (Chlorine)—এই গ্যাসের বিশোধকতা গুণ, গন্ধকের ধূম অপেক্ষা অধিকতর প্রবল। ১ ভাগ ব্লীচিং পাউডার্ (Chloride of lime) ১০০ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া চূণ ফিরাইবার মত ঘরের দেওয়ালের সর্ব্বত্র

লাগাইয়া দিলে বায়ু-সাহায্যে উহা হইতে ক্লোরিণ্ গ্যাস্ অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া গৃহস্থিত রোগের বীজ নষ্ট করে। ক্লোরিণ্ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইলে বেশী পরিমাণে ব্লীচিং পাউডার্ রুদ্ধ গৃহমধ্যে এনামেলের পাত্রে রাখিয়া তদুপরি জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ ঢালিয়া দিলেই ক্লোরিণ্ গ্যাস্ উদ্গত হইবে। ক্লোরিণ্ দ্বারা সূতার কাপড়ের কোন অনিষ্ট হয় না, তবে গরম কাপড় বা রেশমের কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ফর্ম্মাল্ডিহাইড্ (Formaldehyde)—ফর্ম্মালিন্ নামক বিশোধক ঔষধের চাক্তি (Paraform)বিক্রীত হইয়া থাকে। এই চাক্তিগুলি পাত্র বিশেষে রাখিয়া অল্প উত্তাপ প্রয়োগ করিলেই উহা হইতে ফর্ম্মাল্ডিহাইড্ গ্যাস্ উৎপন্ন হইবে এবং উহা দ্বারা গৃহের ও গৃহসজ্জার সংক্রামতা-দোষ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পার্ম্মাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ গুঁড়া করিয়া তদুপরি ফর্ম্মালিন্ ঢালিয়া দিলেও এই গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। ফর্ম্মালিন্ একটী উৎকৃষ্ট বিশোধক ঔষধ; ইহার ব্যবহারে বস্ত্রাদি নষ্ট হয় না অথচ রোগের বীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়।

চূণ (পাথুরে)—ইহার ১ ভাগ ৪ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া বিশোধক রূপে ব্যবহার করিলে রোগীর মল মূত্রাদির

সংক্রামকতা দোষ শীঘ্র নষ্ট হয়। ইহা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য।

ঘরে চূণ ফিরাইয়া দিলে উহার সংক্রামকতা-দোষ অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়।

সংক্রামকতা-প্রতিষেধের বিশেষ বিধি—এদেশে সচরাচর যে সকল সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, তাহাদিগের পরিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য রোগ-বিশেষে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলা হইল।

১। **ম্যালেরিয়া** (Malaria)—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মশা, মাছি প্রভৃতি দ্বারা সংক্রামক রোগের বিস্তার সংঘটিত হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে জ্বরে যত অধিক-সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। পুনশ্চ সকল প্রকার জ্বরের মধ্যে এদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মশক-দংশন ব্যতীত ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয় না, ইহা এক্ষণে এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা মশকের দৌরাত্ম্য হইতে, একেবারে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণেও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের জন্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী ও এনোফিলিস্ (Anopheles) জাতীয় মশক, এতদুভয়ের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তের মধ্যে উক্ত রোগের জীবাণু বিদ্যমান থাকে। মশকী দংশন দ্বারা উহাকে রোগীর দেহ হইতে রক্তের সহিত শোষণ করিয়া লয়। পরে মশকীর দেহের মধ্যে থাকিয়া উক্ত জীবাণু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং অবশেষে ঐ মশকী সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে ঐ পরিবর্ত্তিত জীবাণু প্রবেশ করাইয়া ম্যালেরিয়া রোগ উৎপাদন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার নিবারণ করিতে হইলে, হয় মশক-কুলের একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে, নতুবা রোগীর রক্তের মধ্যে যে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু অবস্থিতি করে, তাহার ধ্বংস করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, কেন না তাহা হইলে মশকের দংশন দ্বারা উহা রোগীর শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ম্যালেরিয়াবাহী মশককুলের এককালে ধ্বংসসাধন করা অসম্ভব। যেখানে জল অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে, সেইখানেই মশকের প্রাদুর্ভাব হইবে। পল্লীগ্রামে নালা, ডোবা, অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী,

স্রোতোবিহীন নদী এবং যে সকল স্থানে অল্পগভীর জল সঞ্চিত থাকে, সেই সকল স্থানেই মশকের বংশবৃদ্ধি হইবার সুবিধা হয়। এইরূপ স্থানেই মশকীরা ডিম পাড়ে এবং কালে ঐ ডিম ফুটিয়া অসংখ্য নূতন মশকের সৃষ্টিহইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে জল নিকাশ হইবার স্বাভাবিক পথ সমূহ অনেক স্থানে একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এই সকল স্থানই ম্যালেরিয়ার প্রধান আবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ষার অব্যবহিত পরেই পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং বসন্তের প্রারম্ভে, যখন বর্ষা-সঞ্চিত জল শুষ্ক হইয়া যায়, তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ একেবারে হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে যখন ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ জানা ছিল না, তখন চিকিৎসকেরা মনে করিতেন যে জলাভূমি প্রভৃতি যে সকল স্থানে গাছপালা পচিতে থাকে, তথা হইতে এক প্রকার দূষিত বাষ্প উত্থিত হইয়া ম্যালেরিয়া রোগ উৎপাদন করে। জলাভূমির ন্যায় স্থান সমূহে মশক জন্মিবার সুবিধা হয় বলিয়াই উহারা ম্যালেরিয়ার আকর। ঐ সকল স্থান হইতে দূষিত বাষ্প উৎপন্ন হইলেও উহা ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপাদন করে না অথবা ঐ সকল স্থানের জল পান করিলেও ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হয় না।

আমাদের দেশে জল নিকাশের সুব্যবস্থা এক অতি কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বহুব্যয়সাপেক্ষ, সুতরাং ইহার ব্যবস্থাপ্রণয়ন সাধারণ লোকের ক্ষমতার বহির্ভূত। গভর্ণমেণ্ট্ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু ব্যয়বাহুল্য-বশতঃ ইহা সম্পূর্ণ হইতে অনেক সময় লাগিবে। সুতরাং বিস্তৃতভাবে জলনিকাশের বন্দোবস্তের কথা ছাড়িয়া দিয়া পল্লীগ্রামবাসীদিগেব ব্যক্তিগত ও সমবেত চেষ্টায় যে উপায়ে গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা হইল।

১। বাটীর মধ্যে বা আশে পাশে ডোবা, গর্ত্ত প্রভৃতি থাকিলে দূর হইতে মাটী আনিয়া তাহা বুজাইয়া দিবে, যেন কোন মতে তথায় জল জমিযা থাকিতে না পারে। পল্লীগ্রামে অনেক সময়ে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য বাটীর নিকট হইতেই মাটী খুঁড়িয়া লওয়া হয় এবং সেই সকল ডোবা কোন কালে বুজান হয় না। এরূপ ব্যবস্থা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। বর্ষাকালে ঐ সকল স্থানে জল জমিলেই মশকীরা তথায় ডিম পাড়িবে এবং বাটীর মধ্যে মশার প্রাদুর্ভাব হইবে।

২। জল নিকাশের নালার মধ্যে যদি জল জমিয়া থাকে অথবা বাটীর নিকটে বড় ডোবা বা অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী

থাকে (যাহা মাটীর দ্বারা বুজাইবার সম্ভাবনা নাই), তাহা হইলে ঐ সকল স্থানে প্রতি সপ্তাহে একদিন জ্বালানি কেরোসিন্ তৈল ঢালিয়া দিবে; ইহা দ্বারা মশকের ডিম ও শাবক নষ্ট হইয়া যাইবে। কেরোসিন্ তৈলের সহিত পেষ্টারিন্ (Pesterine) নামক কেরোসিন্ জাতীয় অপর এক প্রকার তরল পদার্থ সমভাবে মিশ্রিত করিয়া জলে ঢালিয়া দিলে মশককুল শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

৩। বাটীর মধ্যে উঠানে বা উহার সন্নিকটে ভাঙ্গা হাঁড়ি, গাম্‌লা, পুরাতন টিনের কানেস্তারা বা কৌটা ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া থাকিতে দিবে না। এই সকল পাত্রের মধ্যে জল সঞ্চিত হইলে তন্মধ্যে মশকী আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ডিম পাড়ে। এই সকল অব্যবহার্য্য পদার্থ বাটী হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করিবে।

৪। বাটীর মধ্যে অবস্থিত এবং গ্রামের সাধারণ জলপথগুলি যদি "কাঁচা" না হইয়া "পাকা" করিয়া গাঁথা হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে পারা যায়, সুতরাং তথায় মশকজাতির বসবাসের বা ডিম পাড়িবার সুবিধা হয় না। যে সকল গ্রামে "পাকা" ড্রেনের বন্দোবস্ত আছে, তথায় মশকের উপদ্রব এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। গ্রামের মধ্যে যে সকল বৃহৎ পুষ্করিণী পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেই গুলিকে অনেক সময়ে নিতান্ত অপরিষ্কৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিও মশকদিগের এক একটী প্রধান আবাসস্থল। এই সকল পুষ্করিণীর মধ্যে কেরোসিন্ ঢালিয়া মশক ধ্বংস করা কোনক্রমে সুবিধাজনক নহে, কারণ জলে কেরোসিন্ ঢালিয়া দিলে উহা এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে কেহ সহজে উহা পান বা রন্ধন কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে পারে না। পুনশ্চ পুষ্করিণীর জল কেরোসিন্-মিশ্রিত হইলে উহার মধ্যে যে সকল মৎস্য থাকে, তাহাদিগের মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইজন্য ব্যবহার্য্য পুষ্করিণীর মধ্যে কেরোসিন্ না ঢালিয়া অন্য উপায়ে মশক ধ্বংসের ব্যবস্থা করা উচিত। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে কতিপয় ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য মশকের ডিম ও মশক শাবকের পরম শত্রু, দেখিতে পাইলেই উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আমেরিকার অন্তঃপাতী বার্বাডোজ্ (Barbadoes) নামক প্রদেশে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য জন্মে; তাহারা "বার্বাডোজ মিলিয়ন্‌স্" (Millions) নামে পরিচিত। ইহারা মশকের ডিম ও শাবক নষ্ট করিয়া ঐ স্থান একপ্রকার ম্যালেরিয়া মুক্ত করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট্ ফিসারির ভূতপূর্ব্ব একজন

সুযোগ্য কর্ম্মচারী মশকধ্বংসের জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে কেরোসিন্ ঢালিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন যে কয়েক জাতীয় মৎস্য পুষ্করিণীর মধ্যে জন্মাইলে মশকধ্বংশ বিষয়ে আমরা অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারি। এই সকল মৎস্যের মধ্যে "তেচোকো", "পাঁচচোকো", "খল্‌সে", "কই", "ফলুই", "চাঁদা", "ভেদো", "বেলে", "ফুটুনি পুঁটি" প্রভৃতি মৎস্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "তেচোকো" মাছ অল্পজলে বাস করে, অতি শীঘ্র সংখ্যায় বাড়িয়া যায়, সহজে মরে না এবং পুষ্করিণীর কিনারায় "দামের" মধ্যে (যেখানে মশকীরা ডিম পাড়ে) থাকিতে ভালবাসে। মশকের ডিম ও শাবক ইহাদিগের প্রধান আহার।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গাচিরা (Tadpoles) মশকের ডিম ও শাবক ভক্ষণ করিয়া মশককুল ধ্বংস করিয়া থাকে।

৬। বাটীর মধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে ঝোপ বা জঙ্গল থাকিতে দিবে না। এই সকল স্থানে মশকগণ দিবাভাগে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সন্ধ্যার সময়ে বাহির হইয়া লোকের গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। ঝোপের মধ্যে অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন স্থানে ঝোপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিবে।

৭। গ্রামের চতুঃপার্শ্বের জমীর ২০০ হাত বাদ দিয়া

চাষের কাজ করিবে এবং ৪০০ হাতের মধ্যে ধান জমী রাখিবে না।

৮। গৃহের মধ্যে যে স্থান অন্ধকারময়, যেখানে আসবাব্ আদি রাখা হয় অথচ উহাদিগকে সর্ব্বদা স্থানান্তরিত করা হয় না, যেখানে কাপড় জামা টাঙ্গান থাকে, তাহার আশেপাশেই মশকদিগকে দিনের বেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়। গৃহের মধ্যে প্রচুর আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিলে এবং গৃহের সর্ব্বস্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর দৃষ্টি থাকিলে মশকেরা গৃহের মধ্যে বাস করিবার সুবিধা পায় না।

৯। মশকেরা ধূনা, লোবাণ, গন্ধক, কর্পূর, নিমপাতা আকরকরা (Pyrethrum), ঘুঁটে প্রভৃতির ধূম এবং টার্পিন্, কেরোসিন্, ফর্ম্ম্যালিন্, মেন্থল্ প্রভৃতি পদার্থের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। সন্ধ্যার পর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে এই সকল পদার্থের ধূম উৎপাদন করিলে গৃহে মশকের উপদ্রব যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়। নিমপাতা-মিশ্রিত ঘুঁটে জ্বালাইলে মশকের উপদ্রব নিবারিত হয়।

১০। এনোফিলিস্ নামক যে জাতীয় মশক দংশন দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগের বীজ বহন করে, তাহারা দিবাভাগে উপদ্রব করে না, ঝোপের মধ্যে অথবা গৃহা-

ভ্যন্তরস্থ অন্ধকারময় স্থানে লুকাইয়া থাকে। উহারা সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া উপদ্রব করিয়া থাকে। এইজন্য ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে দিবাভাগে অবস্থান করিলে নবাগত ব্যক্তির কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না, কিন্তু রাত্রি কাটাইলেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

১১। যদি গৃহ দ্বিতল হয়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় দ্বিতলস্থ গৃহে বাস করিলে মশকের উপদ্রব হইতে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিলাভ করিতে পারা যায়। পল্লীগ্রামে রাত্রিকালে মশারি না খাটাইয়া শয়ন করা কদাচ উচিত নহে। ডাক্তার রস্ বলেন, যে, যদি পল্লীগ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি মশারির মধ্যে শয়ন করে, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়া যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, কেবল এনোফিলিস্ জাতীয় মশক থাকিলেই ম্যালেরিয়া রোগ হয় না; মশকের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া-পীড়িত ব্যক্তির অবস্থানও প্রয়োজনীয়। মশক, দংশন দ্বারা উক্ত রোগীর রক্ত হইতে ম্যালেরিয়ার বীজ সংগ্রহ করিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করাইলে পর, ঐ রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং রোগীকে সমস্ত রাত্রি মশারির মধ্যে রাখিয়া দিলে, মশকেরা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে রোগ

সংক্রমণ• করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে ঘরের মাপের মত বড় মশারি প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যার সময় হইতে তন্মধ্যে পরিবারস্থ সকলে অবস্থান করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইতে পারা যায়। ঘরজোড়া মশারি হইলে বিছানা না পাতিয়া ঘরের মেঝেয় বসিয়া মশারির মধ্যে রন্ধন ব্যতীত অন্যান্য আবশ্যকীয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়। একসময়ে ইতালির প্রদেশবিশেষে ও আমেরিকার অন্তঃপাতী পানামা নামক স্থানে ম্যালেরিয়ার ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব ছিল; নূতন লোক সেখানে যাইলে, ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। লোকে মশকের দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সূক্ষ্ম তারের জালের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস ও সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল গৃহের মধ্যে একটীও মশক প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। যাহারা এই সকল গৃহের মধ্যে বাস করিত, তাহারা ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। এরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ; আমাদিগের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচলন অসম্ভব। তবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থানের সঙ্গতি-পন্ন লোকেরা তারের জালের দুই একটী বড় ঘর প্রস্তুত করিয়া

ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় রাত্রিকালে উহার মধ্যে বাস করিতে পারেন। গৃহস্থ লোকের বাটীর সমস্ত দরজা জানালায় সূক্ষ্ম মল্‌মল্‌ কাপড়ের পর্দ্দা বা চিক টাঙ্গাইয়া দিলে রাত্রিকালে বায়ুসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইবে না, অথচ মশকের উপদ্রব হইতে অনেকাংশে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যাইবে। সাধারণ লোকের পক্ষে ম্যালেরিয়ার কয়েক মাস বড় মশারির ভিতর সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি থাকিবার বন্দোবস্ত করাই অল্পব্যয়সাপেক্ষ ও সহজসাধ্য। ইহা বিস্তৃতভাবে পল্লীগ্রামে প্রচলিত হইলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

১২। মশকেরা প্রায়ই হস্ত বা পদদ্বয়ে দংশন করিয়া থাকে; এইজন্য ম্যালেরিয়ার সময়ে এই সকল স্থান আবৃত করিয়া রাখিলে উহাদিগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন, যাঁহাদিগকে নগ্নপদে কোন কার্য্য করিতে হয় না, তাঁহাদিগের রাত্রিকালে মোটা ফুল্‌ মোজা পায়ে দেওয়া থাকিলে ভাল হয়। অনেক সময়ে ইউকালিপ্টস্‌ তৈল (Eucalyptus oil) অথবা লেবুর তৈলের (oil of lemons) ন্যায় কোন সুগন্ধি তৈল পায়ে হাতে মাখাইয়া রাখিলে মশা কাছে আসে না। মশকেরা কেরোসিন্‌ তৈলের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। সামান্য

অবস্থার লোকে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় গৃহমধ্যে কেরোসিন্ ছড়াইয়া দিলে অথবা সন্ধ্যার পর হাতে পায়ে কেরোসিন্ মাখাইয়া রাখিলে মশকের দংশন হইতে অব্যাহতি এবং জ্বরের আক্রমণ হইতে কতক পরিমাণে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। এমন কি হাতে পায়ে সরিষার তৈল মাখিলেও মশকের দংশন হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৩। বাটীর মধ্যে মশক যেখানেই থাকুক না কেন, দেখিতে পাইলেই উহাকে মারিয়া ফেলিবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশক ম্যালেরিয়া-বীজের বাহন হইলেও, যদি একটীও ম্যালেরিয়া-রোগী না থাকে, তাহা হইলে সহস্র মশক বিদ্যমান থাকিলেও ম্যালেরিয়ার বিস্তার সংঘটিত হইতে পারে না। সুতরাং মশকের অস্তিত্বের ন্যায় ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্ত রোগীর বিদ্যমানতাও এই রোগের বিস্তারের অন্যতম কারণ। রোগীর রক্তের মধ্যে যে ম্যালেরিয়ার বীজ অবস্থিতি করে, যদি কোন উপায়ে তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মশকের দ্বারা এই রোগের বিস্তৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ যদি রোগের বীজেরই অভাব হয়, তাহা হইলে মশকের দংশন কষ্টকর হইলেও উহাদ্বারা রোগোৎপত্তির

সম্ভাবনা থাকে না। কুইনিনের ন্যায় ম্যালেরিয়ার বীজ ধ্বংস করিবার শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। ম্যালেরিয়া-রোগের বীজ রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে অবস্থিতি করে। যখন উহা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন উহা বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি সাধন করে। যখন এই সকল ক্ষুদ্র বীজাণু (Spores) রক্ত-কণিকা হইতে বহির্গত হইয়া রক্তস্রোতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, তখনই রোগীর কম্পজ্বর উপস্থিত হয়। এইরূপ বংশবৃদ্ধি হইতে বীজ-বিশেষের ২৪, ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা সময় লাগে ; এইজন্য আমরা ১ দিন, ২ দিন বা ৩ দিন অন্তর পালা জ্বরের আক্রমণ দেখিতে পাই। যথারীতি কুইনিন্ সেবন করিলে এই সকল বীজ এরূপ নির্জীব হইয়া পড়ে যে উহাদের বংশবৃদ্ধি স্থগিত থাকে, সুতরাং কম্পজ্বর বন্ধ হইয়া যায়। কুইনিন্ অধিক দিন সেবন করিলে, ম্যালেরিয়া রোগের বীজ যে একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, কেবল তাহাই নহে, উহা দ্বারা সুস্থ ব্যক্তিও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। কখন কখন ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনিন্ সেবনেও বিরামলাভ করিতে দেখা যায় না, এইজন্য কেহ কেহ বলেন, যে, কুইনিন্ দ্বারা উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনেক স্থলে অপকার সাধিত হয়। এ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। কুইনিন্ ম্যালেরিয়া জ্বরের অমোঘ

ঔষধ। যে স্থলে কুইনিন্ ব্যবহার করিয়া উপকার দর্শে না, সে স্থলে, হয় কুইনিন্ যথারীতি সেবিত হয় নাই, অথবা উক্ত জ্বর ম্যালেরিয়া-ঘটিত নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সিমলা শৈলে যাঁহারা ম্যালেরিয়া কমিসনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময়ে প্রত্যেক সুস্থব্যক্তির প্রত্যহ অপরাহ্লে ৫ গ্রেণ্ কুইনিন্ সেবন করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সুস্থ ব্যক্তি কুইনিন্ 'এই মাত্রায় ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না।

কলেরা (Cholera)—কলেরা মহামারীরূপে আবির্ভূত হইলে পেটের অসুখ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। একবার মাত্র পাতলা দাস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ জলমিশ্রিত সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (Dilute Sulphuric acid) ১০ ফোঁটা এবং ক্লোরোডাইন্ (Chlorodyne) বা টিংচার্ ওপিয়ম্ (Tincture of Opium) ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা একত্রে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মাত্রা; বালকদিগকে বয়সের প্রতি বৎসর হিসাবে আধ ফোঁটা করিয়া উক্ত দুইটী ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তবে এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালককে অহিফেন সেবন করিতে দিবে না। প্রয়োজন হইলে

অগ্রে ঔষধ সেবন করাইয়া পরে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে।

২। বিকৃত বা দুষ্পাচ্য খাদ্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এ সময়ে কোন খাদ্যদ্রব্য (যেমন ফলমূলাদি) কাঁচা অবস্থায় না খাওয়াই ভাল। তরকারি, মাছ, যাহা কিছু বাজার হইতে আসিবে, পরিষ্কৃত উষ্ণ জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরে উহাদিগকে কুটিতে দিবে। সকল দ্রব্যই রন্ধন করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে ভক্ষণ করিবে। বাজারের মিষ্টান্ন এ সময়ে ব্যবহার না করাই মঙ্গল। সকল খাদ্য-সামগ্রী এরূপ ভাবে ঢাকিয়া রাখিবে যে তাহাদিগের উপর মাছি বসিতে না পারে।

৩। পানীয় জল ও দুগ্ধ ১৫ মিনিট কাল উত্তম রূপে ফুটাইয়া ঢাকা দিয়া রাখিবে, যাহাতে তন্মধ্যে কোন মতে ধূলি পড়িতে বা মাছি বসিতে না পারে। যে জলে মুখ ধুইবে, তাহাও যেন ফুটাইয়া লওয়া হয়। সাধারণ ফিল্টারের উপর এ সময়ে বিশ্বাস করিবে না। তৈজসপত্র সংস্কৃত হইবার পর উহাদিগকে উষ্ণ জলে পুনরায় ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে।

৪। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কলেরা-রোগীকে স্পর্শ করিলে বা উহার সেবা করিলে কলেরা রোগ হয় না।

রোগীর বমি ও মলের মধ্যে ঐ রোগের বীজ অবস্থিতি করে; উহারা কোন রূপে খাদ্য বা পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে ঐ রোগের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এই রোগে মল ও বমির সহিত তৎক্ষণাৎ কোনরূপ বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া উহাকে শুষ্ক খড় বা করাতের গুঁড়ার উপর ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য বিশোধক ঔষধের অভাবে উহার সহিত চূণ মিশ্রিত করিয়া কলিকাতা সহরের ন্যায় সে সকল স্থানে বদ্ধ ড্রেন আছে, তন্মধ্যে উহা ফেলিয়া দিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। তবে খোলা ড্রেন, কাঁচা নর্দ্দামা বা জমির উপর ফেলিয়া দেওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে। রোগীর বমন ও মলস্পৃষ্ট বস্ত্রাদি একদিন বিশোধক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া একঘণ্টা কাল জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে উহারা নির্দ্দোষ হইয়া যায়। বিশোধক ঔষধে ভিজাইবার পর সাবান জলে কাচিয়া লইলেও উহার সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়, তবে জলে ফুটাইয়া লইলেই এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। এই সকল বস্ত্রাদি কোন পুষ্করিণীর জলে কাচা উচিত নহে। পল্লীগ্রামে বাটী হইতে বহুদূরে মাঠের মধ্যে গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে সংক্রামক রোগের মলমূত্রাদি প্রোথিত করা যাইতে পারে। তবে নিকটে

কোন জলাশয় থাকিলে এরূপ ব্যবস্থায় অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে, খড়ের উপর মলমূত্রাদি ঢালিয়া পুড়াইয়া দিবার যে ব্যবস্থার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা সহজ-সাধ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্।

৫। যাঁহারা রোগীর পরিচর্য্যা করিবেন, তাঁহারা যেন বিশোধক ঔষধ ও সাবান দিয়া হাত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ বা স্পর্শ করেন। রোগীর গৃহের মধ্যে কোনরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য বা পানীয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। আমি জানি যে একজন ডাক্তার কলেরা রোগী দেখিয়া হাত না ধুইয়া সেই হাতে পান খাইয়াছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি ঐ রোগে আক্রান্ত হন এবং অনেক কষ্টে তাঁহার প্রাণ-রক্ষা হইয়াছিল। যাহারা রোগীর পরিবার-ভুক্ত নহেন, তাঁহাদিগের, রোগীর বাটীতে কোনমতেই জল, পান বা কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। যাঁহারা পরিবারভুক্ত, তাঁহারা রোগীর গৃহ হইতে দূরে, হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া, পরিষ্কৃত স্থানে অত্যুষ্ণ জলে ধৌত বাসনে পক্কখাদ্যাদি গ্রহণ করিবেন।

৬। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় “খালি পেটে” থাকা উচিত নহে। আমাদের পাকস্থলীতে (Stomach)

যে গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্ (Gastric Juice) নামক অম্লগুণ-সম্পন্ন পাচক রস নির্গত হয়, কলেরার বীজ উহার সংস্পর্শে আসিলে শীঘ্র মরিয়া যায়। "খালি পেটে" থাকিলে এই রস নিঃসৃত হয় না, কিছু খাদ্য ভক্ষণ করিলেই ঐ রস নিঃসারিত হইতে থাকে। সুতরাং তখন ঘটনাক্রমে দুই দশটা কলেরার বীজ উদরের মধ্যে প্রবেশ করিলেও অম্লরস-সংযোগে উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পেট খালি থাকিলে ঐ সকল বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রের (Small Intestine) মধ্যে গমন করে এবং তথায় অনুকূল অবস্থা সংযোগে উহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়া রোগ উৎপন্ন হয়।

৭। বাটীর মধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে কোনরূপ আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিতে দিবে না। উহাতে মাছির উপদ্রব হয় এবং মাছি দ্বারা কলেরার বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবাহিত এবং দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য সংলিপ্ত হইয়া থাকে।

৮। পয়ঃপ্রণালী, পায়খানা প্রভৃতি স্থান সর্ব্বদা ফেনাইল্ দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত রাখিবে।

৯। শরীর ও মন সর্ব্বদা সচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিবে। কলেরা রোগীর সেবা করিবার প্রয়োজন হইলেও কলেরা রোগকে কখন ভয় করিবে না। রোগ নিবারণের জন্য

যে স্বাভাবিক শক্তি আমাদের শরীরে নিহিত আছে, শরীর ও মনের অবসন্নতা হেতু তাহা নিস্তেজ হইয়া যায়; সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সহজেই রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

১০। অনেক সময়ে সোডা ওয়াটার্, লেমনেড্, কুল্পি বরফ প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য দূষিত জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল পানীয় গ্রহণ করিয়া সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। বিশ্বস্ত কারখানায় প্রস্তুত হইলে এই সকল পানীয় গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই—তাহা না হইলে এ সময়ে এই শ্রেণীর পানীয় গ্রহণ করা উচিত নহে। বরফ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক সময়ে অপরিষ্কৃত জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং এ সময়ে পরিষ্কৃত জলে প্রস্তুত বরফ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

১১। যে পুষ্করিণী বা কূপ হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয়, কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময়ে তাহার মধ্যে পার্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ জলে গুলিয়া ঢালিয়া দিলে জল নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

১২। কলেরার "টিকা" (Inoculation) লইলে কিছু দিনের জন্য ঐ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। ইহাতে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না, সুতরাং মহামারীর সময়ে যাহারা কলেরা রোগীর

সংস্রবে আসিবে, অথবা বাটীর মধ্যে কলেরা রোগের আবির্ভাব হইলে সেই পরিবারস্থ লোকেরা, "টিকা" গ্রহণ করিলে, আত্মরক্ষা সম্পাদন ও রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ, উভয় বিষয়েই সুফল লাভ হইতে পারে।

৩। **টাইফয়েড্ জ্বর** (Typhoid fever)—১। কলেরার ন্যায় টাইফয়েড্ জ্বরেও মল এবং মূত্রের সহিত রোগের বীজ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং কলেরার ন্যায় এই রোগেও মলমূত্রাদির সংক্রামকতা-দোষ বিশোধক ঔষধের দ্বারা নষ্ট করিয়া উহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই রোগের পরিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সংক্রামকতা-দুষ্ট জল বা দুগ্ধ পান করিয়াই এই রোগের বিস্তার সংঘটিত হয়, সুতরাং কলেরা রোগে যেমন পানীয় জল, দুগ্ধ প্রভৃতি উত্তমরূপে ফুটাইয়া পান করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই প্রযোজ্য। অনেক সময়ে অবিরাম জ্বর হইলে উহা টাইফয়েড্ জ্বর কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা চিকিৎসকের পক্ষেও দুরূহ হইয়া উঠে। অধুনা রক্ত-পরীক্ষা দ্বারা কোন জ্বর প্রকৃত টাইফয়েড্ জ্বর কিনা, তাহা নির্দ্ধারিত হইতেছে। যাহা হউক, দুই তিন সপ্তাহ স্থায়ী অবিরাম জ্বর হইলেই উহাকে টাইফয়েড্ জ্বর মনে করিয়া উহার সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট করিবার জন্য

ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না।

২। জ্বর ভাল হইয়া গেলেও কিছুদিন রোগীর মল মূত্রের মধ্যে, এই রোগের বীজ বিদ্যমান থাকে; সুতরাং আরোগ্য হইবার পরেও উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নহে।

৪। **রক্ত-আমাশয়** (Dysentery)—১। এই রোগের বীজ মলের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং অধিকাংশ স্থলেই দূষিত পানীয় জলের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উৎপাদন করে। বালকবালিকাদিগের রক্ত-আমাশয় রোগ হইলে উহাদিগের মল যথাতথা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং নানা কারণে খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় জল উহাদ্বারা দূষিত হইলে তদ্দ্বারা সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ঐ রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে রক্ত-আমাশয় রোগ সংক্রামক নহে এবং তাঁহারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই রোগ সম্বন্ধে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেন না। কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর সম্বন্ধে মলাদি বিশোধন করিবার এবং পানীয় জল, খাদ্য প্রভৃতি বিশুদ্ধ অবস্থায় গ্রহণ করিবার যে সকল ব্যবস্থাপালন কর্ত্তব্য বলিয়া

নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই রোগ সম্বন্ধেও সেই সকল প্রযোজ্য।

৫। **যক্ষ্মা** (Phthisis)—১। রোগীকে সর্ব্বদা খোলা জায়গায় রাখিবে। দেহ গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া খোলা বারাণ্ডায় বা দালানে রাত্রিকালে তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিবে এবং দিবাভাগে বাটীর বাহিরে ছায়াযুক্ত মুক্ত স্থানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিবে। যদি ঘরের মধ্যে থাকিতেই হয়, তাহা হইলে গৃহের তাবৎ বায়ু পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে।

২। যক্ষ্মার বীজ রোগীর পরিত্যক্ত কফের সহিত নির্গত হয়। রোগী যথাতথা কফ ফেলিলে উহা শুষ্ক হইয়া ধূলির সহিত মিশ্রিত হয় এবং রোগ-বীজ-মিশ্রিত ধূলি উড়িয়া নিশ্বাসের সহিত অপরের ফুসফুসে, অথবা খাদ্য দ্রব্যের সহিত পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে, ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এজন্য কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে বিশোধক ঔষধ রাখিয়া তন্মধ্যে কফ পরিত্যাগ করা উচিত এবং উহা ভূমিতে না ফেলিয়া ড্রেনের মধ্যে অথবা গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে পুতিয়া ফেলিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। কফ মুছিবার জন্য যে সকল বস্ত্রখণ্ড রোগী ব্যবহার করিবে, তাহা বিশোধক

ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। কাগজের উপর কফ ফেলিয়া উহাকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিলে এই কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৩। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তি কখনই এক বিছানায় শয়ন করিবে না। নিতান্ত অসুবিধা না হইলে রোগীর সহিত এক ঘরেও রাত্রিযাপন করিবে না।

৪। মানুষের ন্যায় গোরুরও যক্ষ্মা হইয়া থাকে। যক্ষ্মাগ্রস্ত গোরুর দুগ্ধ পান করিয়া মানুষের যক্ষ্মা হইতে পারে, ইহা অনেকানেক খ্যাতনামা চিকিৎসক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যক্ষ্মাগ্রস্ত দুগ্ধবতী গাভীর বাঁটে ঐ রোগের গুটি অবস্থিত থাকে; দুগ্ধ দোহন করিবার সময় গুটী হইতে রোগের বীজ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এজন্য দুগ্ধবতী গাভীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কলিকাতায় অধিকাংশ লোকেই গোয়ালার দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং গাভীর স্বাস্থ্যের অবস্থা তাঁহাদের জানিবার সুবিধা হয় না। যদি দুগ্ধের মধ্যে যক্ষ্মার বীজ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহাকে ১৫ মিনিট কাল ফুটাইয়া লইলেই উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব দুধ একবার উথলিয়া উঠিলেই উহাকে নামাইবে না, কিছুক্ষণ উহাকে ফুটিতে দিলে উহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে।

৫। অনেক সময়ে মাছি দ্বারা এই রোগের বীজ খাদ্যসামগ্রীতে সংলগ্ন হইয়া থাকে; উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিলে রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং খাদ্যসামগ্রীতে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

৬। যক্ষ্মা-রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তির এক স্থানে এক সঙ্গে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ। যে সকল ভোজন-পাত্র যক্ষ্মা-রোগী দ্বারা ব্যবহৃত হইবে, তাহা বিশোধক ঔষধ ও উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত না করিয়া সুস্থ ব্যক্তির ব্যবহার করা উচিত নহে। যক্ষ্মারোগীর উচ্ছিষ্ট খাদ্য বা পানীয় অপর কাহারও গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ।

৭। যক্ষ্মা-পীড়িতা মাতা শিশু সন্তানকে স্তন্যপান করাইবেন না। ইহাতে মাতার শরীর শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রুগ্না মাতার দুগ্ধ পান করিয়া শিশুরও ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

৮। পুরুষ বা স্ত্রীলোক, যাহার যক্ষ্মার সূত্র-পাত হইয়াছে, তাহার বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যক্ষ্মারোগী বিবাহ করিলে তাহার স্বাস্থ্য শীঘ্র ভগ্ন হয় এবং রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই

মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যক্ষ্মারোগীর সন্তান সন্ততির মধ্যেও ঐ রোগ-প্রবণতা অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত হইলেও ব্যাধিযুক্তা কন্যার বিবাহ দিলে যে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ একত্র সহবাসের জন্য স্ত্রী হইতে স্বামী বা স্বামী হইতে স্ত্রীর শরীরে যক্ষ্মারোগের সূত্র-পাত হইবার ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diptheria)—১। যাঁহারা ঐ রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহাদের মুখ বা চোখের মধ্যে রোগীর থুথু বা কফ যাহাতে না প্রবেশ করে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই রোগের বীজ কাশিবার সময় রোগীর মুখ গলা হইতে লাল ও কফের সহিত নিঃসৃত হয়। যদি কোন প্রকারে রোগ-বীজ-মিশ্রিত কফ সুস্থব্যক্তির চোখে বা মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২। এই রোগে রোগীর গলার মধ্যে ঔষধ লাগাইবার প্রয়োজন হয় এবং ঔষধ লাগাইবার সময়ে রোগী অত্যন্ত কাশিতে থাকে। যিনি ঔষধ লাগাইবেন, তিনি যেন

একখণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা নিজ নাসিকা ও মুখ আবদ্ধ করিয়া গলায় ঔষধ লাগাইবার ব্যবস্থা করেন, নতুবা ঐ সময়ে তাঁহার মুখের মধ্যে রোগের বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

৩। যে ঘরে রোগী থাকিবে, তাহার সন্নিকটে ছোট ছেলেমেয়েদের কখনই আসিতে দেওয়া উচিত নহে। সুস্থ বালকবালিকাগণকে বাটী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়।

৪। গৃহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করিবে। রোগীর গৃহ কখনই বদ্ধ রাখিবে না, কারণ এই রোগের বীজ নিশ্বাস দ্বারা বায়ু মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া বায়ুকে দূষিত করে।

৫। ড্রেনের গ্যাস্ যাহাতে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ুকে দূষিত না করে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে অনেক সময়ে ড্রেন হইতে উত্থিত গ্যাসের মধ্যে এই রোগের বীজ বিদ্যমান থাকে।

৬। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের দুগ্ধের ব্যবহার হইতে মনুষ্য-শরীরে রোগ সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে।

৫। এণ্টিটক্সিক্ সিরম্ নামক ঔষধ সুস্থ বালকবালিকা-দিগকে সেবন করাইলে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় তাহারা নিরাপদে থাকিতে পারে।

প্লেগ্ (Plague)—১। বাটীর সর্ব্বত্র পরিস্কৃত পরিচ্ছন্নাবস্থায় রাখিবে। যাহাতে বাটীর প্রত্যেক গৃহে সমস্ত দিন যথেষ্ট পরিমাণ আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। অব্যবহার্য্য সামগ্রী ও আবর্জ্জনাদি বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবে এবং গৃহের মধ্যে ইঁদুরের গর্ত্ত থাকিলে উহা ইট ও সিমেণ্ট্ মাটী দ্বারা শক্ত করিয়া বুজাইয়া দিবে। ইঁদুর মারিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা সাধন করিতে বিলম্ব বা আলস্য প্রদর্শন করিবে না।

২। মানুষের প্লেগ্ হইবার পূর্ব্বে ইঁদুরের প্লেগ্ হইতে দেখা যায়। যখন দেখিবে যে বিনা কারণে বাটীতে ইঁদুর মরিতেছে, তখনই বুঝিবে যে উহারা প্লেগ্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিলেই অবিলম্বে ঐ বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে এবং সমস্ত বাসগৃহ বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া ও চূণ ফিরাইয়া, সমস্ত দরজা জানালা কিছু দিনের জন্য খুলিয়া রাখিলে পর তবে উহা পুনরায় বাসের যোগ্য

হইবে। বাটীতে ইঁদুর মরিতে আরম্ভ করিলে ফাঁক জায়গায় চালা বাঁধিয়া কয়েক দিন বাস করিলে পরিবারস্থ কাহারো প্লেগ্ হইবার সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু এরূপ অবস্থায় বিলম্ব করিয়া বাটীত্যাগ করিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা থাকে।

৩। মৃত ইঁদুর কখনই হাত দিয়া স্পর্শ করিবে না। অজ্ঞতাবশতঃ মৃত ইঁদুর স্পর্শ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের প্লেগ্ রোগ হইয়াছে, এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে। মৃত ইঁদুর চিম্‌টার দ্বারা ধরিয়া ফাঁকা জায়গায় খড়ের উপর কেরোসিন্ তেল ঢালিয়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত। মৃত ইঁদুর কখনই রাস্তা ঘাটে ফেলিয়া দিবে না। যে স্থানে মৃত ইঁদুরের দেহ পতিত থাকে, তাহা ফেনাইল্ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিবে।

৪। প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ করিতে বা তাহার সেবা করিতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। অন্যান্য সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত যে সমস্ত বিষয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন, প্লেগ সম্বন্ধেও তাহাই প্রতি-পালন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে প্লেগ্-রোগীর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে অথবা উহাকে স্পর্শ করিলেই, প্লেগ্ হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য বাটীতে

কাহারো প্লেগ হইলে নিতান্ত আপনার লোক ব্যতীত অপর সকলেই তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিত। এমন কি, মহামারীর প্রথমাবস্থায় অনেক স্থলে কোন কোন চিকিৎসককেও রোগীর চিকিৎসা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতে দেখা গিয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, এই ভ্রান্ত ধারণা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। অধিকাংশ স্থলেই ইঁদুরের দেহে অবস্থিত এক প্রকার পোকার (Rat-flea) দংশন দ্বারা মনুষ্য-শরীরে প্লেগ সংক্রামিত হইয়া থাকে; প্লেগ্-রোগীকে স্পর্শ করিলে উক্ত রোগ উৎপন্ন হয় না। তবে শরীরের মধ্যে ক্ষতাদি থাকিলে প্লেগ্-রোগীকে স্পর্শ না করাই উচিত এবং প্লেগ্-রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষার সময় সুস্থ ব্যক্তির দেহে যাহাতে কোনরূপ ক্ষত না হয় বা আঁচড় না লাগে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্লেগ্ রোগীর নিউমোনিয়া (Pneumonia) হইলে উহার থুথু বা কফ যাহাতে সুস্থ ব্যক্তির চোখে মুখে না লাগে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। এই উপায়ে রোগী হইতে চিকিৎসকের শরীরে প্লেগ্ সংক্রামিত হইবার ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। নিউমোনিয়াগ্রস্ত প্লেগ্-রোগীর নিশ্বাস ও কফ দ্বারা এই রোগের বীজ বায়ু-

মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় ; সুতরাং এরূপ অবস্থায় যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

৫। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে পর অন্ততঃ ১ মাস কাল তাহার পৃথক্ গৃহে বাস করা এবং সুস্থ ব্যক্তির সংস্রবে না আসাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন, রোগারোগ্যের পর ১০ দিন তাঁহাদের পৃথক্ হইয়া থাকিলে ভাল হয়।

৬। যে সকল স্থানে প্লেগ্ হইতেছে, তথা হইতে আনীত বস্ত্র, শয্যা, পুস্তক বা শস্য রাখিবার থলিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। যে পোকার (Rat-flea) দংশন দ্বারা প্লেগ্ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা এই সকল সামগ্রী দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া থাকে।

৭। প্লেগের সময় পায়ে মোজা ও জুতা দেওয়া থাকিলে অনেক সময় উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। এজন্য প্লেগের সময়ে কাহারও খালি পায়ে থাকা উচিত নহে।

৮। যাঁহারা প্লেগাক্রান্ত স্থানে থাকিবেন অথবা প্লেগ্-রোগীর চিকিৎসা বা সুশ্রূষা করিবেন, তাঁহারা প্লেগের "টিকা" লইলে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সময়ে একপ্রকার

নিরাপদ্ থাকিতে পারিবেন। যদিও প্লেগের টিকার রোগনিবারণীশক্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তথাপি উহা দ্বারা সেই সময়ের মত আত্মরক্ষা এবং রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিতে পারা যায়। সুব্যবস্থাপূর্ব্বক এই টিকা লইলে কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় না, অথচ যাঁহারা টিকা লইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই ঐ রোগে আক্রান্ত হন না অথবা আক্রান্ত হইলেও সহজে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্লেগের টিকা যে সময়োপযোগী ও উপকারী, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা ইহার রক্ষণীশক্তি নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। প্লেগের টিকা লইতে সাধারণ লোকে অত্যন্ত ভয় পাইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

৮। **হাম, বসন্ত ইত্যাদি**—১। এই সকল রোগ স্পর্শ দ্বারা, কাশির সময়ে কফ ও লালার দ্বারা, অথবা বস্ত্র, শয্যা বা বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহারও (বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের) কদাচ রোগীর গৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে অথবা রোগীর বস্ত্র বা শয্যাদির সংস্পর্শে আসা অকর্ত্তব্য।

বাটীতে এই সকল রোগ দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সুস্থ বালক-বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করা উচিত। যাঁহারা রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা একখানি মোটা চাদর গায়ে মুড়ি দিয়া গৃহের মধ্যে যাইবেন এবং বাহিরে যাইবার সময় ঐ চাদরখানি রোগীর গৃহের বাহিরে রাখিয়া অন্যত্র গমন করিবেন। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় হস্তপদ সাবান জলে উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া অন্যত্র গমন করা উচিত নহে।

২। রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে সাবান ও ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে কাচিয়া ধোপার বাটীতে পাঠাইবে, নচেৎ সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সকল রোগ ধোপার বাটীর কাপড় দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে যতদিন না রোগী আরোগ্য লাভ করে, ততদিন ধোপার বাটীতে কাপড় দেওয়া, ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া এবং পরিবারস্থ কাহারও কোন স্থানে সামাজিক উৎসব উপলক্ষে গমন করা নিষিদ্ধ ছিল। ইহা দ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি অনেকাংশে নিবারিত হইত। কিন্তু বস্ত্রাদি বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে এই প্রাচীন প্রথার উপকারিতা অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায়।

৩। যে পরিবারের মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ দেখা দিবে, সেই বাটীর বালক-বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। এই বিষয়ে অনবধানতা প্রযুক্ত বিদ্যালয় হইতে অনেক সময় হাম, পানবসন্ত প্রভৃতি রোগের পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে।

৪। যে বাটীতে বসন্তরোগ দেখা দিয়াছে, সেই পরিবারের সকলেরই টিকা (Vaccination) লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বাটীর মধ্যে যদি ১ মাসের শিশুসন্তানও থাকে, তথাপি তাহারও সেই সময়ে টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বে টিকা হইয়াছে বলিয়া এ সময়ে নিশ্চিন্ত থাকা কদাচ উচিত নহে। যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসিবে, তাহারা, এমন কি, প্রতিবাসীরা পর্য্যন্ত টিকা লইলে, রোগের পরিব্যাপ্তি সবিশেষ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। এই সকল রোগে যখন "ছাল" উঠিতে থাকে তখনই উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ প্রবল ও চতুর্দ্দিকে উহার পরিব্যাপ্তি হইতে থাকে। অতএব সেই সময়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। রোগীর গৃহের জানালা দরজায় কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে সিক্ত পর্দ্দা খাটাইয়া দেওয়া উচিত এবং রোগীর গাত্রে সর্ব্বদা কার্ব্বলিক্ তৈল (১ ভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড ও ৯ ভাগ নারিকেল তৈল) উত্তমরূপে

লাগাইয়া রাখিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়, শরীরের ব্রণ-ক্ষতাদি শীঘ্র শুকাইয়া যায়, ক্ষতাদির দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং তন্মধ্যস্থিত রোগবীজও নষ্ট হয়, "ছাল" দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না এবং ঘায়ে মাছি বসিতে পারে না। সুতরাং রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষ ভাবে নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। রোগ আরোগ্য হইলে যতদিন না সমস্ত 'ছাল' উঠিয়া যায়, ততদিন রোগীকে সুস্থব্যক্তির সহিত মিশ্রিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। কয়েক দিন স্নান করিবার পর সুস্থব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

৭। বস্ত্র, শয্যাদি, রোগীর গৃহ ও গৃহসজ্জা পূর্ব্ব-কথিত প্রণালীতে উত্তমরূপে বিশোধন না করিলে রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

জলাতঙ্ক রোগ (Hydrophobia):—ক্ষিপ্ত কুক্কুর বা শৃগালের মুখের লালার মধ্যে এই রোগের বীজ অবস্থিতি করে। দংশনকালে উহা ক্ষত মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পথ দিয়া মস্তিষ্কের দিকে মৃদুগতিতে পরিচালিত হয় এবং অল্লাধিক কাল ব্যবধানে মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া ভীষণ রোগ-

লক্ষণ প্রকাশ করে। এই রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশিত হইলে মৃত্যু সুনিশ্চয়—এই রোগ কখন আরোগ্য হইতে দেখা যায় নাই। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে বানর, বিড়াল, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগের জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয়; তখন উহাদিগের লালার মধ্যেও ঐ রোগের বিষ বিদ্যমান থাকে এবং তাহারা মনুষ্য বা অন্য প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগেরও ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই ভয়ানক রোগের কোন সুচিকিৎসা প্রচলিত ছিল না। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, কুকুরে কামড়াইলেই জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয় না; কুকুর ক্ষিপ্ত না হইলে এই রোগ জন্মিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। পুনশ্চ ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলেই যে জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে অনেক লোককে এক সময়ে দংশন করিলে তাহার বিষ ক্রমে ঝরিয়া যায়, সুতরাং যাহারা প্রথম-দষ্ট হয়, তাহাদেরই ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা; যাহাদিগকে পরে কামড়ায়, বিষের অসদ্ভাব হেতু তাহাদিগের মধ্যে অনেক সময়ে উক্ত রোগ প্রকাশ পায় না। বিশেষতঃ দেহ বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিলে বিষ বস্ত্রের উপর লাগিয়া যায়, দংশন-জনিত ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় না, সুতরাং এরূপ স্থলে ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিলেও ঐ রোগ

জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। বোধ হয় এইরূপ রোগীর চিকিৎসাদ্বারাই দেশীয় ঔষধবিশেষ আরোগ্য সম্পাদন সম্বন্ধে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। প্রকৃত জলাতঙ্ক রোগ এই ঔষধের দ্বারা উপশমিত হয় না। লোকে মিথ্যা আশায় প্রতারিত হইয়া প্রকৃত চিকিৎসার উপায় থাকিলেও উহার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র সুচিকিৎসা, স্বনামখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর্ (Pasteur) উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহা সিমলা শৈলের নিকট কসৌলি নামক স্থানে, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কোন্নুর নামক নগরে এবং আসাম প্রদেশস্থ শিলং নগরে গভর্ণমেণ্ট্-স্থাপিত চিকিৎসালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। একবার জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই চিকিৎসা দ্বারা কোন উপকার হয় না, কিন্তু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে এই চিকিৎসাধীন থাকিলে ক্ষিপ্ত কুক্কুর-দংশন-জনিত দেহপ্রবিষ্ট রোগের বিষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং জলাতঙ্ক রোগ একেবারেই প্রকাশ পায় না। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা হইলে এই ভীষণ রোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট্ বিনামূল্যে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের সাতিশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুনশ্চ

গভর্ণমেণ্ট্ হীনাবস্থাপন্ন লোকের জন্য এই সকল স্থানে যাতায়াতের রেলভাড়া পর্য্যন্ত দিবার এবং তথায় বিনা ব্যয়ে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আহারের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ চারি আনা প্রদান করিয়া থাকেন। কসৌলি যাইতে হইলে হাবড়ায় রেলগাড়ীতে উঠিয়া কাল্‌কায় (Kalka) নামিতে হয় এবং তথা হইতে পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা হাত-গাড়ি (Rickshaw) সাহায্যে ৯ মাইল পথ শৈলারোহণ করিয়া চিকিৎসালয়ে পৌঁছিতে হয়। রাত্রে হাবড়ায় পঞ্জাব মেলে উঠিলে তৎপরদিন রেলে এবং তার পর দিন বেলা ২।৩ টার সময় কসৌলি পৌঁছান যায়। পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের তথায় থাকিবার বড় অসুবিধা ছিল, এখন দুই চারিটী বাসাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়া সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। যাইবার পূর্ব্বে চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়কে জানাইলে, এই সকল বাসাবাড়ী খালি থাকিলে, তিনি তথায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। চাল, ডাল, ঘৃত, আলু, মাংস প্রভৃতি সাধারণতঃ যে সকল খাদ্য-দ্রব্য আমরা ব্যবহার করি, সে সকলই সে স্থানে পাওয়া যায়, তবে চাকর ও রসুইকর ব্রাহ্মণ সেখানে মিলে না, এখান হইতে সঙ্গে না হইয়া গেলে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। শীতকালে সেখানে শীত অধিক হয়, এজন্য ভিতরের ও উপরের

গরম কাপড়, জামা ও লেপ কম্বলাদি যথা পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। কসৌলি অতি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান, সেখানে অসাবধানতা হেতু ঠাণ্ডা না লাগাইলে কোন অসুখ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই রোগের চিকিৎসা-প্রণালী অতি সহজ। সকল রোগীকেই বেলা দশটার সময় একবার হস্পিটালে যাইতে হয়। সেখানকার সাহেব-ডাক্তার সূচল পিচকারির দ্বারা পেটের ত্বকের মধ্যে দিবসে একবার মাত্র ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহাতে সামান্য সূচ-ফোটার অধিক যন্ত্রণা হয় না। দুই এক দিন চিকিৎসার পর ছোট ছোট বালকবালিকারাও এরূপ অভ্যস্থ হইয়া যায় যে তাহাদের নাম ডাকিলেই আপনাপনি পেটের কাপড় খুলিয়া পিচকারির ঔষধ লইবার জন্য বিনা সঙ্কোচে ডাক্তারের নিকট গমন করে। যে স্থান ফুঁড়িয়া ঔষধ দেওয়া হয়, তথায় দুই এক দিন অল্প বেদনা থাকে, কিন্তু জ্বরজাড়ি কিছুই হয় না। দুই একদিন পরে রোগী সচ্ছন্দে সকল কার্য্যই করিতে পারে। আমি স্তন্য-পায়ী শিশুগণকে এই চিকিৎসাধীন থাকিতে দেখিয়াছি, তাহাদের কোন অসুখ হইতে দেখি নাই। আমি একটী ছয় বৎসরের বালক লইয়া এই চিকিৎসার জন্য কসৌলি গিয়াছিলাম এবং তথায় প্রায় ৩ সপ্তাহ কাল অবস্থিতি

বিধায় পাষ্টুর মতে চিকিৎসা সম্বন্ধে সকল বিষয়ই ভালরূপে দেখিবার আমার অবকাশ হইয়াছিল। অনেকে এই চিকিৎসাসম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও স্থানীয় অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন বলিয়া তথায় রোগী লইয়া যাইতে ভয় পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই, ইহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য আমি এস্থলে এই কথাগুলির অবতারণা করিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যেই চিকিৎসা শেষ হইয়া যায়, তৎপরে রোগী স্বচ্ছন্দে নামিয়া আসিতে পারেন। যদি দংশন গুরুতর হয় অথবা মস্তক, মুখ বা মস্তকের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দংশন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম প্রথম দুই বেলা ঔষধ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় এবং চিকিৎসা শেষ হইতে ২।৪ দিন বেশী সময় লাগে।

এক্ষণে কুকুরে দংশন করিলে চিকিৎসার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

১। কুকুরে দংশন করিলে উষ্ণ জলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ধৌত করিয়া নাইট্রিক্ এসিড্ বা কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Strong Nitric or Carbolic Acid) সরু তুলির সাহায্যে ক্ষত প্রদেশের অভ্যন্তরে ৩।৪ বার প্রবেশ

করাইয়া দিবে। এই সকল ঔষধ লাগাইলে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে, কেন না ইহাদিগের প্রয়োগে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সূচল লৌহখণ্ড লোহিতোত্তপ্ত করিয়া ঐ স্থান পুড়াইয়া দিলেও বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

২। কিন্তু শুদ্ধ এই ঔষধ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে ২।১ দিনের মধ্যে সুযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা দষ্ট স্থানে যতদূর পর্য্যন্ত দাঁত প্রবেশ করিয়াছে, ততখানি মাংস অস্ত্র সাহায্যে ছেদন করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। অস্ত্রজনিত ঘা শুকাইতে বিলম্ব হয় না। দংশনের অব্যবহিত পরে এইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে অনেক স্থলে অন্য কোনরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। দংশনের পর এই রোগের বিষ কিছু দিন দষ্ট স্থানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং অস্ত্র সাহায্যে ঐ স্থানের মাংসের সহিত বিষ তুলিয়া লইলে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

৩। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কুকুরে কামড়াইলেই যে জলাতঙ্ক রোগ হইবে, এমন কোন কথা নাই। অধিকাংশ স্থলেই কুকুরের ক্ষিপ্ততা থাকে না, সুতরাং কোন চিকিৎসা না হইলেও দষ্ট ব্যক্তির জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয় না। এরূপ

স্থলে খরচপত্র করিয়া কসৌলি যাইয়া চিকিৎসা করিবার কোন আবশ্যকতা হয় না। যে কুক্কুর দংশন করিয়াছে, কামড়াইবার পর ১০ দিন তাহাকে লৌহ-শিকলে আবদ্ধ করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। যদি ঐ কুঁকুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া না যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে উহা ক্ষিপ্ত নহে। এরূপ স্থলে কসৌলিঁ যাইয়া পাষ্টুরের মতে চিকিৎসা করিবার প্রয়োজন হয় না, তবে দষ্ট স্থান নাইট্রিক্ বা কার্ব্বলিক্ এসিড্ প্রয়োগ দ্বারা পুড়াইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কুকুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে মৃত কুকুরের মুণ্ডটী বেল-গাছিয়া পশুচিকিৎসালয়ে পরীক্ষার জন্য পাঠাইবে। তথায় পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে কুকুর ক্ষিপ্ত কি না। কিন্তু এই পরীক্ষা-ফলের অপেক্ষা না করিয়াই যত শীঘ্র সম্ভব, কসৌলিতে চিকিৎসার জন্য গমন করিবে। দংশন মস্তকে, মুখে বা শরীরে ঊর্দ্ধভাগে হইলে অতিশয় বিপজ্জনক বলিয়া জানিবে এবং কালবিলম্ব না করিয়া কসৌলিতে চিকিৎসার জন্য প্রস্থান করিবে। পাদদেশে দংশন হইলে কিছুকাল বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ এই রোগের বীজ কিছুদিন ক্ষতস্থানে আবদ্ধ থাকে, তৎপরে আস্তে আস্তে মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

সুতরাং, মস্তক হইতে ক্ষত স্থান যত দূরে অবস্থিত হইবে, ততই রোগের তীক্ষ্ণতার হ্রাস এবং লক্ষণ প্রকাশ হইবার বিলম্ব হইয়া থাকে। যাহা হউক, যদি কুকুর ক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়, অথবা যে কুকুরে কামড়াইয়াছে, তাহার কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একদিনও বিলম্ব না করিয়া পূর্ব্বোক্ত যে কোন স্থানে চলিয়া যাওয়া উচিত।

৮। যে ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইবে, তাহার নিকট ঐ রোগসংক্রান্ত কোন গল্প করিবে না। কোনরূপে তাহার মন যাহাতে উত্তেজিত না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কথাবার্ত্তায় ও কার্য্যে তাহার হৃদয়ে যাহাতে ভয়ের সঞ্চার না হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। অনেক স্থলে শুদ্ধ ভয় পাইয়া রোগীকে এরূপ উত্তেজিত হইতে দেখা গিয়াছে যে চিকিৎসক পর্য্যন্ত ঐ রোগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে কুকুর ক্ষিপ্ত নহে এবং রোগের মিথ্যা লক্ষণ ক্রমে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অত্যাবশ্যক বিষয়টী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

১২

সংযম

সংযম স্বাস্থ্য-রক্ষার মূলমন্ত্র। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, আমোদ-প্রমোদ সকল বিষয়ে যথোচিত সংযম আচরিত হইলে, দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করা যায়। প্রবৃত্তির অসংযত ক্রিয়ার দ্বারাই আমাদিগের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ও অকাল-মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে।

শারীরিক প্রবৃত্তি মাত্রেরই যথোচিত সংযম আবশ্যক হইলেও, ইন্দ্রিয়-সংযম বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তদ্বিষয়ে আমাদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। ইন্দ্রিয়ের অসংযত পরিচালনা দ্বারা যেরূপ মহানিষ্ট সংঘটিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।

সমাজ-রক্ষার জন্য বিবাহের সৃষ্টি। প্রজাবৃদ্ধি ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ইহা যে প্রবৃত্তি-সংযমের পক্ষে প্রধান সহায়, তাহা সকল সমাজে ও সকল ধর্ম্মে একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। পুনশ্চ, বিবাহ দ্বারা জীবনের সুখ-দুঃখভাগী একজন সঙ্গী লাভ করিয়া, স্ত্রী পুরুষ, উভয়েরই গার্হস্থ্য জীবন মধুময় হইয়া উঠে।

আমাদিগের হিন্দু-সমাজে বিবাহ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে এই নিয়ম যে সমাজের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন কুশলপ্রদ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষ কারণ বশতঃ কোন কোন লোকের পক্ষে বিবাহ উপযোগী না হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ ঘটনার সংযোজনা অতি বিরল, সুতরাং বিবাহ জীবনের অবশ্য-কর্ত্তব্য সংস্কার বলিয়া যে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রকার-গণের বহুদর্শিতা ও সমাজ-তত্ত্বে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে অসংযত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই পরম মঙ্গলকর প্রথার অপব্যবহার দ্বারা কি বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকি! ইন্দ্রিয়-সংযমই বিবাহের উদ্দেশ্য, কিন্তু অনেক স্থলে উহা ইন্দ্রিয়ের অবাধ পরিচালনার উপায় স্বরূপ বিবেচিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমন কি, যাঁহারা চরিত্রবান্ ও ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যেও এই বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে পুত্রোৎপাদন বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রী-পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতালম্বন না করিলে, কুলপাবন পুত্র কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। রঘুবংশে আমরা পড়িয়াছি যে মহারাজ দিলীপ সস্ত্রীক বহুদিন কঠিন ব্রহ্মচর্য্য

অবলম্বন করিয়া পরে রঘুর ন্যায় দিগ্বিজয়ী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই তত্ত্বটুকু বিশিষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। যে বয়সে, যে অবস্থায় এবং যে ভাবে আমাদিগের দেশে পুত্র কন্যা জন্মিতেছে, তাহাতে তাহারা যে ক্ষীণশক্তি, চিররুগ্ন ও অল্পজীবী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? পিতা মাতার দেহ পূর্ণতালাভ করিবার বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাদিগের দেহে ইন্দ্রিয়-চালনা-জনিত ক্ষয়ের আরম্ভ হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে অধিকাংশ লোকের অবস্থা সচ্ছল নহে, সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যপ্রদ আবাসভূমি প্রভৃতি যে সকল অনুকূল উপায় দ্বারা শারীরিক বৃদ্ধি সংসাধিত ও শক্তি সঞ্চয় হইয়া থাকে, অধিকাংশ পরিবারের মধ্যেই তাহাদিগের অভাব স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, ২৪।২৫ বৎসরের ন্যূনে পুরুষের দেহ পূর্ণতালাভ করে না; ইহার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইলে অপূর্ণ দেহ হইতে সবল সন্তান লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। তদুপরি সাংসারিক অসচ্ছলতা হেতু শারীরিক এই অপূর্ণতা আরো অধিক পরিমাণে আমাদিগের যুবক-বৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বালিকদিগের যে বয়সে বিবাহ হয় এবং যে বয়সে তাহারা

জননীপদগৌরব লাভের অধিকারিণী হইয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে এই জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এই সকল দুগ্ধপোষ্যা বালিকা-দিগের গর্ভ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা যে কখন জীবনে শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা বাতুলের কার্য্য মাত্র। আমাদিগের দেশে শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা যত অধিক, পৃথিবীর অপর কোন দেশে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের মত এই, যে, অপরিণত পিতা মাতা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এই সকল শিশুদিগের জীবনীশক্তি এত ক্ষীণ, এবং সামান্য কারণেই উহারা রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। আর যাহারা বাচিয়া থাকে, তাহারাও কোনরূপে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া জীবনের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম না করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে খাওয়াইবার সঙ্গতি নাই, শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষার জন্য উপযুক্ত বস্ত্র-সংস্থানের উপায় নাই, রোগ হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা নাই, পুত্রকন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই, অথচ ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহে এরূপ অবস্থার গৃহস্থকে প্রতি বৎসর সন্তানের মুখ দেখিবার

আশায় নিরাশ হইতে হয় না! এই সংযমের অভাবে আমাদিগের গৃহস্থগণ (Middle class men) দিন দিন ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছে। কবে আমাদিগের এই সর্ব্বনাশ-কারী ইন্দ্রিয়-মোহ ঘুচিয়া যাইবে, কবে আমরা ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মতৃপ্তি-সাধনসম্বন্ধে সংযম অভ্যাস করিতে যত্ন পাইব, কবে জীবনের সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবশ্য আচরণীয় বলিয়া আমাদিগের চিত্তে দৃঢ় ধারণা হইবে এবং আমরা তৎসাধনোপযোগী শক্তি অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিব! তখন দেখিব যে এই দীন দুঃখী পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বল জাতির পরিবর্ত্তে শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য ও শক্তিতে বিভূষিত, সম্পদশালী এক মহাজাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই জাতি বিনা আয়াসে জগতের অপর সকল জাতির নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বালকদিগের বিবাহ দেওয়া একান্ত অনুচিত। সাধারণতঃ ২৪।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। প্রাচীন ভারতেও এই বয়স পর্য্যন্ত শিষ্য গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিত, সুতরাং ইহার পূর্ব্বে বালকের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ ব্যতীত আরও অনেক

সামাজিক অনিষ্ট সাধিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বিবাহ হইলে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষা-শেষ হইবার পূর্ব্বে পুত্রকন্যা জন্মিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণ-চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে হয়, অর্থের প্রয়োজন হেতু জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ে স্বপ্নে পরিণত হয় এবং অবস্থা-বৈগুণ্যে সামান্য উপজীবিকার জন্য পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মসম্মান ও মনুষ্যোচিত অন্যান্য সদ্‌গুণাবলীকে চিরবিদায় প্রদান করিতে হয়। সুখের বিষয় এই যে সুশিক্ষার বিস্তারে বর্ত্তমান সময়ে অনেকানেক অভিভাবক এই প্রথার দোষ উপলব্ধি করিতেছেন এবং বালকদিগের বিবাহের বয়স ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বিবাহে পণ-গ্রহণ-প্রথা দূষণীয় হইলেও বালিকাদিগের বিবাহের বয়স-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিতেছে। শুশ্রুতের মতে ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ হওয়া একান্ত অনুচিত এবং ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রাচীন ভারতে এই বয়সেই বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইন্দুমতী, রুক্মিণী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, সংযুক্তা প্রভৃতি বরণীয়া আর্য্যরমণীগণ স্বয়ম্বরকালে কি দুগ্ধপোষ্যা বালিকা ছিলেন, না তাঁহারা হিন্দুসমাজের বহির্ভূত ছিলেন? প্রাচীন ভারতের প্রথা

আমাদের সমাজে পুনঃ প্রচলিত হইলে আমাদের জাতি যে পুনরায় অর্থ, সামর্থ্য ও পূর্ব্ব গৌরব-লাভের অধিকারী হইতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদিগের বালিকাগণ অল্প বয়সে সন্তান-প্রসব করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে অথবা তজ্জনিত ব্যাধি হইতে আজন্ম কষ্ট পাইতেছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এ দেশীয় চিকিৎসকদিগের অগোচর নাই। অথচ আমরা এমনই অল্পবুদ্ধি যে জানিয়া শুনিয়া আমাদিগের কন্যা ও ভগিনীগণকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি! আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু আগুনে হাত পুড়িবে জানিয়াও যদি কেহ আগুনের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা কি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকি?

প্রাচীন প্রথা বা দেশাচারের দোহাই দিয়া যদি বাল্য-বিবাহের সমর্থন করা যায়, তাহা হইলে এ কথা বুঝিতে হইবে যে সকল দেশেই দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া দেশাচারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দেশ-কাল-পাত্র পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশাচারের পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি আমরা এরূপ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী না হই, তাহা হইলে আমাদিগকে চিরকাল অপর সকল জাতির পশ্চাতে পড়িয়া

থাকিয়া জগতের অধিকাংশ দুঃখ-দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় করিয়া বহিতে হইবে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, কাহারও অনুরোধে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিবে না। যদি কেহ ব্যতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমুদ্রের প্রতি ক্যানিউটের বাক্যের ন্যায় ("Thus far and no further") তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবে মাত্র।

গত বারের লোক-গণনায় জানা গিয়াছে যে হিন্দুজাতির মধ্যে ১০ বৎসর ও তন্নিম্নবয়স্কা বহুসংখ্যক বালিকা বিধবা রহিয়াছে। কি পরিতাপের বিষয়, যাহারা বিবাহ শব্দের অর্থ বুঝে না, তাহাদের বিবাহ-জীবনের সুখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা সকলই বিকশিত হইবার পূর্ব্বে জন্মের মত উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে! একটু বেশী বয়সে বিবাহ দিলে এতগুলি বালিকাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় না কি?

বাল্যবিবাহ স্বাস্থ্যনাশ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের যেমন একটী কারণ, অসমান বিবাহও তদ্রূপ অনেক স্থলে রোগ ও অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পুরুষেরা যে কোন বয়সে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু বালিকাদের বিবাহ ১১।১২, এমন কি ইহা অপেক্ষাও অনেক অল্প বয়সে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ৪০।৫০ বা তদধিক বয়স্ক

পুরুষকে ৯।১০ বৎসর বয়সের বালিকাকে বিবাহ করিবার দৃশ্য নিতান্ত বিরল নহে। এইরূপ অসমান বিবাহে বালিকার অকালপক্কতা এবং পুরুষের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইতে দেখা যায়। বহুমূত্র, ক্ষয়, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি বিবিধ উৎকট রোগ এরূপ অবস্থায় পুরুষের শরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। একেত পুত্র কন্যা বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহ করা অবিবেচনার কার্য্য—ইহাতে সংসারে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি উপস্থিত হয় এবং ভবিষ্যতে নানা অনর্থপাত ও অপব্যয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখা হয়। তদুপরি যখন এই কার্য্য দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন আশা করা যায় যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই এরূপ অনর্থমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

প্রাচীন ভারতে ছাত্রাবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্য-আচরণের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, পুনরায় তাহার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে। বালককাল হইতে ইন্দ্রিয়-সংযমের অভ্যাস না করিলে, ইহার আজীবন-ব্যাপী সুফল লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। যাহা কয়েকদিন অভ্যাস করিবে, তাহাই চিরদিন জীবনে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। আমরা সকলেই জানি যে, যে কোন কদভ্যাস কিছুদিন জন্মাইতে

দিলে উহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। অতএব বালককাল হইতেই প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা সদভ্যাস বদ্ধমূল করিয়া সকল কদভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ কুরুচিপূর্ণ পুস্তক বা চিত্র, থিয়েটারের কুভাব উত্তেজক দৃশ্য বা সঙ্গীত, কুসঙ্গ, কদালাপ প্রভৃতি বিষয় হইতে বালককে পৃথক্ রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবেন এবং নিজে চরিত্রবান্ হইয়া সেই উচ্চ আদর্শ তাহার সম্মুখে সর্ব্বদা উপস্থাপিত রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

পুত্র-কন্যাগণের যথাকালে বিবাহ দিলে গৃহ সুখসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে—দারিদ্র্য, অশান্তি, রোগ, অকাল-মৃত্যু সংসার হইতে ক্রমশঃ অবসর গ্রহণ করিবে—পুনরায় আমরা সৎসাহসে ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিব। এরূপ চিন্তা করিতেও মনোমধ্যে যে আশা ও আনন্দের উদয় হয়, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকার-প্রণীত অন্যান্য পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটী মন্তব্য।

১। **খাদ্য** (Food)—(৩য় সংস্করণ)—ইহাতে আহার তত্ত্ব সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে ... ১৷৷০

Englishman—A copy of the work ought to be possessed by every Bengali house-holder."

Bengalee—"The utility and importance of such a treatise can not be over-estimated.'

Amrita Bazar Patrika—We have no hesitation to say that it is the best production of its kind."

Empire—"The educational authorities will do well to buy copies of the book for free distribution among schools and colleges in Bengal."

Sir Gooroo Dass Banerjee Kt., M A., D. L, PH. D.—"You have earned the gratitute of your countrymen by writing this really useful book."

মহিলা—"আমরা প্রত্যেক বঙ্গমহিলাকে ইহা ক্রয় করিতে ও মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রবাসী—"আমরা এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে দেখিতে চাই।"

বসুমতী—ইহা সর্ব্বজন প্রয়োজনোপযোগী হইয়া দেশের ও দেশের অশেষ উপকারসাধন করিবে।"

২। **রসায়ন-সূত্র** (Elements of Physics & Chemistry)—
৫ম সংস্করণ—ক্যাম্প্‌বেল্ মেডিকাল্ স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ... ২৲

Calcutta Gazette—"It is written in a clear style and is eminently suited to the comprehension of those for whom it is intended."

৩। The Health of Indian Students .....2 As.

Lt. Col. R. P. Wilson F. R. C. S., D. P. H., I. M. S—"Followed on the lines indicated in your admirable address, one can not go far wrong."

Lt. Col Sir W. J. Buchanan Kt., C. I. E., M. D., I. M. S.—"I agree very strongly with what you say."

The Hon'ble Mr. W. W. Hornell C. I. E. M. A.—"I only hope what you have said in this lecture will not fall on deaf ears."

Bengalee—"The instructions, contained therein, are simply invaluable."

৪। The History and Chemistry of Paper and Matches. ... ... As. 12.
(Published by the Indian Association for the Cultivation of Science)

৫। Sir Gooroo Dass Banerjee (Life of) Rs 2.
Has been selected as a Prize and Library book for Bengal.—"It is worth its weight in gold", *B. C. O. S. Journal.*

৬। **ফলিত-রসায়ন** (Practical Chemistry) ... ১।০

৭। **পল্লীস্বাস্থ্য** (Village Sanitation)—২য় সংস্করণ ... ।০

A Text book and a Library and Prize book selected by the Governments of Assam and Bengal respectively.

"It is a charming and instructive book-let written in the simple & beautiful style of which you are a master. It should be introduced into every vernacular school."
Sir J. C. Bose Kt., C. S. I., F. R. S.

৮। **বায়ু** (Air) ... ... ॥০

৯। **পুরী যাইবার পথে** ৵০

১০। **কাগজ** (Paper) ... ... ।০

উপরোক্ত পুস্তকগুলি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, অথবা এস্ কে লাহিড়ী কোম্পানীর ৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।